অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র

[বি. কম্. ছাত্রদের জন্য বিশেষভাবে লিখিত]

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী, এম. এ.
অধ্যাপক, হুগলী কলেজ, চুঁচুড়া

ও

শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়, এম. এ.
অধ্যাপক বিদ্যাসাগর কলেজ, কলিকাতা

মডার্ণ বুক এজেন্সী
পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক
১০, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১২

ভূমিকা

একটা গভীর ভাবোচ্ছ্বাস লইয়া এতকাল আমরা রাজনীতির আলোচনা করিয়াছি ; দেশের শাসন-সংরক্ষণের ব্যাপারে যখন আমাদের কোন হাত ছিল না তখন দেশবাসীর মনে রাজনৈতিক চেতনা ও অধিকারবোধ জাগ্রত করাই ছিল আমাদের সকল আলোচনার লক্ষ্য। আজ অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। দেশের কল্যাণ অকল্যাণ আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। দেশের বহুপ্রকার সমস্যার সমাধান এখন হইতে আমাদিগকেই করিতে হইবে। দেশের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচয়লাভ সেইজন্যই আজ সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। রাজনৈতিক সমস্যার মূলে যে অর্থনীতির খেলা চলিতেছে, অর্থনৈতিক সমস্যাগুলিই যে রাজনীতির ক্ষেত্রে নানারূপ বিতর্ক, দল ও মতবাদ সৃষ্টি করিতেছে তাহা আজ সকলেরই বুঝা প্রয়োজন। এই বইখানিতে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া স্বদেশের নানা সমস্যার কথা আলোচনা করা হইয়াছে। সমস্যাগুলি ভালভাবে বুঝিবার জন্য যেখানে তত্ত্বাংশের আলোচনা প্রয়োজন, সেখানে সমাজনীতি বা রাজনীতি বা অর্থনীতির তত্ত্বাংশের আলোচনাও করা হইয়াছে।

প্রবন্ধগুলি মৌলিকতার দাবী করে না। নানাস্থান হইতে তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে। সমাজতন্ত্রের প্রতি আজকাল শিক্ষিত সাধারণের একটা ঝোঁক দেখা যাইতেছে। ঐ দিকে আমাদেরও একটু পক্ষপাত আছে।

ছাপাখানার গতি অপেক্ষা ঘটনার গতি দ্রুততর হওয়ায় কয়েকটি প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ মনে হইতে পারে; কিন্তু তথ্য ও যুক্তি অনুসরণ করিয়া গেলেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাইবে।

স্বদেশের আধুনিক সমস্যাগুলি জানিবার ও বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা যে সাধারণ পাঠকশ্রেণীর মধ্যে বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে তাঁহাদের জন্যই পারিভাষিক শব্দ

ও জটিল বিতর্ক যথাসম্ভব বর্জ্জন করিয়া প্রবন্ধগুলি লিখিত হইয়াছে। বিষয়-নির্ব্বাচনে বি. এ. ও বি. কম্. বিভাগের ছাত্রগণের বিশেষ প্রয়োজনের কথাও মনে রাখা হইয়াছে।

প্রবন্ধগুলি পড়িয়া কাহারও সামান্য উপকারও যদি হয় তবে পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

১৫ই নভেম্বর, ১৯৪৬
কলিকাতা

শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগ্‌চী
শ্রীসুধাংশুভূষণ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র

অর্থনীতি-সমাজ-রাষ্ট্র

মুদ্রাস্ফীতি

ভারতের ক্ষেত্রে কোন অর্থনৈতিক বিষয়ের আলোচনার বিশেষ অসুবিধা এই যে যে-বাস্তবক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া অর্থনৈতিক তত্ত্বগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতের বাস্তব অবস্থা তাহা হইতে বিভিন্ন। বিদেশী অর্থশাস্ত্র হইতে যে অর্থ-নৈতিক তত্ত্ব আমরা শিক্ষা করি, তাহা প্রধানতঃ ইউরোপ বা উত্তর আমেরিকার শিল্পোন্নত ও ধনতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ভারতবর্ষে আজও ধন-তান্ত্রিক শিল্পব্যবস্থার পূর্ণ বিকাশ হয় নাই। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য ধনবিজ্ঞানের তত্ত্বগুলি এইদেশে সর্ব্বাংশে প্রযোজ্য নহে।

যে সমস্ত বিষয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশগুলির সঙ্গে ভারতবর্ষের সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায় মুদ্রাস্ফীতি তাহাদের মধ্যে অন্যতম। মুদ্রাস্ফীতির ইংরাজী প্রতিশব্দ inflation. ইংলণ্ড আমেরিকার বিভিন্ন লেখক inflation কথাটির এত বিচিত্র অর্থ করিয়াছেন যে কোন্ অর্থটি আমাদের গ্রহণযোগ্য তাহা নির্ণয় করা গোড়াতেই একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। বিভিন্ন বাস্তব অবস্থা বিভিন্ন ব্যাখ্যার কারণ। আমরা আমাদের আলোচনার জন্য ভারতের বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী মুদ্রাস্ফীতির একটি সংজ্ঞা করিয়া লইব এবং এই সংজ্ঞা অনুযায়ী আমাদের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। মুদ্রাস্ফীতি ব্যাপারটা যে কি এবং তাহার পরিণাম যে কত ভয়ানক তাহা ভারতের পনেরো আনা লোক এবার মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছে।

কোন দেশের currency বা প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণ যখন উৎপাদনের তুলনায় অত্যধিক বৃদ্ধি পাইতে থাকে তখন আমরা বলি এই দেশে মুদ্রাস্ফীতি

হইয়াছে। দেশে মুদ্রার প্রয়োজন হয় কেন? টাকা বা নোট দিয়া আমরা কি কি কাজ করি? দেশে মুদ্রার প্রয়োজন—উৎপাদন ব্যবস্থাকে চালু রাখিবার জন্য—ব্যবসাবাণিজ্যকে রসদ যোগাইবার জন্য, শ্রমিকের পারিশ্রমিক, চাকুরী-জীবীর বেতন, ধনপতির স্থদ, সরকারের কর, দ্রব্যের বিনিময়ে মূল্য ও সাধারণ লেনদেন চালাইবার জন্য। এই সকল কাজ ঠিক ঠিক ভাবে চালাইবার জন্য কি পরিমাণ টাকার প্রয়োজন হইবে তাহা নির্ভর করে জনসাধারণের ব্যয় ও সঞ্চয় করিবার অভ্যাসের উপর, অর্থনৈতিক কাঠামোর গঠন-বিধির উপর ও সরকারের মুদ্রানীতির উপর। ইহাদের মধ্যে প্রথম দুইটি অর্থাৎ জনসাধারণের ব্যয় ও সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং অর্থনৈতিক কাঠামো বিপ্লব ব্যতীত সাধারণতঃ অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। অকস্মাৎ পরিবর্ত্তন সম্ভব একমাত্র সরকারের মুদ্রানীতির। আমরা জানি প্রচলিত মুদ্রার মোট পরিমাণ এবং উৎপন্ন দ্রব্যের মোট পরিমাণ—স্থূলভাবে এই দুইটির উপর মূল্যের উচ্চতা নির্ভর করে। স্থতরাং যখনই সরকার মুদ্রানীতির এইরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করেন যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে বাহির হইতে থাকে, মোট উৎপন্ন দ্রব্যের অনুপাতে মোট মুদ্রার পরিমাণ স্ফীত হয়, মূল্যের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, তখনই আমরা বলি মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে। কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি জিনিষটি একটি সাময়িক ব্যাপার। প্রয়োজনাতিরিক্ত মুদ্রা বাজারে থাকিতে থাকিতে জনসাধারণের ব্যয়-সঞ্চয়ের অভ্যাস পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্যের ভিতর অসামঞ্জস্য দূরীভূত হয় এবং দ্রব্যের মূল্য একটি নূতন উচ্চতা লাভ করে এবং সেই উচ্চস্তরে স্থিরীভূত হয়। তখন আর মুদ্রাস্ফীতির অবস্থা থাকে না।

মুদ্রাস্ফীতি একাধিক কারণে সংঘটিত হইতে পারে। মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া যদি উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কমিয়া যায় অথচ দেশের মোট অর্থগত আয় না কমে, তাহা হইলেও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যাইতে পারে। অল্পতর দ্রব্যের জন্য বৃহত্তর অর্থগত চাহিদা থাকিলেই মূল্যবৃদ্ধি পাইবে, মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিবে। তবে এই দুইটি ঘটনাই বিরল। সচরাচর যাহা দেখা

যায় তাহা হইতেছে, দেশে মোট মুদ্রার পরিমাণ বাড়িয়া যায়, মুদ্রাস্ফীতি তখন চাক্ষুষ হইয়া উঠে।

প্রয়োজনাতিরিক্ত মুদ্রা বাহির করার কারণ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন। কোন বৎসর সরকারের বাৎসরিক ব্যয় আয় অপেক্ষা বেশী হইলে সরকার হয়তো অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া অথবা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নিকট ধার লইয়া বাৎসরিক ঘাটতি পূরণ করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক সরকারী securityর ভিত্তিতে নূতন নোট মুদ্রণ করেন—মুদ্রাস্ফীতি সংঘটিত হয়। সর্ব্বাপেক্ষা সাধারণ কারণ হইতেছে যুদ্ধ। যুদ্ধের সময় দেশরক্ষা সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য—যুদ্ধকালে যুদ্ধের দাবীই সকলের চেয়ে বড় দাবী। অর্থনৈতিক বিধিপালন বা দেশের শিল্প-ব্যবস্থাকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা তখন গৌণ, মুখ্য নয়। যুদ্ধ চালাইবার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয় তাহার খানিকটা সরকার মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে সংগ্রহ করেন। আবার সময় সময় দেশে আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয়—ব্যাঙ্ক ফেল করিতে থাকে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের রিজার্ভের উপর অতিরিক্ত চাপ অনুভূত হয়, তখন সরকার কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনুমতি দেন মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে মুদ্রার চাহিদা মিটাইতে। অনেক সময় দেশজোড়া বাজার মন্দার হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যও মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। দেশে হয়তো বাজার মন্দার সূচনা দেখা দিয়াছে, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির লোকসান হওয়ার ফলে ব্যবসায় গুটাইয়া লওয়ার পরিকল্পনা চলিতেছে, দ্রব্যের মূল্য উত্তরোত্তর কমিতেছে ও বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই অবস্থায় মুদ্রাস্ফীতির সাহায্যে কিয়ৎ পরিমাণে বাড়তি মুদ্রা বাজারে প্রবেশ করাইয়া দিলে, ঘটনাস্রোতের মোড় ফিরিতে পারে। অবশ্য ইহার সফলতা নির্ভর করে বিশেষ স্থান, কাল এবং কর্ত্তৃপক্ষের যোগ্যতার উপর।

উৎপাদনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। মুদ্রাস্ফীতির ফলে পূর্ব্বের অপেক্ষা অধিক মুদ্রা ক্রেতাদের হাতে থাকিবে, অর্থের অঙ্কে উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে, সঙ্গে সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি পাইবে। মূল্য বৃদ্ধির জন্য এই

সকল দ্রব্যের উৎপাদন হইতে মুনাফা বৃদ্ধি পাইবে, মুনাফার সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে। যে সকল লোকের নিকট অতিরিক্ত মুদ্রা সঞ্চিত হয়, তাহারা যে যে দ্রব্য ক্রয় করে, সেই সব দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে সকলের আগে। পরে এই উৎপাদন বৃদ্ধি ক্রমে ক্রমে সমস্ত দ্রব্যের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করে এবং উৎপাদন ব্যবস্থা স্ফীত হইয়া উঠে। মুদ্রাস্ফীতির প্রথম পরিণাম উৎপাদনের কৃত্রিম বৃদ্ধিলাভ। দ্বিতীয়তঃ যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান যোগ্যতার অভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে পারে না, অবাধ প্রতিযোগিতার বাধা ঠেলিয়া উঠিতে পারে না, অথবা কোনক্রমে লোকসান দিয়া টিকিয়া থাকে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে সেই সকল অযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলিও মুনাফা পাইতে থাকে। অযোগ্য অপটু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের বৃদ্ধি বা নিম্নশ্রেণীর জিনিষ বাজারে বাহির হওয়া কোনটাই দেশের পক্ষে প্রকৃত কল্যাণকর নয়। মুদ্রাস্ফীতি জরুরী অবস্থার নীতি, ইহা সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় ঘটে না। মুদ্রাস্ফীতির জন্য যে কৃত্রিম সাহায্য, তাহা চিরকাল থাকিতে পারে না। যখনই ইহা বন্ধ হইবে, তখনই এই প্রতিষ্ঠানগুলি মরিতে আরম্ভ করিবে, তীব্র বেকারসমস্যা ও বাজার মন্দা দেখা দিবে। সমাজে যাহারা বলিষ্ঠ ও সক্ষম, তাহাদেরই প্রতিযোগিতায় দাঁড়ানো উচিত, অযোগ্যকে কৃত্রিম সাহায্য দিয়া দাঁড় করাইলে ভবিষ্যতে কুফল দেখা দিবেই। আর একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে কেবল প্রকৃত মুদ্রাস্ফীতি হইলেই যে এই সকল দেখা দেয়, তাহা নহে,—মুদ্রাস্ফীতি হইবে এইরূপ সত্য বা কাল্পনিক আশঙ্কাতেও এই সকল পরিণাম দৃষ্ট হয়।

ধনবণ্টনের উপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়, মুদ্রার মূল্য কমিয়া যায়। সুতরাং যাহাদের পূর্ব্ব হইতেই সঞ্চিত অর্থ আছে তাহাদের অর্থের অঙ্কের পরিমাণ পূর্ব্ববৎ থাকিলেও সেই অর্থের বাস্তবমূল্য কমিয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থের বিনিময়ে ক্রেতা পূর্ব্বে যে পরিমাণ সম্পদ ক্রয় করিতে পারিত, এখন তাহা অপেক্ষা কম ক্রয় করিতে পারে। যে ব্যাঙ্কে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া তাহার সুদ হইতেই নিজের

খরচ চালাইত সে দেখিতেছে সুদে আর পূর্ব্বের মত চলে না, প্রতিমাসেই আসলে হাত পড়িতেছে। এই যে সকলের অগোচরে গোপনে সম্পদ হস্তান্তরিত হইয়া যায়, ইহাই হইল মুদ্রাস্ফীতির অভিনব ও চমকপ্রদ ফল।

এই হস্তান্তরিত সম্পদ কোথায় যায়? মুদ্রাস্ফীতির ফলে অনেক লোকের আয় ও অর্থ বৃদ্ধি পায়; যাহাদের কোন অর্থ ই ছিল না, তাহারাও অর্থবান হইয়া উঠে। এই সকল লোক প্রচুর বাড়তি অর্থ হাতে পাওয়ায় পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী জিনিষ ক্রয় করে। যাহাদের নির্দ্দিষ্ট আয় তাহাদের নিকট হইতে ইহাদের হাতে সম্পদ হস্তান্তরিত হয়। অতএব মুদ্রাস্ফীতি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জন সাধারণকে বিচিত্রভাবে প্রভাবান্বিত করে—কাহারও সম্পদ বাড়ায়, কাহারও সম্পদ কমায়। সমাজে মোটামুটি তিনটি শ্রেণীর লোক আমরা দেখিতে পাই। (১) যাহারা মূলধন প্রোথিত করিয়া নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ বা ডিভিডেণ্ড বা অনুরূপ আয় পাইয়া থাকে। (২) বেতনভোগী মধ্যবিত্ত ও শ্রমিকশ্রেণী যাহারা শ্রমের বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট বেতন পায়। (৩) ব্যবসায়ী শ্রেণী যাহারা ইচ্ছামত ব্যবসায় বৃদ্ধি বা সঙ্কোচ করিতে পারে।

উপরের আলোচনা পড়িলেই একথা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না যে সকল লোকের আয় নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তাহারা মুদ্রাস্ফীতির ফলে দরিদ্রতর হইয়া যায়। নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য নির্দ্দিষ্ট হারে যাহারা মূলধন খাটাইয়া থাকে তাহারা ধনবান হইলেও মুদ্রাস্ফীতির খারাপ ফলটিই ভোগ করে। তাহাদের মূলধন দীর্ঘ মেয়াদে নির্দ্দিষ্ট চুক্তিতে প্রোথিত থাকার জন্য তাহারা সেই মূলধন অধিক মুনাফার লোভে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিতে পারে না। অতএব অনিচ্ছায় আরোপিত এই মুনাফাহ্রাস তাহাকে স্বীকার করিয়া লইতেই হয়। সক্রিয় ব্যবসায়ী শ্রেণী কিন্তু এই দুর্ভাগ্যের ভোগী নহেন। তাঁহাদের আয় পরিবর্ত্তন-শীল, মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের আয় বৃদ্ধি পায়; অধিকাংশ সময়ই মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে মুনাফা অধিকতর বৃদ্ধি পায়। ব্যবসায়ীগণের কার্য্য হইল দ্রব্য বিক্রয় করা। এই দ্রব্য হয় তাহারা নিজেরা উৎপন্ন করে, অথবা অপরের নিকট ক্রয়

করে। ক্রয় এবং বিক্রয়ের মধ্যে যে কালের ব্যবধান সেই কালটুকুর মধ্যেই নিশ্চয় মূল্য খানিকটা বৃদ্ধি পাইয়াছে—অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া অধিক মূল্যে বিক্রয় করা তাই সম্ভব। ইহা হইতেই মজুতদারী প্রভৃতি দুর্নীতি সমাজে প্রবেশ করে। ব্যবসায়ীগণ যখন দেখেন মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াই চলিয়াছে তখন তাঁহারা মাল বাজারে না ছাড়িয়া গুদামজাত করিয়া রাখেন এবং যথাসম্ভব উচ্চতম মূল্য পাইলে বাজারে বিক্রয় করেন। যাহারা দ্রব্য নিজেরা উৎপাদন করে তাহাদের মুনাফাও কিছু কম হয় না। মোটকথা মুদ্রাস্ফীতির ফলে ব্যবসায়ীশ্রেণীর প্রচুর লাভ হইবার সম্ভাবনা। নির্দ্দিষ্ট বেতনে যাহারা কাজ করে সেই চাকুরিয়া ও শ্রমিকের অবস্থাই প্রণিধানযোগ্য। তাহাদের আয় টাকার অঙ্কে নির্দ্দিষ্ট থাকার জন্য মূল্যবৃদ্ধির সহিত তাহারা দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং তাহাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না। কিন্তু সংঘবদ্ধ শ্রমিকের সক্রিয় চেষ্টায় ধর্ম্মঘট ইত্যাদির সাহায্যে তাহারা আয় খানিকটা বাড়াইয়া লয়। কিন্তু তাহাদের বেতন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পায়, মূল্যস্তরও উচ্চতর হয়। মাহিয়ানা ও মূল্যস্তর পাপচক্রে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। "Wages lag behind prices." তাহাদের বেতনবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধির অনুপাতে কম হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে একমাত্র ব্যবসায়ীশ্রেণী ছাড়া মুদ্রাস্ফীতি অন্যান্য সকল শ্রেণীর স্বার্থের পরিপন্থী।

মুদ্রাস্ফীতি ও ভারতবর্ষ

১৯৩৯-৪৫ এর মহাযুদ্ধে ভারত-সরকারের মুদ্রাস্ফীতি কল্পনাতীত আকার ধারণ করিয়াছিল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ভারতে প্রচলিত নোটের পরিমাণ ছিল ১৭২ কোটি টাকা। যুদ্ধের পরে নোটের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১০৩৪ কোটি টাকা। ইহার সহিত অনুমোদিত ব্যাঙ্কগুলির demand deposit ৪৮২ কোটি টাকা

বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই বিশাল মুদ্রাস্ফীতি কি করিয়া ঘটিয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভারত হইতে মাল বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, বিদেশী ক্রেতা আমাদিগকে মূল্য দিয়াছে; যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারত হইতে খাদ্য ও বহু রকমের সমর সামগ্রী দেওয়া হইয়াছে, এই সব কাজে যুদ্ধরত দেশগুলির নিকট ভারতের পাওনা হইয়াছে বহু কোটি টাকা। স্বর্ণ বা অন্য কোন সামগ্রী দিয়া সেই টাকা শোধ না করিয়া সেই মূল্য ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে ষ্টার্লিং মূলধন হিসাবে সঞ্চিত হইয়াছে। ব্যাঙ্ক অব ইংলণ্ডে এই সঞ্চিত ষ্টার্লিং-এর পরিবর্ত্তে ভারত সরকার যথেচ্ছ পরিমাণে নোট ছাপাইয়াছেন। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী পর্য্যন্ত ষ্টার্লিং তহবিল ৮৭০ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে, টাকার আমানত ২১ কোটি বৃদ্ধি পাইয়াছে, স্বর্ণের পরিমাণ অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে এবং রৌপ্যের পরিমাণ ৭৬ কোটি টাকা হইতে ১৩ কোটি টাকায় নামিয়া গিয়াছে।

প্রচলিত মুদ্রা এবং ক্রয়শক্তির এই বিশাল বৃদ্ধি যখন সংঘটিত হইয়াছে তখন দেশে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে মাত্র শতকরা ২০ ভাগ। অতএব মূল্য যে কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইবে, তাহা সহজে কল্পনা করা যায় না। কল্পনা যাহা করা যায় না, বাস্তব তাহা অপেক্ষা বিস্ময়াবহ। খাদ্য এবং বস্ত্র—জীবন ধারণের এই দুইটি প্রধান সামগ্রীর মূল্য যে স্তরে উঠিয়াছিল তাহা ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকগণের নিকট গবেষণার বিষয় হইয়া থাকিবে। ১০০ টাকায় একমণ চাউল এবং ২০ টাকায় একখানা কাপড় কিনিয়া বাঁচিয়া থাকিবার চেষ্টা এই বাংলাদেশের অধিবাসীকেই করিতে হইয়াছে। জীবনযাত্রার মান যুদ্ধপূর্ব্ব বৎসরের তুলনায় ৪ গুণ হইতে ১০ গুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট আয় সম্পন্ন বিশাল জন-সাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা চরম সীমায় পৌছিয়াছিল। ক্ষুধার তাড়নায় ৩৫ লক্ষ জীবন্ত মানুষ তিল তিল করিয়া মরিয়াছে, পুষ্টি ও ঔষধের অভাবে আরও ২০ লক্ষ লোক আমাদের সভ্যতাকে অভিশাপ দিতে দিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। বাংলার নগরে নগরে প্রাসাদ আর অট্টালিকার পার্শ্ব দিয়া অগণিত নগ্ন মানুষের মিছিল আমাদের

সভ্যতার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। বাংলার এই দুর্ভাগ্যের কথা বহু শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালী ব্যথিতচিত্তে স্মরণ করিবে।

কেবল তাহাই নহে, মুদ্রাস্ফীতির ফলে আসিয়াছে দেশজোড়া মজুতদারী, চোরাকারবারী আর মুনাফা শিকারের ঘৃণ্য মনোবৃত্তি। আমরা দেখিয়াছি মুদ্রাস্ফীতিতে সকলের অসুবিধা—সুবিধা হইল একমাত্র মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীর—যাহারা নিম্নমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিবার সুযোগ পায়। মুদ্রাস্ফীতি ব্যবসায়ীগণের মধ্যে রক্তপিপাসা ও জুয়াড়ী মনোবৃত্তি জাগাইয়া দেয়। দেশীয় ধনপতিগণ বলেন, মূল্যবৃদ্ধির কারণ মুদ্রাস্ফীতি; সরকার মূল্য-বৃদ্ধির দায়িত্ব চাপান চোরাকারবারীর উপর। উভয়েই আংশিক সত্য। চোরা-কারবার দুষ্ট ব্যাধির মত সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে, কেবল অন্ধগণ তাহা অস্বীকার করিবে। কিন্তু এই দুষ্ট ব্যাধির বীজাণু মুদ্রাস্ফীতির মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে।

কোন এক লব্ধ-প্রতিষ্ঠ অর্থনীতিবিদ দস্যুবৃত্তিকে আর মুদ্রাস্ফীতিকে একই পর্য্যায়ে ফেলিয়াছেন। উভয়ের দ্বারাই মানুষের নিকট হইতে তাহার অর্জ্জিত সম্পদ বলপূর্ব্বক ছিনাইয়া লওয়া হয়। তবে প্রভেদ একটু আছে। দস্যুতা প্রত্যক্ষগোচর, মুদ্রাস্ফীতি অপ্রত্যক্ষ; দস্যুবৃত্তি আকস্মিক ঘটনা, মুদ্রাস্ফীতি প্রণালীবদ্ধ লুণ্ঠন; দস্যুতার ফলভোগ করে দুই চারি জন আর মুদ্রাস্ফীতির কবলে পড়িয়া সমগ্র জাতি দুর্দ্দশা ভোগ করে; দস্যুকে অভিযুক্ত করিবার সুযোগ পাওয়া যায় কিন্তু **inflation is legal.** এই উপমা যে অতিরঞ্জন নয়, তাহা সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হইয়াছে ১৯৪৩ সালের বাংলায় ও আংশিক ভাবে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে।

দ্রব্যের চাহিদা ও মূল্য যেখানে ক্রমাগতই বাড়িয়া চলে, ক্রয় করিয়া বিক্রয় করিতে পারিলেই যেখানে লাভ সুনিশ্চিত সেখানে ছোট বড় সকল রকম ব্যবসায়ীর পক্ষেই লাভ করা অতি সহজ। এই পরিস্থিতির সুযোগ লইয়া দেশে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান গজাইয়া উঠিয়াছে এবং সাময়িকভাবে

তাহারা লাভও করিয়াছে বিস্তর। সারা দেশময় অর্থের লেনদেন বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার জন্য দেশের সর্ব্বত্র Bank, Insurance Company প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাঁচ বৎসরে অন্ততঃ ৪৫০টি নূতন ব্যাঙ্কের অফিস খোলা হইয়াছে। পুরাতন ব্যাঙ্কগুলির কাজ বাড়িয়াছে বিস্তর। যে বৎসর অভাবে, অনটনে অনশনে দেশে লাখে লাখে লোক মরিয়াছে সেই বৎসরই ভারতের সর্ব্বত্র ইনসিওরেন্স কোম্পানীগুলি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সাফল্যলাভ করিয়াছে। মুদ্রাস্ফীতির প্রেরণায় নূতন শিল্প-প্রতিষ্ঠান কারখানা পর্য্যন্ত গড়িয়া উঠিয়াছে। শিল্পপতিকে দ্রব্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয় নাই, ফ্যাক্টরী হইতে কোন প্রকারে বাহির করিতে পারিলেই দ্রব্য উচ্চমূল্যে কাড়াকাড়ি করিয়া বিক্রীত হইয়াছে—বিক্রয় সম্বন্ধে একটুও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইতে হয় নাই। এই অবস্থায় শিল্পের বহুল প্রসার হওয়াই স্বাভাবিক।

ব্যাঙ্ক, ব্যবসায়, শিল্প প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকের বেতন বিশেষ করিয়া নিপুণ শ্রমিকের বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে। কলকারখানা প্রভৃতিতে অনেক বেশী লোক নিযুক্ত হইয়াছে। গৃহস্থের ভৃত্য, বাগানের মালী, বাজারের মোটবাহী কুলী—এই সকলের অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হইয়াছে। কতকগুলি শ্রেণীর শ্রমিক একটু বিশেষ সুবিধা উপভোগ করিয়াছে। অবশ্য প্রয়োজনের অনুপাতে ইহাদের বেতন-বৃদ্ধিও পর্য্যাপ্ত হয় নাই। তথাপি দুর্ভোগের সর্ব্বাপেক্ষা ছোট অংশীদার ইহারাই। কিন্তু সমাজের বিশালতম অংশ—গ্রামের অগণিত ভূমিহীন কৃষক, কলকারখানার সাধারণ শ্রমিক, সহরের চাকুরীজীবী—তাহাদের দুঃখভোগ অভাব অনটন সকল সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিবার সরকারী চেষ্টা কতখানি হইয়াছে এইবার তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। প্রথম দিকে সরকার স্বীকারই করেন নাই মূল্যবৃদ্ধির জন্য দায়ী মুদ্রাস্ফীতি। পরে অবশ্য স্বীকার করিয়াছেন কিন্তু রোধ করিবার চেষ্টা প্রায় নিষ্ফল হইয়াছে। সরকারের সুপ্রচুর অপ্রয়োজনীয় ব্যয় সংক্ষেপ করা উচিত ছিল কিন্তু আমলাতান্ত্রিক অকর্ম্মণ্যতায় তাহা সম্ভব হয়

নাই। যুদ্ধের জন্য অর্থ অন্য উপায়ে সংগ্রহ করা উচিত ছিল। রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব, শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষমতা হস্তান্তরে একান্ত অনিচ্ছার জন্য সমস্ত প্রয়াস ও প্রচার ব্যর্থ হইয়াছে। পূর্ণস্বাধীনতার সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করিয়া ভারতীয় সকল দলকে লইয়া কেন্দ্রীয় জাতীয় গভর্ণমেণ্ট গঠন করিলে ভারত স্বেচ্ছায় ও সানন্দে যুদ্ধজয় ও যুদ্ধব্যয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিত। খাদ্য শস্য বস্ত্র প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যগুলির উৎপাদন যৎপরোনাস্তি বৃদ্ধি করা উচিত ছিল। অতিরিক্ত আয়ের উপর সুউচ্চহারে আয়কর আরোপ করা কর্ত্তব্য ছিল, জনসাধারণের সঞ্চয় হইতে বিশাল পরিমাণ ঋণ লইয়া যুদ্ধের ব্যয় নির্ব্বাহ করা উচিত ছিল। বলা বাহুল্য এইগুলির মধ্যে কোনটাই বিশেষ দক্ষতার সহিত করা হয় নাই। কঠোর মূল্যনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করা উচিত ছিল, পূর্ব্বাহ্ণেই রেশনিং ব্যবস্থা প্রচলন করা প্রয়োজন ছিল। এইগুলি ঠিকভাবে যথা সময়ে করা হয় নাই বলিয়া দুঃখভোগ সমধিক হইয়াছিল। ব্যবসায়ীর অসাধুতা ও আমলাতন্ত্রের অপদার্থতা মিলিয়া বাংলার অর্থ নৈতিক বনিয়াদ ভাঙ্গিয়া দিয়াছে।

মুদ্রাস্ফীতির অবসান হইয়াছে কিন্তু তাহার জের অনেকদিন চলিবে। যে সমস্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়, ব্যাঙ্ক গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদের সমস্যা অত্যন্ত জটিল। মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ হইয়া যাওয়ায় এগুলি যদি একে একে উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করে তবে এক ভয়াবহ বেকার সমস্যা এবং অন্নবস্ত্র সঙ্কটের মধ্যে দেশ পুনরায় গিয়া পড়িবে। যে অতিরিক্ত নোট বাজারে চালু হইয়াছে তাহাকে আকস্মিকভাবে টানিয়া লইলে অবস্থা সঙ্গীন হইবে। মুদ্রা সঙ্কোচের পরিণাম মোটেই মঙ্গলকর নয়।" "Inflation is unjust, deflation is inexpedient."

আমরা যাহাতে একটি সঙ্কটের মধ্য হইতে অন্য একটি গুরুতর সঙ্কটের মধ্যে গিয়া না পড়ি, সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। সমরায়োজনের কারখানা গুলি তুলিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন সাধারণ শিল্প গড়িয়া তুলিতে হইবে।

এইসব নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচুর পরিমাণে নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য উৎপন্ন হইলেই মূল্যস্তর নামিয়া যাইবে। ইহাদের সহিত প্রয়োজন, কঠোর সরকারী নিয়ন্ত্রনাধীনে ধীরে ধীরে অথচ সামঞ্জস্য বজায় রাখিয়া মূল্যহ্রাস, মজুরীহ্রাস, বেতনহ্রাস—কৃষিজাত দ্রব্য ও শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যা

ভারতের অবর্ণনীয় দুঃখ দারিদ্র্যের কথা আমরা জানি। এই দারিদ্র্যের পরিণাম ভারতীয়গণের স্বাস্থ্যের শোচনীয় দৈন্য, অকালমৃত্যু, অত্যধিক শিশুমৃত্যু, পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ, অনাহার ও মড়ক। এই দারিদ্র্যের বহুপ্রকার কারণ দেখানো হইয়া থাকে। সরকারী মহল দেখাইতে চেষ্টা করেন—দারিদ্র্যের দায়িত্ব ভারতবাসীর—তাঁহারা বলেন ভারতের দারিদ্র্যের কারণ হইতেছে অত্যুচ্চ জন্মহার এবং দ্রুত বর্দ্ধমান জনসংখ্যা। দশ বৎসরে যে দেশে পাঁচ কোটি লোক বাড়িয়া যায় সে দেশের দুরবস্থা দূর হইবে কেমন করিয়া।

১৯৪১ সনের লোকগণনায় ভারতের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে চল্লিশ কোটির কিছু উপরে। ১৯৩১ সনে এই সংখ্যা ছিল ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮। ১৯২১ সনে ছিল ৩১,৮৮,৪২,৩৫১। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সনে শতকরা দশজন লোক বাড়িয়াছে। ১৯৩১ হইতে ১৯৪১ সনে লোক বৃদ্ধি হইয়াছে শতকরা ১৫ জন।

ভারতের এই লোকসংখ্যা বৃদ্ধিতে অনেকেই শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। ইহা এমন একটি বিশেষ সমস্যা যাহার সমাধান সহজ নয়। অনেকে মনে করেন ভারতের দুঃসহ দারিদ্র্য ইহা দ্বারা আরও বৃদ্ধি পাইবে। একেই তো ভারতবাসী আজ অনাহারে অর্দ্ধাহারে কালাতিপাত করিতেছে। দুর্ভিক্ষ মহামারী ভারতবাসীর চিরসঙ্গী, রোগের হাত হইতে মুক্ত হইবার, রোগকে প্রতিরোধ

করিবার সামান্য শক্তিটুকুও তাহার নাই—সেখানে লোকবৃদ্ধি যে দারিদ্র্যের মাত্রাই বৃদ্ধি করিবে, ইহাতে সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে।

ইহার বিরুদ্ধবাদীরা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন ভারতের জনসংখ্যা অত্যধিক নয়। সরকারী ঔদাসীন্য, ব্যবসাবাণিজ্যে সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণই আসলে দারিদ্র্যের একমাত্র কারণ। তাঁহারা বলেন ভারত over populated নয়, বরং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় under populated. ভারত দরিদ্র তাহার কারণ ভারতের সংখ্যা নয়, ভারত দরিদ্র তাহার কারণ ভারতবাসীর খাটিবার সুযোগ নাই। বিদেশী সরকার ও বিদেশী বণিকের স্বার্থ ভারতকে রক্ষা করা নয়, শোষণই তাহার প্রধান লক্ষ্য। ইহার ফলে ভারতে দুঃসহ দারিদ্র্য দেখা দিয়াছে, ভারতের দারিদ্র্য আজ বিশ্ববিশ্রুত হইয়াছে। শাসন কার্য্যে যদি ভারতবাসীর অধিকার থাকিত, ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিত, বেকার ও ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়াইত না। আসল সমস্যা ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি নয়, আসল সমস্যা ভারতের এই জনশক্তিকে কাজে লাগাইয়া দারিদ্র্য মোচনের ব্যবস্থা।

এই দুইটি মতবাদের মধ্যে কোনটি ঠিক? অত্যধিক জনসংখ্যা বা অত্যল্প জনসংখ্যা বলিতে আমরা কি বুঝি? একথা মনে রাখা দরকার যে যখন আমরা জনাধিক্য বা জনাল্পতার কথা বলি, তখন আমাদের মনে থাকে একটি সর্ব্বোত্তম জনসংখ্যার ধারণা। যে কোনও দেশের পক্ষে একটি বিশেষ সময়ে এবং বিশেষ অবস্থায় একটি সুনির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোত্তম সংখ্যা থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদ, বৈজ্ঞানিক উন্নতি, দেশবাসীর মানসিক সংগঠন, আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি প্রভৃতির দ্বারাই এই সর্ব্বোত্তম সংখ্যা নির্দ্ধারিত হয়। একটি দেশে তার কৃষি শিল্পব্যবসায় বাণিজ্য সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালনার জন্য একটি বিশেষ জনসংখ্যার প্রয়োজন। প্রকৃত জনসংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম হইলে, শিল্প বা কৃষি যতখানি উৎপাদনশীল হইতে পারিত, শ্রম ও শ্রমিকের অভাবে ততখানি পারে না। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি প্রাকৃতিক-সম্পদ-বহুল জনবিরল দেশগুলির এই অবস্থা।

আবার যে কোন দেশেরই শিল্প বা কৃষি যতগুলি লোককে প্রতিপালন করিতে পারে তাহার একটি সীমা আছে। যথেচ্ছ লোক একটি নির্দ্দিষ্ট দেশের সীমাবদ্ধ সম্পদের উপর বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। সর্ব্বোত্তম সংখ্যা হইতেছে সেই সংখ্যা যাহা অপেক্ষা প্রকৃত জনসংখ্যা কম হইলে মাথা পিছু উৎপাদন সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইতে পারে না এবং যাহার অপেক্ষা বেশী হইলে মাথা পিছু উৎপাদন কমিতে আরম্ভ করে। অবশ্য এই সর্ব্বোত্তম সংখ্যাটা অনবরত পরিবর্ত্তনশীল। যে দেশের জনসংখ্যা এই সর্ব্বোত্তম সংখ্যা অপেক্ষা বেশী তাহাকে বলা হয় over-populated; যে দেশের জনসংখ্যা ইহা অপেক্ষা কম তাহাকে বলা হয় under-populated.

ভারতের জনসংখ্যা সমস্যার বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতে হইবে এই দৃষ্টিভঙ্গী ও পরিপ্রেক্ষিত সম্মুখে রাখিয়া। ভারতের আয়তন ১৮ লক্ষ বর্গমাইল সুতরাং প্রতি বর্গ মাইলে দুইশতের কিছু অধিক লোক বাস করে। বিভিন্ন প্রদেশের বসতির ঘনতার মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত প্রকট। বাংলা দেশে প্রতি বর্গমাইলে ৭০০ জনের বেশী বাস করে, বিহার ও উড়িষ্যায় ৪৬০, বোম্বাই প্রদেশে ১৮০, আসামে ১৬০, রাজপুতনায় ৫০। অতএব সমস্যাটার রূপ সকল স্থানে সমান নয়, একটি প্রদেশে যদি জনাধিক্য থাকে অন্য প্রদেশে তাহা না থাকিতে পারে।

ভারতের নৈসর্গিক সম্পদের কথা মনে করিলে ভারতের বর্ত্তমান জনসংখ্যাকে কোনক্রমেই অত্যধিক বলা চলে না। এই নৈসর্গিক সম্পদের উপর নির্ভর করিয়া ৪০ কোটির বেশী অধিবাসী বাঁচিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে নৈসর্গিক সম্পদ খাইয়া অথবা পরিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। বাঁচিতে হইলে প্রয়োজন খাদ্য, বস্ত্র ও গৃহ। এইগুলি নৈসর্গিক সম্পদ হইতে শিল্প ও কৃষির সাহায্যে উৎপন্ন হয়। অতএব দেশের জনসংখ্যার আধিক্য বা অল্পতা বিচার করিতে হইবে কেবল দেশের আয়তন দেখিয়া নয়, দেশের নৈসর্গিক সম্পদ দেখিয়াও নয়—দেশের সমগ্র কৃষিবল ও

শিল্পবল কি পরিমাণ ঐশ্বর্য্য সৃষ্টি করিতে পারে তাহা দেখিয়া অর্থাৎ মোট খাদ্য উৎপাদন, বস্ত্র উৎপাদন, ও গৃহনির্ম্মাণের পরিমাণের উপর।

প্রতি বর্গ মাইলে বিলাতে লোকসংখ্যা ৬৮৫, বেলজিয়ামে ৬৫৮ আর ভারতে ২২০। কিন্তু ইহা হইতেই এই সিদ্ধান্ত করা ভুল যে এই দেশগুলি যদি over-populated না হয় তবে ভারতবর্ষও over-populated হইতে পারে না। বসতির ঘনতাই একমাত্র মাপকাঠি নয়। জনসাধারণের শিল্পপ্রতিভা ব্যবসায় বাণিজ্যে অগ্রগতি—এই গুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মাপকাঠি। শিল্প, কৃষি ও ব্যবসায় বাণিজ্য যদি অত্যন্ত উন্নত হয় তবে এক বর্গ মাইলে ১০০০ লোক স্বচ্ছন্দভাবে বিলাস ও প্রাচুর্য্যের সহিত বাস করিতে পারে কিন্তু শিল্প ও কৃষি যদি অনুন্নত হয় তবে এক বর্গ মাইলে ১০০ জন লোকও বাঁচিতে পারে না। আমাদের অবস্থা তাই। কৃষিপ্রধান দেশ অপেক্ষা শিল্পপ্রধান দেশে অধিক সংখ্যক লোক বাস করিতে পারে। ভারত আজিও কৃষিপ্রধান, আগামী অনেক বৎসর এইরূপই থাকিবে। সেইজন্য অন্যান্য শিল্পপ্রধান দেশের সঙ্গে ইহার তুলনা ভ্রমাত্মক।

এ কথা অবশ্য সত্য যে ভারতের বর্ত্তমান নৈসর্গিক সম্পদগুলিকে ব্যবহার করিয়া শিল্প এবং কৃষির প্রভূত উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে। ভারতে কৃষিকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে উন্নত করিলে, শিল্পকে বিস্তৃত করিলে ৪০ কোটি অধিবাসী কেন ৮০ কোটি অধিবাসীও সুখে জীবন ধারণ করিতে পারে। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা হইতে শিল্প, কৃষি বাণিজ্যের ঐ ধরণের উন্নতি করিতে হইলে অনেক সময় প্রয়োজন—অন্ততঃ ৩০।৪০ বৎসর। কিন্তু ৪০ বৎসর পরে যে খাদ্য ও বস্ত্র উৎপন্ন হইবে তাহার উপর নির্ভর করিয়া আজিকার ভারতবাসী বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। তাহাকে বাঁচিতে হইলে খাদ্য বস্ত্র গৃহ তাহার এখনই প্রয়োজন। ভারতে কি হইলে কি হইতে পারিত —জনসংখ্যা সমস্যার আলোচনায় সে প্রশ্ন অবান্তর। কৃষি যদি অত্যন্ত উন্নত হয় তাহা হইলেও একটি কৃষিপ্রধান দেশে প্রতি বর্গ মাইলে ২০০ জন লোকের

বেশী সভ্যমানুষের উপযোগী হইয়া থাকিতে পারে না। ভারতে কৃষি সর্ব্বাপেক্ষা পশ্চাৎপদ। তাহা ব্যতীত অনেক প্রদেশে ৪০০, ৫০০, ৭০০ লোক বাস করে। অতএব এই নিশ্চিন্ত সিদ্ধান্তে আমরা উপনীত হইতে পারি যে বর্ত্তমান উৎপাদনের অনুপাতে ভারতবর্ষ overpopulated এবং এই overpopulation বাংলা প্রভৃতি কয়েকটি প্রদেশে অত্যন্ত প্রকট।

বৎসরের পর বৎসর ভারতে বিভিন্ন স্থানে যে দুর্ভিক্ষ মড়ক দেখা যায় তাহাকে Malthusএর positive check বলা যাইতে পারে। ডক্টর রাধাকমল মুখার্জ্জি তাঁর "Food planning for 400 millions" পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে প্রতিবৎসর ভারতে প্রয়োজন অপেক্ষা শতকরা ১২ ভাগ খাদ্য কম উৎপন্ন হয়। শিল্পজাত দ্রব্যের কথা না বলাই ভাল। ভারতের জনসাধারণের বিপুলতম অংশ শিল্পজাত দ্রব্য অত্যন্তই অল্প ব্যবহার করে—পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় একেবারেই অকিঞ্চিৎকর।

আমাদের সিদ্ধান্তকে কেহ যেন ভুল না বুঝেন। বর্ত্তমান উৎপাদনের তুলনায় ভারতের জনসংখ্যা অধিক এই কথার তাৎপর্য্য ইহা নয় যে অত্যধিক জনসংখ্যাই দারিদ্র্যের কারণ। দারিদ্র্যের কারণ—অত্যল্প উৎপাদন, অনুন্নত কৃষি, সঙ্কুচিত শিল্প, অপ্রসারিত বাণিজ্য। ইহার সমস্ত দায়িত্ব সরকারের। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ যে সর্ব্বদাই ঘোষণা করিয়া থাকেন—India is overpopulated—তাহা অত্যন্ত দুরভিসন্ধিপূর্ণ। বাণিজ্য যে প্রসারিত হয় নাই, শিল্প যে বিস্তৃতিলাভ করে নাই, কৃষি যে পঞ্চদশ শতাব্দীর অবস্থায় পড়িয়া আছে তাহার প্রধানতম কারণ সরকারী ঔদাসীন্য। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতবর্ষ overpopulated কিন্তু এই overpopulationএর দায়িত্ব সরকারের, ভারতবাসীর নহে।

জনাধিক্য সমস্যার সমাধান করিতে হইলে প্রথম করণীয়, উৎপাদন বৃদ্ধি—কৃষির উন্নতি, শিল্পের প্রসার, ব্যবসায়ের অগ্রগতি। আজ নানারকম যুদ্ধোত্তর শিল্পপরিকল্পনার, কৃষি পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে। পরিকল্পনার সাহায্যে

দেশের অর্থনৈতিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের দ্বারাই জনাধিক্যের প্রকৃত স্থায়ী সমাধান হইতে পারে। আধুনিক বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে কৃষি পরিচালনা করিলে খাদ্যোৎপাদন ৪ গুণ বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। শিল্পের সম্ভাবনীয়তা অপরিসীম। ৪০ কোটি লোক লইয়া ভারত আজ overpopulated কিন্তু ভবিষ্যতে কোনদিন ৮০ কোটি লোক লইয়াও ভারত under populated থাকিতে পারে।

কিন্তু ভারতের এই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—এই কল্পনা কবে বাস্তবে পরিণত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সমস্ত অবস্থা যদি অনুকূল হয়, সব সুযোগ যদি সুলভ হয় তবুও ৩০।৪০ বৎসরের কমে কিছু হইবে না। ইত্যবসরে আমাদের কি করণীয় কিছুই নাই? মূলধনের অভাব, শিক্ষার অভাব, স্বাস্থ্যের দৈন্য, দীর্ঘদিনের শ্রম বিমুখতা এই সকল বাধা তো আছে। তবু ইহার মধ্যেই জনশক্তির অযথা অপচয় নিবারণ করিতে হইবে—জনসাধারণের কর্ম্মক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। শিশু মৃত্যুর ভয়াবহ হার নিবারণ করিতে হইবে—অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব বহন করিয়া যেখানে নারীশক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছে সেখানে বিবাহ ও জন্মনিয়ন্ত্রণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। নারী পুরুষের সমবেত শক্তিদ্বারা দেশের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিতে হইবে। দেশের অর্দ্ধেক লোক যদি অর্থার্জ্জনে সাহায্য না করে তবে দেশের দারিদ্র্য মোচনের সম্ভাবনা কোথায়? শারীরিক ও মানসিক শ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিতে পারে এরূপ পুরুষের সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রতি দশহাজারে ৪৭২৮ জন, এইরূপ নারীর সংখ্যা ৪৬৩৭ জন। এই হিসাবে ৪০ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে প্রায় ২০ কোটি নরনারী প্রত্যক্ষভাবে অর্থোপার্জ্জনে সহায় হইতে পারে। ঐশ্বর্য্যের এত বড় উপকরণ যাহার জাতি হিসাবে তাহার দারিদ্র্য বিস্ময়ের কারণ!

জাতীয়তাবাদ ও তাহার মূল্য

জাতীয়তার ভিত্তিতে মানবসমাজ বিভক্ত হওয়ার ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ভূপৃষ্ঠকে প্রকৃতিই বিভিন্ন সীমারেখায় বিভক্ত করিয়াছিল। তাহারই সুযোগ লইয়া আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে মানুষ বিভিন্ন ভূখণ্ডকে আশ্রয় করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। যাযাবর মানুষ এইরূপেই স্থানে স্থানে সম্প্রদায়রূপে একদিন প্রতিষ্ঠিত হয়। মানবসমাজের প্রথম অবস্থায় ইহাদের সাম্প্রদায়িক চেতনাবোধ ছিল উগ্র, এক সম্প্রদায়ের উপর অন্য সম্প্রদায় যখন আধিপত্য করিতে আসিত আক্রান্ত সম্প্রদায়ের নিকট হইতেই তাহারা বাধা পাইত। পরাজিত সম্প্রদায় বিজয়ীর প্রভাব মানিয়া লইত। প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও অন্যান্য কারণে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে গিয়া বাস করিত। নানা কারণে বাধ্য হইয়া একই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বাস করিতে লাগিল, ইহার ফলে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বের উগ্র সাম্প্রদায়িক চেতনা মন্দীভূত হইতে লাগিল, বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন রাজ্য হিসাবে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল।

জাতীয়তার মূল বুঝিতে গেলে সমাজের ও রাষ্ট্রের ইতিহাসের গোড়ার কথাগুলি মনে রাখা দরকার। এক একটি ভৌগোলিক সীমা লইয়া যে রাজ্য সে রাজ্যের একজন করিয়া রাজা থাকিত। এই রাজা ব্যক্তিটি আসলে কিন্তু দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী সম্প্রদায়ের দলপতি। সময়ে সময়ে অন্য রাজ্যের রাজা আসিয়া রাজ্য আক্রমণ করিত। রাজ্যরক্ষা তখন রাজারই কর্ত্তব্য ছিল। সৈন্যগণ রাজার বেতনভোগী কর্ম্মচারী। রাজ্য রক্ষার সঙ্গে দেশের লোকের কোন সম্পর্ক ছিল না। নূতন রাজা হইলে দেশের লোক তাহার বশ্যতা স্বীকার করিত। সাধারণ লোক জানিত রাজার প্রাপ্য রাজকর তাহার দেয়, হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান, দেশী বা বিদেশী যে কোন রাজাকে কর দিয়াই

তাহারা মুক্ত, রাজা তাহার নিজের গরজেই রাজ্য রক্ষা করিবে। কেবল আমাদের দেশেই নয়, জগতের সর্ব্বত্র তখন ছিল এই অবস্থা, বিদেশী রাজাকে মানিয়া লইতে ইংলণ্ডের লোকও সেদিন তেমন আপত্তি করে নাই। বলা বাহুল্য জাতীয়ভাব বা ন্যাশান্যালিজমের তখনও জন্ম হয় নাই।

কিন্তু ক্রমে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। দেশের মধ্যে একদল লোক প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল। রাজ্য পরিচালনায় তাহারা অংশ গ্রহণ করিতে লাগিল। রাজ্য আক্রান্ত ও পরহস্তগত হইলে ইহাদের প্রভুত্বলোপের ভয় ছিল। তাই রাজার সঙ্গে ইহারা একযোগে শত্রুসৈন্যকে বাধা দিতে লাগিল। রাজ্যরক্ষা এখন আর একমাত্র রাজার কর্ত্তব্য রহিল না। রাজার পাশে রাজ্যের সামন্তগণও আসিয়া দাঁড়াইল। জাতীয়তার সূত্রপাত এইখানে। 'আমার রাজা' 'আমার দেশ' 'আমার জাতি' এই অনুভূতি ও চেতনার সঞ্চার এই সময়েই।

প্রকৃত জাতীয়তা তখনও গড়িয়া ওঠে নাই। বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে শিল্প-বিপ্লব হইল, তাহার ফলে 'জনসাধারণ' নামে এক নূতন শক্তির আবির্ভাব হইল। এই জনসাধারণ ক্রমে ক্রমে রাজার প্রভাব খর্ব্ব করিয়া রাজ্য-শাসন ব্যবস্থায় অসামান্য প্রভাব বিস্তার করিল। পৃথিবীতে এই সাধারণ তন্ত্র, গণতন্ত্র বা ডিমোক্রাসির জন্ম হইতেই জাতীয়তার ভাব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। দেশে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতে লাগিল তাহা বিক্রয়ের জন্য বাহিরে বাজার প্রয়োজন হইল। এ প্রয়োজন জনসাধারণের প্রয়োজন, রাজার প্রয়োজন নহে। রাজা এই ব্যাপারে জনসাধারণকে সাহায্য করিত মাত্র। বিভিন্ন দেশের মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল জনসাধারণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে নব জাতীয়তা জন্মলাভ করিল।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে একজাতিত্বের বোধ হইতে জাতীয়তাবাদের জন্ম। "জাতি হইতেছে এমন একটি লোকসমষ্টি যাহারা অবিচ্ছিন্নভাবে এক ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুদিন ধরিয়া বাস করিতেছে, এক ভাষা বলে, যাহাদের সংস্কৃতি এক, আচার ব্যবহার এক, ঐতিহ্য ও ধর্ম্ম এক, যাহাদের মানসিক সংগঠন

এক প্রকারের এবং যাহাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা প্রণালীও এক রকমের।” এইরূপ একটি মানবগোষ্ঠীর প্রত্যেকেই গোষ্ঠীর প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করে এবং একজাতিত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। জাতীয়তাবাদের আদর্শ হইতেছে নিজের জাতিকে একটি স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, সভ্যতার সকল দিক হইতে জাতিগত উৎকর্ষ সাধন করা।

সভ্যতার ইতিহাসে জাতীয়তাবাদের দান প্রচুর। ইতিহাসের আদিযুগে বন্যবর্ব্বর মানুষকে সভ্যতার বন্ধনে প্রথমে বাঁধিয়াছিল ধর্ম্ম অর্থাৎ একটি বৃহত্তর অপার্থিব শক্তির প্রতি ভক্তি ও ভয়। তারপর বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন কলহমান মানব গোষ্ঠীকে এক একটি রাজ্যে সুশৃঙ্খলভাবে সুবিন্যস্ত করিয়াছিল জাতীয়তাবাদের আদর্শ। সভ্যতার অগ্রগতি হইয়াছে ব্যষ্টি হইতে সমষ্টির দিকে। বন্যপশুর ন্যায় ব্যষ্টিগত কলহবিবাদ ত্যাগ করিয়া মানুষ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ হইতে শিখিয়াছিল ধর্ম্মের প্রভাবে। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় নিজেদের ক্ষুদ্র দলাদলি ভুলিয়া পরস্পরের প্রতি মমতায় আবদ্ধ হইয়াছিল এবং বিশাল ঐক্যবদ্ধ জাতিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল জাতীয়তাবাদের প্রভাবে। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের যে বিভিন্ন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী পরস্পরের সহিত বিবাদ করিয়া আসিয়াছে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীন বিশাল মহাজাতিরূপে গড়িয়া উঠিবার আগ্রহে অভূতপূর্ব্ব ঐক্যের বন্ধনে তাহারা আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে। “পাঞ্জাবসিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ”—এক-জাতিত্বের দিকে দ্রুত ধাবমান।

একজাতিত্বের বোধ হইতে আসিয়াছে অন্যান্য নানাপ্রকার উন্নতি ও সমৃদ্ধির প্রেরণা। আমার নিজের জাতিকে সব দিক দিয়া বড় করিব, জাতি জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিবে, এই অদম্য আকাঙ্ক্ষা জাতিগত উন্নতির প্রথম সোপান। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রতিযোগিতা ব্যষ্টির উন্নতি সাধন করিয়াছে। সেইরূপ জাতিতে জাতিতে প্রতিযোগিতা জাতির অপরিসীম উৎকর্ষ সাধন করিয়াছে। সাহস, সহনশীলতা, বীরত্ব, স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা, দেশপ্রেম,

আত্মত্যাগ এই সকল মহৎগুণ আমরা লাভ করিয়াছি জাতীয়তাবাদের প্রেরণা হইতে। দুঃখে দুর্য্যোগে দুর্ভাগ্যে, সংগ্রামে সঙ্কটে, বোমাবর্ষণের অগ্নিপরীক্ষায় পুড়িয়া পুড়িয়া জাতীয় গুণগুলি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইয়াছে।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদের দান অপরিসীম। আমার জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিকে উন্নত করিব, সমৃদ্ধ করিব এই বোধ প্রত্যেক ক্ষেত্রে উন্নতির গোড়ার কথা। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম জাতীয় সংস্কৃতিকে কি ভাবে সমৃদ্ধ করে তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি ফ্রানসে, পোলাণ্ডে, ভারতবর্ষে। জাতীয়তাবাদ জাতীয় বিজ্ঞান, জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্প ও কলা কতখানি উন্নত করিতে পারে তাহা আমরা দেখিয়াছি জার্ম্মানীতে, আমেরিকায়, জাপানে।

জাতীয়তাবাদ আমাদের শিক্ষা দিয়াছে—আত্মজ্ঞান, আত্মমর্য্যাদা। পুরাতনের প্রতি শ্রদ্ধা, অতীতের সহিত সচেতন সম্বন্ধ, ক্রমোন্নতিশীল মানবগোষ্ঠীর ধারাবাহিকতার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে আমরা পারি আমাদের জাতীয়তাবাদের জন্য। "We are what we are, because of our Past". জাতীয়তার মধ্য দিয়াই অতীত বর্ত্তমানকে প্রভাবান্বিত করে, মহিমান্বিত করে। জাতীয়তাশূন্য একক মানুষ নির্জ্জনদ্বীপে নিঃসঙ্গ-বিচরণকারী আলেকজাণ্ডার সেলকার্কের ন্যায় শ্রেণীহীন, সমাজহীন, আত্মীয়হীন, ইতিহাস-পরিচয়হীন হতভাগ্যের ন্যায়—মূলোৎপাটিত মুমূর্ষু বৃক্ষের মত।

কিন্তু দেশকে উন্নত করিতে হইবে, দেশের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিতে হইবে, ইহার মধ্যে যদি জাতীয়তা সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে কোনও অন্যায় ছিলনা, ইহাতে কাহারও ক্ষতি হইত না। কিন্তু জাতীয়তাবাদের নিকৃষ্ট দিকও আছে। "optima corrupta pessima" সকলের চেয়ে ভাল জিনিষটি কলঙ্কিত হইলে সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট হইয়া যায়। জাতীয়তার ক্ষেত্রে এই উক্তিটি নির্ম্মম ভাবে সত্য। জাতির প্রতি ভালবাসা হইতে আসে জাতীয় অহঙ্কার, জাতীয় আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান হইতে আসে অন্য জাতির প্রতি ঘৃণা, অবহেলা ও বিদ্বেষ।

প্রাচীন সভ্য গ্রীকরা নিজের দেশের বাইরের সকল লোককেই নির্বিচারে বর্ব্বর বলিত। ভারতবর্ষ 'ম্লেচ্ছ' শব্দটিও খুব ভাল অর্থে ব্যবহার করে নাই। আধুনিক কালে সুসভ্য জার্ম্মাণীর বর্ণবিদ্বেষ প্রাচীন কালের অন্ধ গোঁড়ামিকে হার মানাইয়া দেয়। নিজের জাতির সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা অন্য জাতির সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাহীন করিয়া দেয়। অনেক সময় আমরা অপর জাতির নিকট অনেক সদ্‌গুণ শিক্ষা করিতে পারি, অপর জাতির সংস্কৃতি হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া নিজের জাতির সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করিতে পারি কিন্তু প্রবল স্বাজাত্যাভিমান আমাদের পথ রোধ করে। আমার জাতির সমস্ত কিছুই উৎকৃষ্ট আর অপর জাতির সব কিছুই নিকৃষ্ট 'my nation—right or wr. ng' এই মনোবৃত্তিই জাতীয়তাবাদের মারাত্মক কুফল।

দেশে দেশে যে যুদ্ধ বাধে তাহার কারণও এই জাতীয়তাবাদের উগ্রতা। পর জাতির প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেস বৎসরের পর বৎসর পুঞ্জীভূত হইয়া উগ্র জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। বিভিন্ন জাতির মধ্যে সদ্ভাব বিলুপ্ত হয়, সুস্থ, সবল প্রতিযোগিতা লোপ পাইয়া আক্রমণাত্মক বৈরী ভাবে পরিণত হয়, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি বারুদের কারখানার রূপ পরিগ্রহ করে, ক্ষুদ্র একটি স্ফুলিঙ্গ পাতে দাবানল জ্বলিয়া উঠে, পৃথিবী বিপর্যাস্ত হয় বিশ্বগ্রাসী রণতাণ্ডবে। যুদ্ধের অনেকগুলি কারণের মধ্যে জাতিগত ভ্রান্ত ধারণা ও বিদ্বেষ সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী। জাতীয় অহঙ্কার মানুষের অন্যান্য হীন প্রবৃত্তিগুলিকে ইন্ধন সংযোগে জ্বালাইয়া যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

আজ জগতের অর্থনৈতিক অবস্থা এইরূপ যে, অন্য কাহারও অপকার না করিয়া নিজের উন্নতি করিবার উপায় নাই। অন্যকে বঞ্চিত করিয়াই নিজেকে বড় করিতে হইবে। জাতিতে জাতিতে আজ ইহারই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই লইয়াই যুদ্ধবিগ্রহ। গায়ের জোরে এক জাতি অন্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিবে, তাহাকে শোষণ করিবে, তাহার আত্মবিকাশের সুযোগ কাড়িয়া লইবে, ইহাই আজ নিয়ম হইয়া উঠিয়াছে। ইহার চরম পরিণতি ফ্যাসীবাদ। সাম্রাজ্য-

বাদ ইহারই ভদ্র সংস্করণ। জাতীয়তা আজ আক্রমণাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। একের উন্নতির জন্য যদি অন্যকে পিশিয়া মারিতে হয় তবে এই আদর্শে কল্যাণ কোথায়?

দুইটি প্রকাণ্ড যুদ্ধের এতটা মার খাইয়াও মানুষের এই প্রবৃত্তিটি মরিল না—এতখানি রক্তক্ষয়ের পরও জাতীয়তাবাদের নাড়ীটি বেশ সতেজ আছে। জাতীয়তাবাদের এই বিকৃতিটি কিন্তু স্বার্থান্বেষী মানুষের স্বেচ্ছাকৃত। অপরকে শোষণ করিবার আকাঙ্ক্ষা হইতেই এই বিকৃত জাতীয়তাবাদের জন্ম। জাতীয় আত্মম্ভরিতা ও অন্য নানাপ্রকার অবান্তর উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া ধনতন্ত্রের মালিকগণ দেশ জুড়িয়া এই বিকৃত দেশপ্রেম জীয়াইয়া রাখে—শিক্ষা ও সাহিত্যের মধ্য দিয়া এই দেশপ্রেমের প্রচার করা হয়, এইভাবেই যুদ্ধের আবহাওয়া দেশে দেশে তৈরী থাকে।

জাতিপ্রেম নাম ধরি' প্রচণ্ড অন্যায়
ধর্ম্মেরে ভাষাতে চাহে বলের বন্যায়।

ভারতীয় কবি এই সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন শতাব্দীর আরম্ভের সঙ্গে। জাতীয়তাবাদ যে মানবসভ্যতাকে রক্তাক্ত পরিণামের দিকে, নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে লইয়া যাইতেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কথায় কোনও অস্পষ্টতা ছিল না—

ছুটিয়াছে জাতি-প্রেম মৃত্যুর সন্ধানে
বাহি' স্বার্থতরী, গুপ্ত পর্ব্বতের পানে

পৃথিবীর সাম্প্রতিক ইতিহাসের প্রতিটি পৃষ্ঠায় ইহার সাক্ষ্য মিলিবে।

বর্ত্তমান জগৎ বিকৃত জাতীয়তাবাদের কুফল দেখিয়াছে ও বুঝিয়াছে। কিন্তু জাতীয়তাকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে কোন জাতি চাহিতেছে না, পারিতেছেও না।

ইতিহাসের অধ্যায়গুলি জাতীয়তাবাদের প্রভাবে এতখানি সমুজ্জ্বল যে, জাতীয়তা পরিহার বা বর্জ্জন করিবার কথা কেহ চিন্তা করিতেও পারে না।

ইহার অনিষ্টকর প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া আন্তর্জাতিক কল্যাণের সহিত নিজ জাতির কল্যাণকে সামঞ্জস্যে গ্রথিত করিয়া তুলিবার জন্য সকলেই ব্যগ্র। ভবিষ্যতের পৃথিবীতে জাতীয়তাবাদের স্থান কিরূপ হইবে, জাতীয়তাবাদ বাস্তবিকই ভাল না মন্দ এ সম্বন্ধে ডাচ্ রাষ্ট্রসভায় মিষ্টার চার্চিল সম্প্রতি যে অভিভাষণ দিয়াছেন তাহা উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধের শেষ করা যাইতে পারে।

"Is nationalism an evil or a virtue ? Where nationalism means lust for pride and power, craze for supreme domination by weight or force, where it is a senseless urge to be the biggest in the world, it is a danger and a vice.

Where it means love of country and readiness to die for it, where it means love of tradition and culture and a gradual building up across centuries of a social entity dignified by nationhood, it is the first of the virtues.

জাতীয়তার উপাদান—ভারত কি এক জাতি

জাতি হইতেছে এমন একটি লোকসমষ্টি অনেক দিন একই ভূখণ্ডে বাস করার জন্য যাহাদের আচার ব্যবহার এক, জীবন-ধারণের পদ্ধতি এক, ঐতিহ্য ভাষা সংস্কৃতি এক এবং মানসিক সংগঠন এক। এক-জাতিত্বের যে মনোভাব বা গৌরববোধ তাহাকে 'জাতীয়তা' বলা যাইতে পারে। সহজেই বুঝা যায় জাতিত্বের কোন মৌলিক উপাদান নাই ; বিভিন্ন গোষ্ঠীর, সম্প্রদায়ের, বর্ণের লোক একত্র বাস করিতে করিতে কতকগুলি সাধারণ সমগুণ আয়ত্ত করিয়া লয় এবং এক জাতির ভিতর মিশ্রিত হইয়া যায়। প্রকৃতিগত এবং চিন্তাগত ঐক্যই মোটামুটি ভাবে জাতিত্বের মূল উপাদান মনে করা যাইতে পারে।

অবশ্য ইতিহাসে দেখা যায় এক এক যুগে জাতিত্বের এক একটি উপাদান গুরুত্ব ধারণ করিয়াছে। জন্মগত এবং গোষ্ঠীগত ঐক্য জাতিত্বের একটি শক্তিশালী উপাদান বলিয়া পরিগণিত হইত। জাতি শব্দটি জন্মগত একটা ঐক্য মনে করাইয়া দেয়। জন্মগত ঐক্য না থাকিলেও উন্নতিশীল জাতিগঠনের কোন বাধা হয় না। বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় একত্র মিলিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহাদের বৈশিষ্ট্য বিস্মৃত হইয়া এক বিশালতর জাতিতে পরিণত হইয়াছে ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই।

ভৌগোলিক ঐক্য জাতিত্বের একটি উপাদান—কিন্তু এমন দৃষ্টান্ত আছে যেখানে ভৌগোলিক ঐক্য না থাকা সত্ত্বেও একটি বিশিষ্ট লোকসমষ্টিকে একটি নির্দ্দিষ্ট জাতি বলা যাইতে পারে। ইহুদীদের কোন নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই তবু তাহারা একটি জাতি।

মানুষের সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তাচেষ্টার উপর এক সময় ধর্ম্মের প্রভাব ছিল খুবই অধিক। জাতি-সংগঠন কার্য্যে এক সময় ধর্ম্ম উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এক সময় ধর্ম্মের ভিত্তিতে জাতিগঠন অস্বাভাবিক ছিল না কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মগত ঐক্য আর জাতীয়তার অপরিহার্য্য উপাদান নয়।

ভাষাগত ঐক্য—সমগ্র লোকসমষ্টির একই মাতৃভাষা জাতীয়তার একটি প্রবল উপাদান মনে করা হয়। একই ভাষা এবং সংস্কৃতির উপর অনুরাগ আমাদিগকে জাতীয়তায় বোধে উদ্দীপ্ত করে। ভাষাগত ঐক্যকে জাতীয়তার একটি শক্তিশালী উপাদান ধরা হয়। এই জন্যই ভারতীয় জাতীয়তার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-স্বরূপ একটি সর্ব্বভারতীয় রাষ্ট্রভাষা প্রচলিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। একটি সাধারণ সর্ব্বজন বোধ্য ভাষা না হইলে জাতীয়তার প্রচার দুরূহ হইয়া উঠে। তবুও ভাষাগত ঐক্য না থাকিলে যে জাতিগঠন অসম্ভব এ সিদ্ধান্ত ভুল। সুইট্জারল্যাণ্ডের অধিবাসীদিগের তিনটি অংশ তিনটি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে, তবু তাহারা নিঃসন্দেহে একটি জাতি।

এক ধরণের আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রা প্রণালী, এক ঐতিহ্য অনেক

সময়েই জাতিত্বের প্রেরণা আনে কিন্তু কোনটিই জাতিত্বের অবশ্য প্রয়োজনীয় উপাদান নয়।

যাহারা দলবদ্ধভাবে একই শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছে এবং একসঙ্গে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের হইলেও একজাতিত্বে উন্নীত হইতে পারে।

যে সমস্ত উপাদানের কথা এ পর্য্যন্ত বলা হইল সবগুলিই বিভিন্ন সময়ে জাতিগঠনে সাহায্য করিয়াছে কিন্তু জাতিত্বের কোনটিই অপরিহার্য্য অঙ্গ নহে। এক-জাতিত্বের সর্ব্বপ্রধান এবং একমাত্র মাপকাঠি—এক মানসিক সংগঠন, সম মনোভাব, সম আদর্শ, সম অনুভূতি, সম গৌরব বোধ। জাতীয়তা প্রধানতঃ একটি মানসিক বা আধ্যাত্মিক বস্তু—সর্ব্বাংশে অনুভূতি-প্রধান একটা প্রবল চিন্তাধারা। "Nationality like religion is subjective :—nationality is a way of thinking, feeling and writing." সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতায় পণ্ডিত জহরলাল বলিয়াছেন—'জাতীয়তার কোন সুনির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞা নাই, জাতীয়তার স্থান আমাদের মনে।' 'We feel we are a nation and we become a nation.'

এই তাত্ত্বিক আলোচনার ভিত্তিতে আমরা ভারতীয় জাতি-সমস্যা পর্য্যবেক্ষণ করিব। এই কথা সর্ব্বজনবিদিত এবং সর্ব্ববাদি-সম্মত যে ভারতে অনেকগুলি সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং বিশিষ্ট গুণসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী বাস করে, ভারতে অন্ততঃ ১৫টি প্রধান ভাষা আছে এবং প্রত্যেক ভাষাভাষীদিগেরই একটি করিয়া বিশিষ্ট সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জীবনধারণ পদ্ধতি এবং মানসিক সংগঠন আছে। আমাদের কল্পনাকে বহুদূর প্রসারিত করিয়াও আমরা ভাবিতে পারি না যে ভারতের ভাষা এক, সংস্কৃতি এক, ঐতিহ্য এক, অথবা মানসিক সংগঠন এক। উত্তর পশ্চিম সীমান্তের রুক্ষ, তেজস্বী, জবরদস্ত ও বলিষ্ঠ পাঠানের সহিত মৃদু প্রকৃতির, অনুভূতিপ্রবণ, শ্রমকাতর বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের কোন মিল

নাই। আমরা যাহাই বলি না কেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতবর্ষে এক জাতিত্বের সাধারণ প্রচলিত উপাদানগুলি খুঁজিয়া বাহির করা বড়ই কষ্টসাধ্য।

তাহা হইলে আমরা যে শুনিয়াছি ভারত এক জাতি ইহা কি সম্পূর্ণ ভুল? ইহার মূলে কি কোন সত্য নাই? বহু জাতিত্বের সকল লক্ষণ অত্যন্ত পরিস্ফুট থাকা সত্ত্বেও ভারতে এক-জাতিত্বের যে একটা অনুপ্রেরণা আসিয়াছে তাহাও তো অত্যন্ত স্পষ্ট। এক-জাতিত্বের পিছনে কি কোন গভীর সত্য লুকায়িত আছে? ভারতে জাতীয়তা-বোধ উন্মেষের ইতিহাস লক্ষ্য করিলে, জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি আলোচনা করিলে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে সাধারণ শত্রুর সহিত সংগ্রাম করিয়া জাতি গড়িয়া উঠে। ইউরোপের ইতিহাসে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে। ভারতের বহু সংখ্যক জাতি-উপজাতিও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক আদর্শের জন্য সংগ্রাম করিয়া এক-জাতিত্বের প্রেরণা পাইয়াছে।

ভারতের ইতিহাসে দেখিতে পাই অশোক, আকবর, প্রভৃতি পরাক্রমশালী প্রতিভাবান সম্রাটগণ ভারতের সমস্ত প্রদেশগুলিকে একই রাজছত্রতলে মিলিত করিয়া জাতিগঠনের চেষ্টা করিয়াছিলেন—ভারত তাহার বিচিত্র ইতিহাসের মধ্যে বহুবার এক হইয়াছে। কিন্তু এ ঐক্য বজায় থাকে নাই। দুইশত বৎসরের ইংরেজ শাসন বহু কাল পরে ভারতকে পুনরায় এক করিয়াছে। এক আইন, এক শৃঙ্খলা, এক বিচার-পদ্ধতি, একই যন্ত্র সমস্ত ভারতীয়কে একই ভাবে চালাইয়াছে, একই অধীনতার চক্রতলে সকলকে সমানভাবে পেষণ করিয়াছে। ইহা হইতে সহজেই জাগিয়াছে পরস্পরের মধ্যে একটা সহানুভূতি, একই ব্যথায় ব্যথিত্ব। রাষ্ট্রচেতনা যতই সমাজের স্তরে স্তরে পৌছিয়াছে, পরাধীনতার গ্লানি যতই সকলের মনকে আলোড়িত করিয়া তুলিয়াছে, ততই সমস্ত বিভেদের মধ্য হইতে একটি পরমতম ঐক্য জাগিয়া উঠিতেছে। এক সমান দাসত্ব এবং তাহার বিরুদ্ধে জাগ্রত জনতার ঐক্যবদ্ধ অভিযান—ইহারই ভিত্তিতে পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গকে আমরা একজাতি

বলি। এক সংগ্রাম, এক আদর্শ, এক পতাকা, এক সংগঠন ভারতীয় ঐক্যের এই তো শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বলা বাহুল্য এই সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এই আদর্শ স্বাধীনতার আদর্শ, এই পতাকা ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা এবং এই সংগঠন জাতীয় মহাসভা।

কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। সাম্রাজ্য-বাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের চেতনা যখন দেশের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে তখনই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা কেবল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ থাকে নাই। শোষিত অধঃপতিত প্রত্যেকটি জাতি উপজাতি, সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় সমস্ত দেশের সামগ্রিক স্বাধীনতার পরিপূরক হিসাবে নিজেদের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। এতদিনের ঘুমন্ত জাতিগুলি জাতীয়তা বোধের দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া উঠিয়াছে। সকল প্রকার দমননীতির বিরুদ্ধে তাহারা নিজেদের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মহারাষ্ট্রের ধনপতিদের বিরুদ্ধে কর্ণাটকের কৃষকশ্রেণীর সংগ্রাম, যাহা হইতে মহারাষ্ট্র-কর্ণাটক সমস্যা উদ্ভূত, বাঙ্গালী প্রভাবের বিরুদ্ধে নবজাগ্রত বিহারীদের আন্দোলন যাহা হইতে উৎকট বাঙ্গালী-বিহারী সমস্যার উদ্ভব এবং সর্ব্বোপরি প্রদেশে প্রদেশে এবং নিখিলভারতক্ষেত্রে হিন্দু ধনিকশ্রেণীর বিরুদ্ধে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়ের ক্রম-বিবর্দ্ধমান জাতীয় আন্দোলন এই সিদ্ধান্তকেই প্রতিপন্ন করে। এই শেষোক্ত মনোভাব অর্থাৎ উৎকট হিন্দুমুসলিম বিদ্বেষ হইতে ভারতে দুই জাতি তত্ত্বের থিওরী জন্মলাভ করিয়াছে। সমগ্র ভারত যেরূপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এক সংগ্রামে উদ্দীপ্ত হইয়া এক-জাতিত্বের প্রেরণা লাভ করিয়াছে, ভারতে মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে সেইরূপ মুসলমানগণ হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে জাগ্রত হইয়া, দুই জাতিত্বের প্রেরণা পাইয়াছে। এক সংগঠনের নেতৃত্বে এক সংগ্রাম ভারতের জাতীয় ঐক্যকে যতই সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে, সংখ্যালঘু মুসলমান সম্প্রদায় ততই পৃথক-জাতিত্বের দাবী তুলিয়া নিজেদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবী করিতেছে। অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য

এবং প্রামাণ্য ঘটনা হইতেছে যে, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান হোতা এক-জাতি-তত্ত্বের জন্মদাতা এবং সমর্থক ; আর মুসলিম জাতিগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবীর শ্রেষ্ঠ সৈনিক দুই-জাতি-তত্ত্বের রচয়িতা।

'ভারত এক জাতি' ইহা যতখানি সত্য এবং যে কারণে সত্য, 'ভারত দুই জাতি' ইহাও ততখানি সত্য এবং সেই কারণে সত্য। আবার 'ভারত এক জাতি' ইহা যতখানি ভ্রান্ত, 'ভারত দুই জাতি' ইহাও ততখানি ভ্রান্ত। বস্তুতঃ ভারত বহু-জাতি-অধ্যুষিত একটি উপ-মহাদেশ। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবর্গের সুরে সুর মিলাইয়া লর্ড লিনলিথগো ও লর্ড ওয়াভেল ভারতের ভৌগোলিক ঐক্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা বলেন যে, একটি সুসংবদ্ধ সুগঠিত, শক্তিশালী জাতি হিসাবে গড়িয়া উঠিবার জন্য যে ভৌগোলিক ঐক্য একান্ত প্রয়োজন তাহা এইরূপ বিশাল ভূখণ্ডে সম্ভবপর নহে। ভারতের বহুবিঘোষিত ভৌগোলিক ঐক্য একটি myth. একজন পর্য্যটক ইউরোপের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলে যে বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবেন, আসাম হইতে বেলুচিস্থান, কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিলে নৈসর্গিক পরিবেশ, আচার ব্যবহার, জীবনযাত্রার পদ্ধতি ও মানসিক সংগঠনে তাহা অপেক্ষা অধিক বৈচিত্র্য দেখিবেন।

ইহা হইতেই কেহ যেন নিশ্চিতভাবে সিদ্ধান্ত না করেন যে, ভারতে একাধিক স্বতন্ত্র সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হওয়া প্রয়োজন। সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র দুইটি হইবে কি একটি হইবে, কেন্দ্রে কতখানি ক্ষমতা থাকিবে আর প্রদেশে কতখানি থাকিবে—তাহা নির্ভর করিবে বাস্তব অবস্থার উপর।

সভ্যতার অগ্রগতি ক্ষুদ্র হইতে বৃহতের দিকে। আজ মানুষের লক্ষ্য Parliament of Man ও Federation of the world,সেইদিকেই আমাদের অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। সেই আদর্শের অনুকূল বাস্তব অবস্থা পূর্ব্বে সৃষ্টি করা প্রয়োজন। শোষণমুক্ত স্বাধীন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থায় যখন ভারতের কেবল মুসলমান নয়, প্রত্যেকটি উপজাতি ও সম্প্রদায় পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের

অধিকার পাইবে, তখনই তাহারা স্বেচ্ছায় বৃহত্তর স্বার্থবোধে এক হইয়া একটি রাষ্ট্রে মিলিবে। আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ স্বীকৃতিই বাস্তব আত্মনিয়ন্ত্রণকে নিষ্প্রয়োজন করিয়া দিবে। আজিকার বাস্তব অবস্থায় আমরা ভারতকে এক জাতি বলিব না, দুই জাতিও স্বীকার করিব না, ভারতের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের ভাষায় 'A nation in making'. আজিকার দুঃখক্লেশ, সংশয়-অবিশ্বাস মহাজন্মের অপরিহার্য্য বেদনা, ইহার মধ্য হইতেই, ভারতবর্ষ মহাজাতিরূপে গড়িয়া উঠিবে —'পোহায় রজনী, জাগিছে জননী, বিপুল নীড়ে।'

আমাদের খাদ্য-সমস্যা

খাদ্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনায় বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কতকগুলি নীতি বা থিওরি আলোচনা করিয়া লাভ নাই। ১৭৭৫ সাল হইতে ১৮০০ পর্য্যন্ত ভারতে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল ৩টি আর তাহাতে মৃত্যুসংখ্যা ছিল প্রায় সাত লক্ষ। ১৮৭৫ হইতে ১৯০০ পর্য্যন্ত দুর্ভিক্ষের সংখ্যা ১৮ আর মৃত্যুর সংখ্যা দুই কোটি ষাট লক্ষ। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষে একমাত্র বাংলাদেশেই অনাহারে মৃত্যু পঁয়ত্রিশ লক্ষ আর দুর্ভিক্ষের আনুষঙ্গিক মড়কে মৃত্যুসংখ্যা পনের লক্ষ। ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অসংখ্য কুফলের মধ্যে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষগুলি উল্লেখযোগ্য। কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিবার, মনে মনে ভাল করিয়া উপলব্ধি করিবার বিষয় হইতেছে যে, এই দুর্ভিক্ষগুলি, এমন কি বাংলার সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষটিও কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা-কুব্যবস্থা, জুলুম, অত্যাচার, শোষণ ও উদাসীনতার স্বাভাবিক ও অপরিহার্য্য পরিণাম এই দুর্ভিক্ষগুলি। এই দুর্ভিক্ষগুলি ভারতের প্রতি ইতিহাসের

আংশিক বেকার সমস্যাকে দূরীভূত করিতে হইলে কতকগুলি গৌণবৃত্তি অবলম্বন করা উচিত। কুটীরশিল্পের সাহায্যেই এই সকল গৌণবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। এই প্রকার কুটীরশিল্পে বিশেষ সুবিধা হইতেছে এই যে ইহাতে খুব বেশী মূলধন নিয়োগ করিতে হয় না; আবার খুব বেশী দক্ষতার প্রয়োজনও হয় না। নিজের ইচ্ছামত পেশা গ্রহণ বা বর্জন করা যায়।

তাহা ব্যতীত ভারতের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ নারী। এই সম্প্রদায়ের অধিক অংশ—সম্পদ্ উৎপাদন কার্য্যে কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে না। সকল সম্প্রদায়ের নারীর ভিতর অল্পবিস্তর পর্দ্দা প্রথা এখনও চলিতেছে। কুটীর শিল্পের সাহায্যে এই সকল পর্দ্দানশীন নারী জাতীয় আয় বৃদ্ধি করিতে সাহায্য করিতে পারে। কুটীরশিল্প অনেক সময়েই একটি গৃহের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা সকলেই শ্রমবিভাগ করিয়া উৎপাদন কার্য্যে অংশ গ্রহণ করে। দেশের অনেকখানি অব্যবহৃত শক্তি এইভাবে কুটীরশিল্পের সাহায্যে দেশের সম্পদ উৎপাদনে নিযুক্ত হইতে পারে।

সর্ব্বশেষে আমাদের অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন কৃষককুলের industrial habits বা শিল্পের অভ্যাস গড়িয়া তোলার জন্য কুটীর শিল্পের সাহায্য লইতেই হইবে। মানুষ লাফ দিয়া ছাদে উঠিতে পারে না—সিঁড়ি বাহিয়া উঠিতে হয়। কুটীর শিল্প হইবে আমাদের সিঁড়ি—road to factory industries.

এইবার বাংলার কতকগুলি প্রধান কুটীর শিল্পের নামোল্লেখ এবং তাহাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা আলোচনা করা যাইতে পারে।

কুটীরশিল্পের নানারকমভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যাইতে পারে। কিন্তু সচরাচর যে কাঁচা মাল সেই শিল্পে প্রয়োজন হয়, তাহার উপর ভিত্তি করিয়া যে শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে তাহাকেই আমরা গ্রহণ করিয়া থাকি। বাংলার কুটীর শিল্পগুলিকে কাঁচা মালের ভিত্তিতে ভাগ করিলে মোটামুটি এইরূপ

দাঁড়ায়। (১) বস্ত্রশিল্প—তুলা, পশম, এণ্ডি, মুগা ও রেশম শিল্প; হস্তচালিত তাঁতে বস্ত্রবয়ন, গুটীপোকা হইতে রেশম উৎপাদন, সুতা তৈরী ইত্যাদি। (২) ধাতু শিল্প—যেমন পিতল, তামা, এলোমিনিয়ম, কাঁসার বাসনপত্রাদি, ছুরি, কাঁচি, লাঙ্গলের ফলক, তারের পেরেক, কাস্তে, গরুর গাড়ীর চাকার বন্ধনী ইত্যাদি লৌহ ও ইস্পাতশিল্প। (৩) কাষ্ঠ শিল্প—যেমন গৃহের আসবাবপত্র, খেলনা, গরুর গাড়ীর চাকা ইত্যাদি। (৪) চামড়া শিল্প—যেমন চর্ম্মশোধন, জুতা, চটী, চামড়ার নানারকমের ব্যাগ ইত্যাদি নির্ম্মাণ। (৫) বালুকা ও মৃৎশিল্প—যেমন ইট ও টাইল নির্ম্মাণ, মৃৎপাত্রাদি গঠন, মৃন্ময় খেলনা, দেবমূর্ত্তি, পুতুল ইত্যাদি নির্ম্মাণ। (৬) খাদ্য শিল্প—যেমন টিনের কৌটাতে খাদ্য সংরক্ষণ, সবেদা, মিষ্টান্ন, তৈল ইত্যাদি প্রস্তুত। (৭) বিবিধ শিল্প—যেমন বিড়ি তৈরী, কাগজের খেলনা তৈরী, বইবাঁধাই, ঝিনুকের বোতাম তৈরী, হস্তনির্ম্মিত কাগজ উৎপাদন ইত্যাদি।

ইহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইতেছে বস্ত্রশিল্প। কুটীরশিল্পের সাহায্যে যে বস্ত্র উৎপন্ন হয় তাহাকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। 'খাদি' ও দেশী বস্ত্র। 'খাদি এখনও অর্থনৈতিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। খাদির পিছনে আছে অর্থনীতি-বিরুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস, স্বদেশপ্রীতি, এবং সাংগঠনিক নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রতি নিষ্ঠা। স্বাধীন ভারতে খাদি যদি এই অবস্থাতেই থাকিয়া যায়, তবে ইহার অর্থ-নৈতিক ভবিষ্যৎ মোটেই আশাপ্রদ নহে। বাংলায় সর্ব্বত্র বিশেষ করিয়া আরামবাগ, মেদিনীপুরে খাদি উৎপন্ন হয়। দেশী বস্ত্র-শিল্প নবাবী আমল হইতে চলিয়া আসিতেছে। ফরাস-ডাঙ্গা, ধনেখালি, হাওড়া, শান্তিপুর ও ঢাকা প্রভৃতি ইহার জন্য বিখ্যাত। বাংলার শতকরা ২৫ ভাগ বস্ত্র এখনও তাঁতে উৎপন্ন হয়; এবং যথোচিতভাবে পরিচালিত হইলে ইহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

সিল্কের চাষ এবং সিল্ক কেন্দ্র হইতেছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি। মূল্যবান বিলাসের সামগ্রী উৎপাদনে হস্ত নির্ম্মিত সিল্ক খুব উপযোগী। বিভিন্ন ধরণের

মৃৎশিল্প—হাঁড়ি, কলসী, খেলনা, পুতুল দেবমূর্ত্তি—বাংলার সর্ব্বত্র ব্যাপকভাবে প্রচলিত। সাধারণ কুম্ভকারের কার্য্য সর্ব্বত্রই আছে। সূক্ষ্ম মৃৎশিল্পের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে কৃষ্ণনগর। বর্ত্তমানে কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা বাংলার নানাস্থানে বিশেষতঃ কলিকাতায় আসিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছে। সূক্ষ্ম শিল্পের মাপকাঠিতে ইহার মূল্য খুবই বেশী; এবং বিদেশী খেলনার প্রতি আমাদের অযৌক্তিক মোহ কাটিলে, এই শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করিবে। মাদুর, ঝুড়ি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বাংলার একটি শ্রেণী জীবন ধারণ করে। অশিক্ষা এবং কুসংস্কার ইহাদের আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলেও বংশানুক্রমিক নৈপুণ্য ইহাদের অসাধারণ এবং দেশের অবস্থার উন্নতির সহিত এই সকল দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাইবে, এবং এই শিল্পও বৃদ্ধি পাইবে। কাঁসা পিতলের বাসনও কুটীর শিল্পজাত। বহরমপুর, খাগড়া, বংশবাটী ইহার ঐতিহাসিক কেন্দ্র। কাঁসা পিতল কুটীর শিল্পের অপেক্ষা কারখানাতেই ভালভাবে উৎপন্ন হইতে পারে। এই সকল ব্যতীত নানাপ্রকারের খেলনা, কাঠের সরঞ্জাম, গরুর গাড়ীর চাকা, লাঙ্গলের ফলা—কুটীর শিল্পের সাহায্যে উৎপন্ন হয় ও ভবিষ্যতে হইতে পারে।

বর্ত্তমানে যে সকল কুটীর শিল্প বাংলায় রহিয়াছে, তাহাদের অবস্থা নিতান্তই উদ্বেগজনক। সকল প্রকার অসুবিধা ও দুর্ভোগের মধ্য দিয়া তাহাদের কার্য্য চালাইয়া যাইতে হয়, অথচ শ্রমের অনুপাতে পারিশ্রমিক দূরে থাকুক, সামান্য জীবিকাও তাহারা পায় না। কুটীর শিল্পে যে সামান্য মূলধন প্রয়োজন, সেইটুকুর জন্যও তাহাদের নির্ভর করিতে হয় মহাজনদের উপর। তাহারা সমস্ত শিল্পকে গ্রাস করিয়া ফেলে। লাভের অংশ শিল্পী যদি না পায়, শিল্পের অধঃপতন অনিবার্য্য। দুই একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া কুটীর শিল্পকে সজীব এবং উন্নত করা যায়। মূলধনের অভাবে এবং শিক্ষার অভাবে সেই সমস্ত ব্যবহার করিবার সুযোগ তাহারা পায় না। উৎপাদন প্রণালী অত্যন্ত পুরাতন, জরাজীর্ণ, অনুন্নত।

Technical শিক্ষার অভাব, কারখানাজাত সস্তা দ্রব্যের প্রতিযোগিতা, পূর্ব্বের মত patronageএর অভাব কুটীরশিল্পের দুরবস্থার অন্যতম কারণ।

পুঁজির অভাব, শিক্ষার অভাব, আধুনিক যন্ত্রপাতির অভাব, ভালো কাঁচা মালের অভাব, দক্ষ কারিগরের অভাব, সরকারী সহায়তার অভাব—এইসব অভাবগুলিকে দূর করিয়াই কুটীরশিল্প উন্নত করা সম্ভব। পুঁজির অভাব মিটাইবার শ্রেষ্ঠ উপায় হইতেছে সমবায় সমিতি গঠন করা। বর্ত্তমানে যে সকল মহাজন কুটীরশিল্পের কারিগরদের ঋণ দেয়, তাহাদিগকে তাহারা সকল দিক হইতে শোষণ করে। অধিকাংশ কাঁচা মাল এই মহাজনরা সরবরাহ করিয়া থাকে, ফলে অতি নিকৃষ্ট কাঁচামাল চড়াদামে তাহারা পায়। অপর দিকে পূর্ব্ব হইতে ঋণ গ্রহণ করার জন্য তৈরী মাল বাজারের চেয়ে কমদামে এই মহাজনদের নিকট বিক্রয় করিতে তাহারা বাধ্য হয়। এত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও পর্য্যাপ্ত মূলধন বা ভালো যন্ত্রপাতি তাহারা পায় না। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া ঋণ গ্রহণ সমস্যা তাহারা সহজ করিয়া ফেলিতে পারে। সমবায় সমিতির মধ্য দিয়া যৌথভাবে কাঁচামাল ক্রয় করিলে উৎকৃষ্ট জিনিষ তাহারা অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে পাইতে পারে। উৎপন্ন সামগ্রী যৌথভাবে বিক্রয় করিতে পারিলে বাজারের ন্যায্য মূল্যও তাহারা পাইতে পারে। এমন কি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে যদি তাহারা তৈরী মাল কিছু-দিন ধরিয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে বৎসরের মধ্যে যে সময়ে তাহাদের উৎপাদনের চাহিদা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী, তখন বেশী দরে বিক্রয় করিয়া অধিক লাভবান্ হইতে পারে।

তবে এ বিষয়ে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অত্যন্ত বেশী। রাষ্ট্র যদি অর্থ দিয়া, প্রচার দিয়া, লোক দিয়া সাহায্য না করে, তাহা হইলে সমবায় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠা শক্ত। বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের জন্য যেমন সরকার নানাভাবে অর্থ ব্যয় করেন, তেমনই কুটীর শিল্পের উন্নতির জন্য অর্থব্যয় করা প্রয়োজন। এই কথা

সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুসরণের ফলে অত্যন্ত অল্প শিল্পই ভারতে গড়িয়া উঠিয়াছে। বর্ত্তমান জগতের বিচিত্র চাহিদা মিটাইতে ভারত সম্পূর্ণ অক্ষম। নিজের সমস্ত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাহাকে নির্ভর করিতে হয় বিদেশের রপ্তানির উপর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতে বৈদেশিক রপ্তানি পৌঁছাইত না; তখন প্রকৃতি আমাদের প্রতি প্রথম সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়া ছিল। আমরা অথবা ভারত সরকার তাহা অগ্রাহ্য করিয়া ছিলাম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আমাদের প্রতি প্রকৃতির দ্বিতীয় সাবধানবাণী। কিন্তু এইবার আমরা পূর্ব্বের ন্যায় নিশ্চল থাকি নাই। শিল্প ব্যবস্থায় স্বাবলম্বী হইবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণ চেষ্টা আমরা করিয়াছি।

সমস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—সামরিক, এবং বেসামরিক। যুদ্ধের প্রভাব প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ পড়ে সামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর, বন্দুক কামানের কারখানা, ট্যাংক, এরোপ্লেনের কারখানা, বারুদ ও শেলের কারখানার উপর। শান্তির সময়ে যে শিল্পপ্রগতি হয় তাহার সহিত যুদ্ধের সময়ের প্রগতির প্রভেদ এইখানেই। শান্তির সময়ে আদর্শ হইতেছে শ্রীবৃদ্ধি; যুদ্ধে আদর্শ হইতেছে আত্মরক্ষা। তাই Arms & Armamentএর শিল্প সর্ব্বাপেক্ষা স্ফীত হয় যুদ্ধের সময়ে। ভারতের armament factoryগুলির উৎপাদনের মূল্য ১৯৪৩ সালে ২০ কোটি টাকার অধিক হইয়াছিল; এবং সামরিক প্রয়োজনে সম্মিলিত জাতি ভারতের বিভিন্ন ব্যবসায়ও শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে ১৯৪২ সালে ৫২ কোটি টাকার অস্ত্র ও সামরিক সম্ভার ক্রয় করিয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে এই ক্রয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ১৩ কোটি টাকা।

অবশ্য বেসামরিক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন আসে। তাহার প্রথম কারণ সামরিক কারখানাগুলি সর্ব্ব সময়েই বেসামরিক শিল্পের উপর নির্ভর করে। লৌহ এবং ইস্পাত শিল্প বৃদ্ধি না পাইলে অস্ত্রশিল্প বৃদ্ধি পাইতে পারে না। দ্বিতীয় কারণ যুদ্ধের সময়ে সামরিক কর্ম্মচারিদের

ব্যবহারের জন্য বহুপ্রকারের দ্রব্য সম্ভারের প্রয়োজন। এই সকল দ্রব্যের শিল্পগুলি যুদ্ধের প্রেরণা পাইয়া অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। বস্ত্রশিল্প, পাদুকা শিল্প প্রভৃতি সৈন্যদের চাহিদা মিটাইবার জন্য সমৃদ্ধ হয়। তৃতীয়তঃ, যুদ্ধের সময়ে সরকার শান্তির সময়ের অপেক্ষা অনেক বেশী ব্যয় করেন, মুদ্রাস্ফীতি হয়, সকল দ্রব্যের মূল্য অস্বাভাবিকরূপে বর্দ্ধিত হয়, শিল্প-পতিরা অনেক বেশী লাভ করিতে থাকেন, এবং লাভের প্রেরণায় সকল শিল্পই সমৃদ্ধ হয়। কুটীর শিল্পগুলিও এই সমৃদ্ধি হইতে বাদ পড়ে না।

ভারতের বিভিন্ন শিল্পে কিরূপ পরিবর্ত্তন আসিয়াছে—তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুদ্ধপূর্ব্ব উৎপাদনের তুলনায় ১৯৪৪ সালে ভারতে ইস্পাত শিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণের অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা ব্যতীত shell, bullet —proof Armour plate, প্রভৃতির জন্য বিশেষ ধরণের উচ্চ শ্রেণীর ইস্পাত প্রস্তুত হইতেছে। ইস্পাত শিল্পের অংশীদারদের লাভ শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িয়াছে।

যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভারতীয় বস্ত্র শিল্পে একটু বাজার মন্দা দেখা দিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভেই এই মন্দা অদৃশ্য হইয়াছিল, এবং চাহিদা উত্তরোত্তর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতেছিল। নূতন কারখানার জন্য যন্ত্রের অভাবে, এবং বর্ত্তমান কারখানাগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি সীমাবদ্ধ হওয়ার জন্য চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায় নাই। ইহার ফলে অত্যন্ত গুরুতর বস্ত্রসংকট দেখা দিয়াছে। বস্ত্রের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং বস্ত্র ব্যবসায়িগণ অল্প উৎপাদন সত্ত্বেও ৬।৭ গুণ অধিক লাভ করিতেছে।

পাট শিল্পের অবস্থাটা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। ১৯৩৮ সালে পাট শিল্পে ভয়াবহ রকমের বাজার মন্দা, শ্রমিকদের অধিকাংশ সময়েই কর্ম্মহীনতা, বন্ধ কারখানা, লাভের ঘাটতি—এইগুলি অত্যন্ত বেশী লক্ষ্য করা যাইত। ১৯৪০ হইতে ৪১ সাল পর্য্যন্ত অস্থায়ীভাবে পাট শিল্প অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, কিন্তু তারপর আবার বৈদেশিক চাহিদা কমিয়া যাওয়ায় উৎপাদনের পরিমাণ

কমিয়া যায়। ১৯৪৩ সালে আমেরিকা ৭০ কোটি গজ চটের order দেওয়ায় অবস্থাটা একটু ভাল হইয়াছিল—তারপর আবার উৎপাদন কমিতে সুরু করিয়াছে। এই শিল্পের মালিকদের যে dividend দেওয়া হয় তাহা ১০ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত উঠিয়াছিল, আবার ১৫এ নামিয়া আসিয়াছে।

চিনির উৎপাদন ১৯৩৮ সালের তুলনায় শতকরা ৮ ভাগ বর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং চিনির মূল্য নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও দ্বিগুণ হইয়াছে। কয়লা শিল্প যুদ্ধের প্রথম দিকে অত্যন্ত বেশী স্ফীত হইয়াছিল, কিন্তু যুদ্ধের শেষের দিকে, বা উৎপাদন শ্রমিকের অভাবে কমিয়া গিয়াছে। ইহা ব্যতীত আমাদের দেশের কয়লা বিদেশে প্রভূত পরিমাণে রপ্তানি হওয়ায় জন্য কয়লার অভাব অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। কয়লার অভাবে অনেক শিল্প যতখানি বৃদ্ধি পাইত, তাহা পায় নাই, এবং দেশের যানবাহন, উৎপাদন কয়লার অভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

কাগজ, দেশলাই, সিমেণ্ট, ঔষধ, প্রভৃতি দ্রব্যের বিদেশ হইতে আমদানী বন্ধ হওয়ার জন্য এবং দেশে চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য এই শিল্পগুলি কিয়ৎ পরিমাণে সমৃদ্ধ হইয়াছে, এবং কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রাদির অভাবে অনেকখানি সম্ভাব্য সমৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়া আছে।

ভারতীয় শিল্প যে যুদ্ধের সময়ে মুদ্রাস্ফীতি এবং চড়া দরের প্রেরণায় খানিকটা সমৃদ্ধ হইয়াছে, একথা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু উন্নতি যাহা হইতে পারিত, হওয়ার স্বাভাবিক সম্ভাবনা ছিল, এবং হওয়ার জরুরী প্রয়োজন ছিল, তাহার তুলনায় যাহা হইয়াছে তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাহা ছাড়া শিল্পের স্ফীতি যাহা হইয়াছে তাহাও নিতান্ত একপেশে। সুদূর প্রাচ্যে যুদ্ধ বিস্তৃত হওয়ার জন্য মিত্রপক্ষের সরবরাহ ঘাটিরূপে ভারত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। বিশাল সৈন্যবাহিনীর ভরণ, পোষণ, আশ্রয়দানের ভার ভারতের উপরেই পড়িল। ইহাতে ভারতে উৎপাদন বাড়িল সত্য কথা, কিন্তু উৎপাদনের সাথে শিল্প বাড়িল না। বিশেষ করিয়া মূল শিল্প। যুদ্ধ

যুগে মূলশিল্প বাড়িতে দিলে যুদ্ধোত্তর যুগে শিল্পোন্নত ভারত বৃটিশ রপ্তানীর হাত হইতে অব্যাহতি পাইবে, বৃটিশ-কায়েমী স্বার্থ যুদ্ধের আতঙ্ক থাকা সত্ত্বেও ইহা হইতে দিল না। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে একই দ্রব্যের পুনরাবৃত্তি ঘটানো উচিত নয়—এই যুক্তিতে যন্ত্রশিল্প, এরোপ্লেন বা কারখানা প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইল না। ভারতে কলকারখানা বিস্তৃত হইল না, নূতন যন্ত্রপাতি গড়িয়া উঠিল না, শিল্পোৎপাদনের যেটুকু প্রসার হইল, তাহা পুরানো যন্ত্রপাতি যাহা মজুত ছিল তাহা দিনরাত চালাইয়া লইয়াই হইল। চট, কাপড়কল, লৌহ ও ইস্পাত শিল্প—প্রায় প্রত্যেক বড় বড় শিল্প সম্বন্ধেই একথা খাটে। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে যে সমস্ত যন্ত্রপাতি দিতে সম্মত হইয়াছিল, তাহাও ভারতে আসিতে দেওয়া হয় নাই। ইহা কেবল ভারতের শিল্প-প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা নয়, আসন্ন আক্রমণের সম্মুখে এই স্বার্থান্ধ নীতি দেশরক্ষার পক্ষেও মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়। যে মার্কিণ টেক্‌নিক্যাল মিশন ভারতে আসে, তাহার প্রস্তাবের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী নীতির এই অন্ধতা ধরা পড়ে। ঐ অনুন্নত অবস্থা দূর করিবার জন্য মার্কিন মিশন ভারত সরকারের নিকট কতকগুলি প্রস্তাব পেশ করে। গবর্ণমেণ্ট যে শুধু প্রস্তাবগুলি কার্য্যকরী করিল না তাহা নয়, সেগুলি প্রকাশ পর্য্যন্ত হইতে দিল না।

কুটীর-শিল্প-জাত দ্রব্যের মূল্য কিয়ৎ পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় আশা করা যাইতে পারে যে, ইহাদেরও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু বাস্তব অবস্থা অন্যরূপ। বস্ত্রবয়ন শিল্প বিদেশাগত সূতার অভাবে প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে। অন্যান্য কুটীর-শিল্পের এই সমস্যা না থাকিলেও তাহাদের কারিগরদের আয়-বৃদ্ধি মূল্য-বৃদ্ধির তুলনায় অত্যল্প হওয়ার জন্য, তাহারাও অত্যন্ত সংকটাপন্ন হইয়াছে। মোট কথা, যুদ্ধের ফলে কুটীর-শিল্পের উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই, বরঞ্চ ক্ষতি হইয়াছে প্রভূত।

কুটীর-শিল্পের ক্ষতি কি প্রকারে এবং কতদূর হইয়াছে তাহা আলোচনা

করা প্রয়োজন। কামার, কুমার, তাঁতি, কাঁসারী, প্রভৃতি অধিকাংশ কুটীর-শিল্পের কারিগরেরা মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া, তাহাদের উৎপাদন কার্য্য চালাইত, তাহাদের লাভ মহাজন পাইত, এবং তাহারা মাত্র জীবন-ধারণের উপযোগী জীবিকা পাইত। যুদ্ধের ফলে মূল্য বর্দ্ধিত হওয়ার জন্য মজুতকারী মহাজনের মুনাফা বাড়িল; কিন্তু নির্দ্দিষ্ট আয়-সম্পন্ন কারিগর আর টিকিতে পারিল না। বৃহদায়তন শিল্পের শ্রমিকদের মত মাগ্‌গী ভাতার বন্দোবস্ত কুটীর-শিল্পের কারিগরদের বেলায় সম্ভব নয়। তাই তাহাদের মধ্যে অনেকে উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজেদের বৃত্তি ত্যাগ করিল; কেহ কেহ সামরিক বিভাগে বা অন্যত্র চাকুরীতে ঢুকিয়া গেল; আবার কেহ কেহ ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। যুদ্ধের প্রভাবজনিত বাংলার দুর্ভিক্ষের পরিণাম সর্ব্বাপেক্ষা ভয়াবহ হইল এইসব নিম্ন মধ্যবিত্ত ছোট ছোট কারিগরদের জীবনে। অনেক গ্রামেই দেখা গিয়াছে, আগে যেখানে বহু বর্দ্ধিষ্ণু কুটীরশিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল, এখন সেখানে তাহার চিহ্নমাত্র নাই।

ভারতের শিল্পে কেবলমাত্র পরিমাণগত নয়, গুণগত পরিবর্ত্তনও হইয়াছে। জাহাজের শিল্প নূতন আরম্ভ হইয়াছে। মটর প্রস্তুত আরম্ভ হইবার অনুমতি পাওয়া গিয়াছে এবং চেষ্টা চলিতেছে, aeroplane-এর কলকব্জা মেরামতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, উৎপাদন প্রণালীতে কিছু কিছু উন্নতি সাধিত হইয়াছে, নূতন নূতন যন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সহস্র সহস্র ভারতীয় যুবক technical শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারতের শিল্প-ভবিষ্যৎকে সুষ্ঠুভাবে গড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। একথা সত্য যে, গুণগত বা পরিমাণগত পরি-বর্ত্তনে সোভিয়েট বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের পরিবর্ত্তন নিতান্তই সামান্য।

গত ছয় বৎসর দুনিয়ার প্রায় সমস্ত বড় দেশগুলি যখন শিল্পোৎপাদন এবং যন্ত্রপ্রসারের দিক দিয়া আগাইয়া দ্রুতগতিতে গিয়াছে, সেই সময়ে ভারতবর্ষ তাহার মূল শিল্প, তাহার লৌহ, ইস্পাত, কয়লা, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সামগ্রী,

রেলপথ, জাহাজ নির্ম্মাণ, প্রভৃতি শিল্পগঠনের এবং প্রসারের সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইল। যুদ্ধশেষে শান্তিকালীন সামগ্রী তৈয়ারীর কাজে লাগানো চলিত এমন সব শিল্প গড়িবার পথে সে বাধা পাইল। যুদ্ধের সময়ে যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা একশভাগ উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনযন্ত্র শতকরা ৫০ ভাগ বাড়িবার ফলেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। বোমা-বিধ্বস্ত বৃটেনে উৎপাদন বাড়িয়াছে দুই তৃতীয়াংশ, শতকরা ৫০ ভাগ যন্ত্র বেশী ব্যবহার করার জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অপরদিকে ভারতে যন্ত্র বাড়িয়াছে মাত্র শতকরা ১ ভাগ।

শিল্পপতিদের মুনাফা অবশ্য আপেক্ষিকভাবে ভারতেই সর্ব্বাধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে; বৃটেনে উচ্চহারে ক্রমবর্দ্ধমান আয়কর ধার্য্য থাকায় মুনাফার অধিক অংশ রাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে। সোভিয়েটে উৎপাদন মুনাফার জন্য নয়, সমাজের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য, অতএব সেখানে কোন মুনাকা নাই। কেবলমাত্র ভারতেই শিল্পপতিগণ অত্যন্ত লাভবান্ হইয়াছে।

ভারতীয় শিল্পপতিগণকে কেন এই অতিরিক্ত লাভের সুযোগ দেওয়া হইয়াছে? ইহার একটি গূঢ় কারণ আছে। প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় শিল্পের কণ্ঠরোধ করিবার জন্য ভারতীয় শিল্পপতিগণকে লাভের লোভ এবং মুনাফার ঘুষ দেওয়া হইয়াছে। সরকার দেশের উৎপাদনশক্তি না বাড়াইয়া সৈন্য বাহিনীর বিপুল চাহিদা মিটাইতে চাহিল। ফলে সমস্ত দেশ জুড়িয়া বেসামরিক প্রয়োজনের সামগ্রীর ক্ষেত্রে দেখা দিল ঘাটতি। তারপর সমস্ত পণ্য লইয়াই সুরু হইল ব্যাপক মজুতদারী ও চোরা কারবার। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল কল্পনাতীত পরিমাণে মুদ্রাস্ফীতি। চড়া দর, চোরাকারবার, আর মজুতদারী সর্ব্বব্যাপী হইয়া উঠিল। ভারতেব জনসাধারণের উপরে মুনাফা-শিকারের তাণ্ডবনৃত্য চলিতে দেওয়া হইল। নিম্নলিখিত দু একটি সংখ্যা হইতে মুনাফার বিপুলতা বোঝা যাইবে। ১৯৩৯ সালের তুলনায় ১৯৪৩ সালে পাটশিল্পে ৯২৬%, কাপড় কলে ৬৪৫%, চা বাগানে ৩৯২%, চিনির কলে ২১৩%, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ২২%৫ অধিক মুনাফা হইয়াছে। যে মুনাফা কাগজে কলমে মানিয়া লওয়া

হইয়াছে, উপরের সংখ্যাগুলি তাহারই ভিত্তিতে সংগৃহীত। গোপন চোরাকারবারের মুনাফার পরিমাণ নির্ণয় করে—কাহারও সাধ্য নাই।

অপরদিকে যে অগণিত শ্রমিক নিজেদের রক্ত দিয়া উৎপাদন চালু রাখিয়াছে, ভারতে তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশার সীমা নাই। কুটীরশিল্পের কারিগর যে দুর্ভোগ ভুগিয়াছে, তাহার তুলনায় বৃহদায়তন শিল্পের শ্রমিকদের দুর্ভোগ কমই হইয়াছে। সাধারণভাবে দেখা যায়, যে শ্রমিকের মাগ্‌গী ভাতা যেখানে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পাইয়াছে (বোম্বাই প্রভৃতি অঞ্চলে) সেখানে গড়পড়তা ১০০ ভাগ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাতা-বৃদ্ধি ইহার অর্দ্ধেক বা তারও কম। এদিকে সর্ব্বত্রই মূল্য বাড়িয়াছে ন্যূনতম ৪ গুণ বা ৫ গুণ। এই যুদ্ধে ভারতীয় শ্রমিকের দান অতুলনীয়—প্রত্যেক Industrial Commission এই কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় সৈন্য যেরূপ অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখাইয়াও বিদেশী সৈন্যের নিকট লাঞ্ছিত হয়, সেইরূপ ভারতীয় শ্রমিক অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়াও অভাব দুঃখদুর্দ্দশায় বিপর্য্যস্ত।

যুদ্ধের মধ্যে ভারতীয় শিল্পের যে অগ্রগতি হইয়াছে তাহা সীমাবদ্ধ হইলেও আমাদের স্পষ্ট দেখাইয়া দেয় যে, ভারত একটি শিল্পপ্রধান দেশ হিসাবে উন্নত হইতে পারে। ভারতের যুবকেরা ৬ মাস বা ৮ মাস শিক্ষানবিশী করিয়া দক্ষ কারিগরের ন্যায় কাজ করিয়াছে; শিক্ষার সুযোগ অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বহুসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ার, প্ল্যানার, ড্রাফ্‌টস্‌ম্যান এইখানেই পাওয়া গিয়াছে। এমন কি ব্যবসার মূলধন এবং সংগঠনী-শক্তির অভাবও দূরীভূত হইয়াছে। মিত্রপক্ষের যুদ্ধোপকরণ সরবরাহের কাজে ভারত বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে প্রতিপদে ভারতকে বাধা দেওয়া হইয়াছে। ভারতে যাহাতে কোন মতেই শান্তিকালীন শিল্প গড়িয়া উঠিতে না পারে, তাহার জন্য হাজার রকম বিধিনিষেধ আরোপ করা হইয়াছিল। কিন্তু সকল বাধা সত্ত্বেও শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদনে ভারত তাহার কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। যে সকল জিনিষের জন্য ভারতের উপর নির্ভর করা

হইয়াছে, সেইগুলি উৎপন্ন করিতে ভারতের কোন অসুবিধা হয় নাই। আমরা নানারকম যন্ত্রের অংশ তৈয়ারী করিয়াছি, এরোপ্লেন, জাহাজ, ইঞ্জিন এবং সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি দক্ষতার সহিত মেরামত করিয়াছি। প্রয়োজন হইলে এবং অনুমতি পাইলে এই সকল যন্ত্র, এরোপ্লেন, ইঞ্জিন, জাহাজ, প্রভৃতি যে আমরা উৎপন্ন করিতে পারি তাহা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধের তাগিদেই এই প্রমাণ আমরা পাইলাম। যুদ্ধ আমাদের ভবিষ্যতের এক উজ্জল ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছে।

ভারতে শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশ

ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্রমোন্নতিকে দুইটি দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখা সম্ভব—আইনজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গী এবং জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিভঙ্গী। আইনজ্ঞের দৃষ্টিভঙ্গীতে ধরা পড়িবে কিরূপে একটির পর একটি শাসন-সংস্কার আইন প্রস্তুত হইয়াছে, কিরূপে ভারতীয়দিগের জীবনের সকল দিকগুলিকে আইনের সাহায্যে পরিবর্দ্ধিত করার চেষ্টা হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী কিন্তু ঐরূপভাবে দেখিবেন না। তিনি জানেন সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী জনগণ জাগ্রত হইয়াছে এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে ক্রমশঃ শক্তিশালী হইতেছে। এই আন্দোলনের আঘাতে কিরূপে ধীরে ধীরে অনিচ্ছুক সাম্রাজ্যবাদীর হস্ত হইতে ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা চলিয়া আসিতেছে, কিরূপে ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় আন্দোলনের চাপে স্বায়ত্ত শাসনের ক্রমস্ফুরণ এবং ক্রমোন্নতি হইতেছে—ইহাই জাতীয়তাবাদীর আলোচ্য বিষয়।

এই দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীরই মূল্য আছে। আইন-পুস্তক প্রণয়ণের জন্য প্রথমটির প্রয়োজন; এবং জাতীয় চেতনার উন্মেষের জন্য দ্বিতীয়টি প্রযুজ্য। বর্ত্তমান

প্রবন্ধে আমরা এককভাবে কোনটিই গ্রহণ করিতে পারি না; দুইটি দৃষ্টিভঙ্গীকে একত্র গ্রথিত করিয়া দুইটি প্রণালীই আংশিকভাবে গ্রহণ করিব।

ইংরাজেরা ভারতবর্ষ জয় করিতে আরম্ভ করে ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং জয় প্রায় শেষ করিয়া ফেলে ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। তাহারা বাহ্যতঃ বাণিজ্য প্রসারের উদ্দেশ্যে আসিয়াছিল; বণিকের মাণদণ্ড শীঘ্রই রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয়। সেইজন্য প্রথম দিকে ভারতের শাসনভার মুখ্যতঃ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তে ছিল; অবশ্য এই কোম্পানীকে প্রতি ২০ বৎসর অন্তর সনন্দ গ্রহণ করিতে হইত এবং পার্লামেণ্টের নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইত। এই সময়কার শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তনের বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। তবে ১৭৭৩ খৃঃ হইতে ১৮৫৩ পর্য্যন্ত যখনই কোম্পানীকে নূতন সনন্দ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, তখনই কিয়ৎ পরিমাণে ক্ষমতা পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে চলিয়া গিয়াছে। এক কথায় এই সমস্ত সময়টার ইতিহাস হইতেছে—বণিকদের কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্বে রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রধান উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হইতেছে ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং অ্যাক্ট, এবং ১৭৮৪ সালে পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মোটামুটি পীটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট দ্বারাই ভারত শাসিত হইয়াছে।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়—সিপাহী বিদ্রোহকেই বলা যায় পদানত ভারতের দাসত্ব মোচনের জন্য প্রথম সংঘবদ্ধ প্রয়াস। সিপাহী বিদ্রোহের পরে মহারাণী তাঁহার ঘোষণা পত্রের সাহায্যে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। ১৮৫৮ সালে An Act for better Govt. of India পাশ করিয়া ভারত-শাসনের উপর পার্লামেণ্টের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট নামে আইন পাশ হয়। ইহাতেই সর্ব্বপ্রথম প্রদেশ সমূহে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের পর ভারতে প্রভূত পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন হওয়াতে ভারতবাসী

পাশ্চাত্য প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠে, এবং ভারতীয় জাতীয় মহাসভার প্রতিষ্ঠাতে ভারতবাসী সংঘবদ্ধ হইয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা দাবী করিতে শিক্ষা করে। বাধ্য হইয়া বৃটিশ সরকার কিয়ৎ পরিমাণ ক্ষমতা হস্তান্তর করিবার জন্য ১৮৯২ সালে এক আইন পাশ করেন। এই আইনের দ্বারা শাসনতন্ত্রের অনেক সংশোধন সাধিত হয়। গভর্ণর-জেনারেলের সভাতে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় এবং সভ্যদের ক্ষমতা কিছুটা বাড়িয়া যায়। এতাবৎকাল বে-সরকারী সভ্যগণ নীরব দর্শক হিসাবে থাকিতেন। এখন শাসনতন্ত্রের সমালোচনা, প্রস্তাবনা, প্রতিবাদ এবং অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা তাঁহারা পাইলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হিসাবে ইহাই ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের প্রথম সোপান।

শাসন-সংস্কারের পরবর্ত্তী অধ্যায় ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে সাধিত হয়। ১৮৯২ সালের পর অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে; Indian National Congress এর পতাকাতলে সংহত হইয়া ভারতীয় জাতীয়তা প্রচুর শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে; রুশিয়ার জারের বিরুদ্ধে জাপানের জয় প্রাচ্য জাতিদিগের স্বীয় শক্তিতে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের স্রোত সমস্ত ভারতে বিস্তারলাভ করিয়াছে, এবং বৈদেশিক কুশাসনের বিরুদ্ধে ভারতে তীব্র অসন্তোষ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তদুপরি ইংলণ্ডের রক্ষণশীল দলের পরিবর্ত্তে উদারনৈতিক দল শাসনভার গ্রহণ করিয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তনের ফলে মিণ্টোমলি শাসন-সংস্কার সাধিত হয়। এই আইনে ব্যবস্থাপক সভার সংস্কার সাধন হয় এবং কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাসম্বন্ধেও অনেক পরিবর্ত্তন হয়।

কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপক সভায় সরকারী সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখিয়া প্রদেশ সমূহে বেসরকারী সভ্যদিগকে সংখ্যাগরিষ্ঠ করা হইল। মনোনয়ন ব্যবস্থা থাকিল, কিন্তু নির্ব্বাচন-নীতি অনুসৃত হইল। প্রশ্ন এবং অতিরিক্ত প্রশ্ন করিবার ক্ষমতা, এবং সর্ব্বসাধারণের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে ও আয়ব্যয় সম্বন্ধে আলোচনা করিবার ক্ষমতা—সভ্যগণকে দেওয়া হইল। গভর্ণর-জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্ণরের কার্য্য-নির্ব্বাহক সভাতে ভারতবাসীকে

আসন দেওয়া হইল। এই আইনেই প্রথম মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্ব্বাচন প্রথা অবলম্বন করা হয়। আইন-প্রণয়ণের ক্ষমতা ব্যবস্থাপক সভা, গভর্ণর বা গভর্ণর-জেনারেল, এবং সর্ব্বোপরি পার্লামেণ্টের উপর ন্যস্ত থাকে। কার্য্য করিবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতি, গভর্ণর বা গভর্ণর-জেনারেল এবং ভারত সচিবের হাতে থাকে।

মিণ্টোমর্লি সংস্কার ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। ক্রমবর্দ্ধমান জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তাহারা আরও ক্ষমতা দাবী করে। এই সময়ে সমস্ত জগতে মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলিয়া উঠে। স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি পাইয়া ভারত ইংলণ্ডকে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে প্রাণপণ সাহায্য করে। যুদ্ধের পর ১৯১৯ সালে মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড সংস্কার সাধিত হয়। ভারতবর্ষকে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম এবং অচ্ছেদ্য অঙ্গস্বরূপ রাখিয়া স্বায়ত্তশাসনের ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশ সাধন করা এবং ক্রমশঃ অধিক সংখ্যক ভারতবাসীকে শাসন-কার্য্যের বিভিন্ন বিভাগে নিয়োজিত করার নীতি এই সংস্কারে ঘোষণা করা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাতে একটি উচ্চতর পরিষদ্ স্থাপিত হইল। উচ্চতর পরিষদ্ বা রাষ্ট্রীয় পরিষদের সভ্যসংখ্যা ৬০, তন্মধ্যে ৩৩ জন নির্ব্বাচিত। নিম্নতর গৃহ বা ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্যসংখ্যা ১৪০ জন, তন্মধ্যে অন্যূন ১০৪ জন নির্ব্বাচিত। কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি ব্যবস্থাপক সভার নিকট দায়িত্বশীল নহেন। ১৯৪৬ সালের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের কার্য্যাবলী এই সংস্কার অনুযায়ী পরিচালিত হইত—যদিও অন্তর্ব্বর্তী সময়ে দু'একটি ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন আনীত হইয়াছিল।

মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের ফলে প্রাদেশিক শাসনকার্য্যে দ্বৈতশাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। শাসনতন্ত্রের কতকগুলি বিভাগ গভর্ণর কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সাহায্যে শাসন করিতেন। এই গুলিকে 'রক্ষিত' বিষয় বলা হইত। 'হস্তান্তরিত' বিভাগের জন্য ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্য হইতে

কয়েকজনকে মনোনীত করিয়া মন্ত্রণা-সভা গঠিত হয়। শিক্ষা, চিকিৎসা, কৃষি,ও জনস্বাস্থ্য এই বিভাগের অন্তর্ভুক্ত।

ইহার পর উল্লেখযোগ্য ১৯৩৫ এর সংস্কার। মণ্ট-ফোর্ড সংস্কারের পরে ভারতে দুইটি বিরাট গণ-আন্দোলন হইয়া গিয়াছে; ভারতবাসী পূর্ণ স্বাধীনতাকেই তাহাদের একমাত্র দাবী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। সাইমন কমিশন ভারতের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। তিনটি গোল টেবিল বৈঠক হইয়া গিয়াছে। Joint Parliamentary Committee নিযুক্ত হইয়াছে এবং ভারতের শাসনবিধির উপর তাহাদের সুচিন্তিত অভিমত তাঁহারা ব্যক্ত করিয়াছেন। ১৯৩৫ সালের Government of India Act এই রিপোর্টের উপরই ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে। ১৯৩৫-এর সংস্কারে কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র এবং প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু কেন্দ্রে যুক্তরাষ্ট্র আজিও অপ্রবর্ত্তিত রহিয়াছে।

প্রদেশসমূহে ভোটাধিকার অনেকখানি ব্যাপ্ত করা হইয়াছে; ছয়টি প্রদেশে দুইটি করিয়া পরিষদ্ গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। প্রদেশের রক্ষিত বিভাগ লুপ্ত করা হইয়াছে, কিন্তু গভর্ণরকে স্ববিবেচনাধীন ক্ষমতা এবং বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। অন্য সমস্ত বিভাগের শাসনকার্য্যের জন্য নির্ব্বাচিত পরিষদ্ হইতে দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা গঠন করার পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রাদেশিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনকার্য্যে গভর্ণর এবং গভর্ণর জেনারেলের veto (সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা) এবং emergency power পূর্ব্বের মতই বলবৎ আছে। কার্য্যকালে দেখা গিয়াছে, প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন অনেক সময়ে মিথ্যায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। সমস্ত শাসন-ব্যবস্থাকে নাকচ করিয়া দিয়া বিশেষ সময়ে জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার ক্ষমতা, এবং সমস্ত শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করার ক্ষমতা গবর্ণরের পূর্ব্বের মতই আছে। স্ববিবেচনাধীন ক্ষমতা,

ভিটো ক্ষমতা, জরুরী ক্ষমতা, প্রভৃতি গবর্ণরের হাতে থাকায়, অনেক সময়ে দায়িত্বশীল মন্ত্রীসভা খেলার পুতুলে পরিণত হইয়াছে।

প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার ২½ বৎসর পরে যুদ্ধারম্ভের সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি প্রদেশে এই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়ে। জাতীয় আন্দোলন অভূতপূর্ব্ব শক্তি সঞ্চয় করে। সাম্রাজ্যবাদী শাসকের উপর গণতন্ত্রপ্রিয় বিশ্বজনমতের চাপ স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। বৃটিশ সরকার Sir Strafford Cripps কে নূতন প্রস্তাব দিয়া পাঠাইতে বাধ্য হন। ক্রিপ্‌স্‌ প্রস্তাবের মূল কথা হইতেছে যুদ্ধাবসানের পরেই পূর্ণ স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি গণপরিষদ্‌ (Constituent Assembly) আহ্বান করা হইবে। ভবিষ্যৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র হইতে যদি কোন প্রদেশ বা অংশ তাহাদের প্রতিনিধিদের সাহায্যে প্রমাণ করে যে, তাহারা কেন্দ্রীয় যুক্তরাষ্ট্রে একত্র থাকিবে না, তাহা হইলে তাহারা আর একটি বা একাধিক স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করিতে পারিবে। ভবিষ্যৎ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে বৃটিশ কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে। যুদ্ধের সময়ে ভারতকে যুদ্ধ পরিচালনার কার্য্যে সহায়তা করিতে হইবে।

ক্রিপস্‌-প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদের স্বেচ্ছাকৃত দান হিসাবে আসে নাই। যুদ্ধের তাগিদ এবং গণতান্ত্রিক বিশ্বজনমতের চাপের ফলেই এই প্রস্তাব আসে। ইহাকে গ্রহণ করিলে সাম্রাজ্যবাদকে কোণঠাসা করা হইত, এবং বিশ্বের জনমতকে ভারতের ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহশীল করা যাইত। কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া ভারতবাসী ঐ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে—ইহাতে লাভবান্‌ হইয়াছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, আঘাত করা হইয়াছে বিশ্বের গণতান্ত্রিক জনমতকে, এবং আমাদের নিজেদের মধ্যে কলহ-বিচ্ছেদ বৃদ্ধি পাইয়াছে। লর্ড ওয়াভেল্‌ আবার যুদ্ধের সময়ে একটি সাময়িক পরিকল্পনা আনয়ন করিয়াছিলেন। ভারত-দরদী বৃটিশ জনসাধারণকে নির্ব্বাচনী ধোঁকা দিবার জন্য, এবং ভারতে হিন্দু-মুসলমানে

দলাদলি বৃদ্ধি করার জন্য এই প্রস্তাব। সাম্রাজ্যবাদ তাহার ষড়যন্ত্রে সফল হইয়াছে, ভারতের ঐক্যকামীগণ নিরাশ হইয়াছেন, পারস্পরিক কলহ-বিবাদ মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পাইতেছে। জাতীয় আন্দোলন সমগ্রভাবে দ্রুত শক্তিশালী হইলেও ঐক্যবোধের মর্ম্মান্তিক অভাব এবং অবিরাম দলাদলি ভারতের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত করিয়া তুলিতেছে। গণপরিষদ গঠন, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের কার্য্যভার গ্রহণ, লর্ড ওয়াভেলের পদত্যাগ বা অপসারণ, বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর বিবৃতি, পার্লিয়ামেণ্টের বিতর্ক, প্রভৃতি সাম্প্রতিক ঘটনায় রাজ-নৈতিক আকাশের সমস্ত মেঘ উড়িয়া যায় নাই। ভারতের আকাশে এই সন্দেহ-আশঙ্কার ঘনঘটা কাটিয়া গিয়া নবীন সূর্য্যোদয় হইবে কিনা, একমাত্র ভবিষ্যৎই তাহা বলিতে পারে।

রাষ্ট্র ও অর্থ

একজন ব্যক্তির যেমন সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য আয় এবং ব্যয়ের প্রয়োজন হয়, তেমনই কোন রাষ্ট্রের দৈনন্দিন কার্য্য পরিচালনার জন্য এবং অস্তিত্বকে সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য আয় এবং ব্যয়ের প্রয়োজন। এই দিক দিয়া ব্যক্তিগত অর্থনীতি ও রাষ্ট্রীয় অর্থনীতিতে অনেকখানি সাদৃশ্য বর্ত্তমান। অবশ্য উভয়ের মধ্যে প্রভেদও যথেষ্ট। ব্যক্তি তাহার আয় অনুযায়ী ব্যয় করে; আয় অপেক্ষা বেশী ব্যয় করিলে তাহাকে ধার করিতে হয় এবং ধার করা তাহার পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। রাষ্ট্রের বেলায় কিন্তু একেবারে বিপরীত। রাষ্ট্র তাহার ব্যয়-অনুযায়ী আয় করার চেষ্টা করে। কর্ত্তৃপক্ষরা প্রথমে স্থির করেন রাষ্ট্রের কার্য্য পরিচালনার জন্য কী

পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন। তারপর কোন্ কোন্ উপায়ে এই অর্থ সংগ্রহ করা যায় তাহা চিন্তা করেন। ধার-কর্জ্জ করা ব্যক্তির কাছে যেমন অবাঞ্ছনীয়, রাষ্ট্রের পক্ষে তেমন নয়। তাহার নিজের প্রজার নিকট ধার করিলে রাষ্ট্র বস্তুতঃ দরিদ্র হয় না, এবং অনেক সময়েই যুক্তিসঙ্গত কারণে রাষ্ট্রকে প্রচুর অর্থ কর্জ্জ করিতে হয়। ব্যক্তির বেশী ঋণ থাকিলে তাহাকে আমরা দরিদ্র বলি; রাষ্ট্রের ঋণ থাকাটা দারিদ্র্যসূচক নহে। পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা ধনী রাষ্ট্রগুলির ঋণের পরিমাণ কল্পনাতীত। আবার একজন ব্যক্তির আয় অপেক্ষা ব্যয় বেশী হওয়া সর্ব্বদাই অনিষ্টসূচক। কিন্তু রাষ্ট্রের Budget Deficit সবসময়ে ক্ষতিকারক নহে। বর্ত্তমান যুগে বাজার মন্দা, বেকার সমস্যা, প্রভৃতি কতকগুলি গুরুতর সামাজিক সংকটের সমাধান হয় রাষ্ট্রের বাজেট ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘাটতি করিয়া।

প্রশ্ন আসে—রাষ্ট্রের কোন্ কোন্ খাতে অর্থব্যয় প্রয়োজন। প্রজার মঙ্গলের জন্য রাষ্ট্রকে কোন কোন কাজ করিতে হয়, তাহার উপর নির্ভর করিবে রাষ্ট্র কি কি হিসাবে অর্থব্যয় করিবে। রাষ্ট্রের প্রথম কর্ত্তব্য আত্মরক্ষা। সেইজন্য সকল রাষ্ট্রকে দেশরক্ষার জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় করিতে হয়। আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, চুরি, ডাকাতি, প্রভৃতি, বন্ধ করার জন্য জেল, পুলিশ, প্রহরী, প্রভৃতির প্রয়োজন এবং সেজন্য অর্থ চাই। জনসাধারণের স্বাস্থ্যের জন্য হাঁসপাতাল স্থাপন, ঔষধ বিতরণ, রাস্তাঘাট আবর্জ্জনামুক্ত রাখা, প্রভৃতি কার্য্যের জন্য জনস্বাস্থ্য বিভাগ অর্থ ব্যয় করে। দেশের শিক্ষার উন্নতির জন্য স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, শিক্ষা-অফিস স্থাপনের প্রয়োজন, এবং অর্থ ব্যতিরেকে কোনটিই সম্ভব নহে। দেশের কৃষিকে উন্নত করার জন্য সেচ ব্যবস্থা, ও কৃষিবিদ্যালয় স্থাপন প্রয়োজন। শিল্পোন্নতি ব্যতীত কোন দেশই স্বাবলম্বী বা শক্তিশালী হইতে পারে না, অতএব অকেজো খনিগুলিকে ঠিক করা, খনিজ সম্পদ উৎপাদনের বন্দোবস্ত করা, রেলওয়ে প্রভৃতি যানবাহন উন্নত করা, Public utility serviceগুলিকে গড়িয়া তোলা ও সচল রাখা এবং শিল্পবিদ্যালয় স্থাপন করা রাষ্ট্রেরই কর্ত্তব্য। শাসন-কার্য্যের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য

Post and Telegraph বিভাগ রাখিতে হয়। দেশের সাধারণ লোক কর্ম্ম-জীবন পরিসমাপ্ত হওয়ার পর, যখন বার্দ্ধক্যে উপনীত হয়, তাহার old age pensions প্রভৃতি দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত। যাহারা রুগ্ন, দুর্ব্বল বা কর্ম্মক্ষমতাহীন, অথবা যাহারা কর্ম্মক্ষম অথচ বেকার তাহাদের জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম অর্থ সাহায্য প্রয়োজন। দেশের কোন প্রসিদ্ধ কবি, সাহিত্যিক অথবা বৈজ্ঞানিক অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন—তাঁহাদের সাহায্য করার আশু প্রয়োজন। এই রকম আরও কত সহস্র সহস্র প্রয়োজন আছে, অভাব আছে, যাহার জন্য রাষ্ট্রকেই অর্থব্যয় করিতে হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিকতার দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং রাষ্ট্রের কার্য্যাবলীও বৃদ্ধি পাইতেছে ; ইহার ফলে অধিকতর অর্থের প্রয়োজন হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের Budget স্ফীত হইতেছে।

রাষ্ট্র যে এই বিপুল অর্থ ব্যয় করে এই অর্থ সে পায় কোথা হইতে ? বিভিন্ন দেশে রাজস্ব সংগ্রহের বিভিন্ন প্রণালী আছে। কতকগুলি সাধারণ Source of Incomeএর নাম করা যাইতে পারে। ভূমি সব দেশেই রাষ্ট্রের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচিত। অতএব ভূমি হইতে শস্য উৎপাদন করে যাহারা, তাহাদের নিকট কিছু ভূমিকর আদায় করা সকল দেশেই প্রচলিত আছে। অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া, সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া, খনি হইতে সম্পদ আহরণ করিয়া যাহারা ধনী হয়, তাহাদের নিকট কর আদায় করাও অনুমোদিত পন্থা। যে কোন লোকই অর্থ অর্জ্জন করুক না কেন, সে রাষ্ট্রের নিকট অনেক সাহায্য পায়। রাষ্ট্র তাহার সম্পত্তিকে নিরাপদ রাখে, অতএব উপার্জ্জন-শীল সকলের আয়ের উপর আয়কর বসাইয়া রাজস্ব সংগ্রহ করা হয়। লোকে যদি বিলাস করে, আমোদ-প্রমোদে অর্থব্যয় করে, রাষ্ট্র সেই বিলাসের ব্যয় হইতে কিছু অর্থ নিজের ব্যয়ের জন্য গ্রহণ করে। দেশের কতকগুলি সাধারণের ব্যবহৃত দ্রব্য যেমন লবণ, সুপারী, চা, কফি, প্রভৃতির উপরও কর ধার্য্য করার প্রথা প্রচলিত আছে। বাসের জন্য বা ব্যবসার জন্য গৃহনির্ম্মাণ হয় ; গৃহের

উপর কর ধার্য্য অনেক দেশেই হইয়া থাকে। কারখানা, শিল্পপ্রতিষ্ঠান, প্রভৃতির উপর, অতিরিক্ত মুনাফার উপর, এমন কি যেখানে যাহা কিছু ক্রয়-বিক্রয় হইবে, তাহার উপর বিক্রয়কর ধার্য্য করা হইয়া থাকে। আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার উপর কর হইতে সকল রাষ্ট্রেরই প্রচুর অর্থাগম হয়। দেশের পণ্য বিদেশে চালান দিলে বা বিদেশের পণ্য দেশে আনিতে হইলে শুল্ক আদায় করার প্রথা বহুদিন হইতেই প্রচলিত। ইহা ব্যতীত, রাষ্ট্রের ব্যবহারের জন্য অর্থ সংগ্রহের নানাপ্রকার প্রণালী প্রত্যহই আবিষ্কৃত হইতেছে।

রাষ্ট্র বিপুল অর্থ ব্যয় করে, কিন্তু ব্যয়ের প্রণালী কি? যথেচ্ছ ব্যয় কখনই উচিত নহে। যদি কোন বৎসর সমস্ত অর্থের তিন চতুর্থাংশ রাষ্ট্র পুলিশ-বিভাগে ব্যয় করে, তাহা হইলে নিশ্চয় অন্যায় হইবে। আবার অর্থসংগ্রহ যে রাষ্ট্র করিবে, তাহারও তো একটি সুনির্দ্দিষ্ট পন্থা থাকা আবশ্যক। শুধু ভূমির উপর বা আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার উপর অত্যুচ্চ হারে কর ধার্য্য করিয়া সমস্ত অর্থ সংগ্রহ করার চেষ্টা ইহাও বাঞ্ছনীয় নহে। আয়-ব্যয়ের যে বিভিন্ন পথ আছে উহার মধ্যে একটি সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রণালী কি?

রাষ্ট্রের সকল কার্য্যের মধ্যে একটি মূলনীতি দেখিতে পাই। রাষ্ট্র যাহা কিছু করুক না কেন সর্ব্বত্র সকল সময়ে তাহার উদ্দেশ্য হইবে বৃহত্তম সামাজিক কল্যাণ সাধন। এই নীতি—যাহা বহুলোকের পক্ষে কল্যাণকর তাহাই রাষ্ট্রের যথার্থ কল্যাণ। দুই চার হাজার লোকের সুখসুবিধার জন্য যদি সমাজের বৃহত্তম অংশকে দুঃখ ভোগ করিতে হয় রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য অতি সত্বর এই অবস্থার অবসান করা। কোন কার্য্য করিলে এই সামগ্রিক কল্যাণ যদি ক্ষুন্ন হয়, তবে কোন কারণেই তাহা করা উচিত নহে।

অর্থসংগ্রহ ও অর্থব্যয়েরও একটি মূলনীতি আছে। সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে বোঝা যায়, অর্থব্যয় করিলে লোকে সাধারণতঃ একটু উপকার পায়। এই উপকার কম বা বেশী হইতে পারে। পুলিশ বিভাগে ব্যয় করিলে উপকার

কম পাওয়া যায়; শিক্ষার জন্য ব্যয় করিলে বেশী উপকার পাওয়া যায়। অন্যদিকে রাষ্ট্র যখন জনসাধারণের নিকট কোন অর্থ সংগ্রহ করে, তখন তাহাতে কিছুটা কষ্ট জনসাধারণের হইবেই। এই কষ্টও কম বা বেশী হইতে পারে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ দিতে ধনীর কম কষ্ট হয়, দরিদ্রের হয় বেশী। অতএব রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে 'বৃহত্তম জাতীয় কল্যাণ' এই—মূলনীতির পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ হইবে 'ন্যূনতম সামাজিক ক্ষতি'। নিজের ভাণ্ডার হইতে সরকারকে কর দিতে সকলেরই কিছুটা কষ্ট হইবে ইহা ধরিয়া লইয়া বলা যায়, সেই করই উৎকৃষ্ট এবং গ্রহণযোগ্য যাহাতে সামাজিক ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে কোন্ প্রণালীতে কর ধার্য্য করিলে সামাজিক ক্ষতি ন্যূনতম হইতে পারে।

কর ধার্য্য করিবার কতকগুলি নীতি বহুকাল ধরিয়া অর্থনীতিবিদগণের নিকট পরিচিত। Cost of Service Principle, Benefit of service, ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ প্রণালীর বিশ্লেষণে আমাদের প্রয়োজন নাই। আমরা শুধু ন্যূনতম সামাজিক ক্ষতির নীতিকে বাস্তবে প্রয়োগ করিয়া কি সিদ্ধান্ত হয় দেখিব। অতীতের কোন কোন অর্থনীতিবিদ বলিতেন, সকল প্রজার নিকট যদি সমান পরিমাণ কর আদায় করা যায়, তবেই সামগ্রিক ক্ষতি ন্যূনতম হইবে। রাষ্ট্রের ব্যয়ের জন্য যদি ২০০০ টাকা প্রয়োজন হয়, এবং প্রজার সংখ্যা যদি হয় ১০০০, তবে প্রত্যেক প্রজার নিকট ২ টাকা আদায় করিলেই এই নীতি প্রতিপালিত হইবে। কিন্তু এই প্রণালীতে কর ধার্য্য করার সুস্পষ্ট দোষ সহজেই বুঝা যায়। সমাজে দরিদ্র এবং ধনী সকলেই বাস করে। তাহাদের সকলের নিকট ২ টাকা কর আদায় করিলে দরিদ্রের উপর অন্যায় এবং ধনীকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে। দরিদ্রকে বাদ দিয়া ধনীর নিকট ৪ টাকা আদায় করিলে সামগ্রিক ক্ষতির পরিমাণ ন্যূনতম হইবে।

আনুপাতিক কর ব্যবস্থায় (Proportional Tax system) এই দোষের গুরুত্ব অনেকখানি লাঘব করা হইয়াছে। এই প্রণালীতে সকলকে তাহার

আয়ের অনুপাতে কর দিতে হইবে। যাহার ১০০৲ আয় সে যদি ১৲ দেয়, ১০০০৲ টাকার লোক দিবে ১০৲ টাকা, ১০০০০০৲ টাকার লোকে দিবে ১০০০৲ টাকা। দরিদ্রের উপর অল্প কর এবং ধনীর উপর অধিক কর চাপানোর বন্দোবস্ত এই ব্যবস্থায় আছে। অনেক দেশেই এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই প্রথাতেও বৈষম্য সম্পূর্ণ বিদূরিত হয় না। ১০০৲ টাকা যে উপার্জ্জন করে তাহার নিকট ১৲ টাকার যাহা মূল্য আর ১০০০৲ টাকা যে উপার্জ্জন করে তাহার কাছে ১০৲ টাকার মূল্য গণিতের হিসাবে সমান হইলেও বাস্তব অবস্থায় সমান নয়। এই প্রসঙ্গে Marginal বা প্রান্তীয় ধারণার অবতারণা আবশ্যক। ১০০০৲ টাকার শেষ ১০টি টাকা প্রান্তীয়। একথা বুঝিতে দেরী হয় না যে, ১০০৲ টাকা যাহার উপার্জ্জন, তাহার প্রান্তীয় ১৲ টাকা ১০০০৲ টাকার প্রান্তীয় ১০৲ টাকা অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান্। ১০০৲ টাকাতে দৈনন্দিন প্রয়োজনই মিটে না; ১০০০৲ টাকায় প্রয়োজন মিটিয়া কিছু কিছু বিলাসে ব্যয় সম্ভব। ১০০৲ টাকার লোককে প্রয়োজনীয় ব্যয় সংক্ষেপ করিয়া ১৲ দিতে হয়। ১০০০৲ টাকার লোক একটু বিলাস কমাইলেই বা দুই একদিন বেশী বাজে খরচ না করিলেই ১০৲ দিতে পারে। অতএব ক্ষতির পরিমাণ দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কম। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে আনুপাতিক কর-ব্যবস্থাও ন্যূনতম ক্ষতির নীতিতে বাতিল হইয়া যায়।

Progressive Tax বা ক্রমোচ্চহারে কর ব্যবস্থার দ্বারা এই দোষকে যথাসম্ভব দূর করা হইয়াছে। একথা সত্য যে, প্রান্তীয় টাকার যে, ধারণা আমরা পাইয়াছি তাহার মাপকাঠিতে কর ধার্য্য করিতে হইলে একটি নির্দ্দিষ্ট আয়ের উপর সকল আয়কে ছাঁটাই করিয়া একটি যান্ত্রিক সমোচ্চ স্তরে আনিয়া ফেলিতে হয়। ১০০০৲ টাকার উপর যত আয় আছে সবগুলির উপর এমন কর ধার্য্য কর যাহাতে সকলগুলি ১০০০৲ টাকার স্তরে আসিয়া যায়; তাহার চেয়ে বেশী আয় কোথাও না থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক কারণে এবং অন্যান্য কারণেও এই যান্ত্রিক সমতা ক্ষতিকারক। এই সমতা আনিতে

গেলে, সমাজে উৎপাদন কমিয়া যাইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির প্রেরণা থাকিবে না, অলস অকর্ম্মণ্য লোকেরা প্রশ্রয় পাইবে, কর্ম্মী উদ্যমশীল লোকের উপর অন্যায় উৎপীড়ন হইবে। অতএব এই যান্ত্রিক সমতার কথা আমাদের ভুলিতে হইবে।

এই দুইদিক বিবেচনা করিয়া সভ্য দেশগুলি একটি মধ্যপন্থা করিয়া লইয়াছে। ক্রমবর্দ্ধমান হারে ধনীদিগের উপর কর ধার্য্য কর, একেবারে দরিদ্রদিগকে সকল কর হইতে রেহাই দাও, এমন কি ধনীদিগের নিকট কর আদায় করিয়া সেই অর্থে দরিদ্রদিগের মঙ্গল সাধন কর। অবৈতনিক শিক্ষা, হাঁসপাতাল, প্রভৃতির জন্য যে অর্থব্যয় হয়, তাহা সংগৃহীত হয় ধনীর নিকট আর তাহার উপকার অধিকাংশই ভোগ করে দরিদ্রেরা। এই নীতি অনুযায়ী ১০০৲ টাকা যাহার উপার্জন তাহাকে কর দিতে হয় না, ১০০০৲ টাকার লোককে দিতে হয় ৫৲, ১০,০০০০৲ টাকার লোককে দিতে হয় ২০০৲, ১০০,০০০৲ টাকার লোককে ১০,০০০৲ অর্থাৎ করের হার প্রথমে ½%, তারপর ২%, তারপর ১০%। ক্রমোচ্চ আয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আদায় করা—ইহাই সভ্য জগতের অনুমোদিত পন্থা।

এই সঙ্গে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের ধারণা অনুযায়ী রাষ্ট্রের শাসনব্যাপারে সকলেরই দায়িত্ব এবং কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত। কিন্তু চিরন্তন সত্য এই যে, শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব আসিতে পারে না, যদি না ইহার জন্য সকলেই কিছু না কিছু অর্থব্যয় করে। সুতরাং দরিদ্র হোক ধনী হোক সকলেরই রাষ্ট্রের রক্ষণ এবং সমৃদ্ধির জন্য সামান্য হইলেও কিছু কর দেওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য indirect tax বা পণ্যের উপর কর ধার্য্য করার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে। লবণ, সুপারী বা এই রকম কোন দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য করিলে সকল প্রজাই অনুভব করিবে সে রাষ্ট্রের ব্যয়ের জন্য অন্ততঃ কিছুটা কর দিতেছে, এবং রাষ্ট্রের কার্য্যের উপরে তাহার খানিকটা দায়িত্ব আসিবে। আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্তগুলিকে সংক্ষেপে বলিতে

গেলে এইরূপ দাঁড়াইবে—ন্যূনতম সামাজিক ক্ষতির নীতি অনুযায়ী দরিদ্রকে direct tax হইতে রেহাই দাও, ধনীদের নিকট হইতে ক্রমবর্দ্ধমান হারে কর আদায় কর এবং সকল জনসাধারণকে শাসন কার্য্যে দায়িত্বশীল করার জন্য দু'একটি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর কর ধার্য্য কর।

পরিশেষে একটি কথা না বলিলে আমাদের প্রবন্ধ অপূর্ণ থাকিয়া যায়। যে সকল পন্থার কথা আমরা বলিয়াছি, সবগুলিই কেবল ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে প্রযোজ্য। সমাজতান্ত্রিক সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হইলে একেবারে অন্যরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইবে। ধনতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং ব্যক্তিগত মুনাফা আছে। এইগুলি বজায় রাখিয়া কি উপায়ে রাষ্ট্রের ব্যয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা যায়, কি উপায়ে ধনবণ্টনের বৈষম্য কিছুটা কমানো যায় তাহাই আলোচনা করা হইয়াছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মুনাফা থাকে না, বৈষম্যও এত উগ্র নহে। অতএব সেখানকার কর-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অন্য প্রকার।

স্বর্ণমান

আজিকার দিনে স্বর্ণমান সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক মনে হইতে পারে। গত ১৪।১৫ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর প্রধান দেশগুলি স্বর্ণমান ত্যাগ করিয়াছে। স্বর্ণমান যে আবার প্রতিষ্ঠিত হইবে এমন আশাও সুদূরপরাহত। কিন্তু তবুও স্বর্ণমানের আলোচনা শুধু post mortem পরীক্ষার উদ্দেশ্যে নয়। স্বর্ণমান বহুদিন ধরিয়া পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দেশগুলিতে সুপ্রতিষ্ঠ ছিল। গ্রেট্ বৃটেন, ফ্রান্স, জার্ম্মানী, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি দেশের সামগ্রিক সম্প্রসারণের

যুগেই তাহাদের মুদ্রা ছিল স্বর্ণের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐতিহাসিক কারণে স্বর্ণমান জন্মিয়াছিল, সমৃদ্ধ হইয়াছিল, ব্যাপ্ত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক কারণেই তাহার পতন হইয়াছে। কেন হইয়াছে, কোথায় ছিল তাহার দুর্ব্বলতা, নূতন যুগে আর্থিক জগতের কী নূতন চাহিদা ছিল যাহা স্বর্ণমান মিটাইতে পারিল না, যে চাহিদা মিটাইবার জন্য সব দেশগুলিকে স্বর্ণ ছাড়িয়া কাগজের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল—এইগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জানিবার বিষয়। ভবিষ্যতে স্বর্ণমান থাকুক আর নাই থাকুক মুদ্রা তো থাকিবেই; আর মুদ্রানীতিও থাকিবে। স্বর্ণমানের উত্থান এবং পতন মুদ্রার ইতিহাসে এক স্মরণীয় এবং শিক্ষণীয় ঘটনা। ভবিষ্যতের মুদ্রা-কর্ত্তৃপক্ষগণ এই উত্থান-পতনের ইতিহাসের অভিজ্ঞতা হইতে অনেক লাভ করিতে পারিবেন। অতএব স্বর্ণমান আলোচনা করার মূল্য আছে।

যখন কোন দেশের মুদ্রা স্বর্ণের সহিত স্থায়ী এবং অপরিবর্ত্তনীয় সম্বন্ধে সংযুক্ত থাকে, তখন বলা যায় সেই দেশে স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠিত। মুদ্রা এবং স্বর্ণের মধ্যে এই স্থায়ী সম্বন্ধটি রক্ষা করার জন্য আবশ্যক—কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট হারে মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ এবং স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা বিনিময় করিতে সম্মত এবং প্রস্তুত থাকিবেন। এই পরস্পর বিনিময় যদি অবাধভাবে না চলিতে থাকে, তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধও রক্ষিত হয় না। কর্ত্তৃপক্ষ যদি স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা অবাধে দিতে সম্মত না থাকেন, তাহা হইলে জনসাধারণ ভাবিবে স্বর্ণের মূল্য কমিতেছে, আর মুদ্রার মূল্য বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব বেশী স্বর্ণ দিয়া তাহারা মুদ্রা সংগ্রহ করার চেষ্টা করিবে। অন্য দিকে মুদ্রার পরিবর্ত্তে যদি কর্ত্তৃপক্ষ অবাধে স্বর্ণ না দেয়, তবে জনসাধারণ ভাবিবে মুদ্রার মূল্য স্বর্ণের মূল্য অপেক্ষা কমিয়া যাইতেছে এবং অধিক মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করিবে। অতএব দুই ক্ষেত্রেই স্বর্ণ এবং মুদ্রার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হারের সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইংলণ্ডের মুদ্রাকর্ত্তৃপক্ষ এক আউন্স স্বর্ণ ৩ পাঃ ১৭ শিঃ ৯ পেন্সে ক্রয় করিতে এবং ৩ পাঃ ১৭ শিঃ

১০½ পেন্সে বিক্রয় করিতে বাধ্য থাকিতেন। ইহা ব্যতীত স্বর্ণের আমদানী রপ্তানীর উপর কোন নিষেধ ছিল না।

স্বর্ণমান ব্যবস্থায় স্বর্ণ এবং মুদ্রার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ বর্ত্তমান। কিন্তু এই সম্বন্ধ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিকট কিংবা দূর হইতে পারে। সম্পর্কের নৈকট্য বা দূরত্বের উপর ভিত্তি করিয়া স্বর্ণমানকে চার ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। স্বর্ণপ্রচলন মান, স্বর্ণবাট মান, স্বর্ণবিনিময় মান, এবং স্বর্ণ সঞ্চয় মান। স্বর্ণ-প্রচলন মান সেই দেশে বর্ত্তমান যে দেশের প্রধান প্রচলিত মুদ্রাগুলি স্বর্ণনির্ম্মিত, যখন নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণের পরিবর্ত্তে মুদ্রা এবং মুদ্রার পরিবর্ত্তে স্বর্ণ যথেচ্ছ পরিমাণে পাওয়া যায়, এবং স্বর্ণ ও স্বর্ণমুদ্রার অবাধভাবে ক্রয়-বিক্রয় এবং আমদানী-রপ্তানী চলিতে পারে। এই অবাধ স্বর্ণ মুদ্রা প্রচলনের জন্য অত্যন্ত বেশী পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন হয়। তাহা ছাড়া, মানুষের হাতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া স্বর্ণমুদ্রা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এবং প্রচুর স্বর্ণ অপচয় হয়। অতএব স্বর্ণবাট মানের প্রয়োজন হইয়াছিল। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণমুদ্রার প্রয়োজন হয় না, দেশের আভ্যন্তরীণ সকল কার্য্যের জন্য সস্তা ধাতুর মুদ্রা অথবা কাগজের নোটেই কার্য্য চলিতে পারে। কেবলমাত্র যখন আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার জন্য অথবা অন্য কোন কারণে একত্রে অধিক পরিমাণ স্বর্ণের প্রয়োজন হয় তখন কর্ত্তৃপক্ষ নির্দ্দিষ্ট মূল্যের পরিবর্ত্তে নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণ দিতে প্রস্তুত থাকে। বিলাতে ৪০০ আউন্স স্বর্ণবাট ১৫৫৭ পাঃ ১০ শিলিঙে কর্ত্তৃপক্ষ বিক্রয় করিত। এই ব্যবস্থায় স্বর্ণের প্রয়োজন অনেক কম হয়, এবং অপচয় প্রায় হয় না। স্বর্ণের বিনিময়মান ব্যবস্থায় স্বর্ণের সহিত মুদ্রার সম্পর্ক আরও দূর। কোন দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা অনুরূপ সবল না হওয়ার জন্য, সেই দেশ যখন নিজের শক্তিতে স্বর্ণমান প্রবর্ত্তন করিতে পারে না, তখন অন্য কোন বিত্তশালী দেশের (যে দেশে স্বর্ণমান) সহায়তায় তাহা করিতে পারে। ধরা যাউক, বিলাতে স্বর্ণমান প্রচলিত, ফ্রান্স স্বর্ণমান প্রবর্ত্তন করিতে চায়, কিন্তু তাদৃশ স্বর্ণসঞ্চয় তাহার নাই, তখন সে বিলাতী পাউণ্ডের সহিত স্বীয় ফ্রাংকের একটি নির্দ্দিষ্ট

বিনিময় হার বাঁধিয়া দিবে। ইহাতে হইবে কি—পাউণ্ডের সঙ্গে স্বর্ণের সম্পর্ক বাঁধা, ফ্রাংকের সহিত পাউণ্ডের সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট, অতএব পাউণ্ডের মাধ্যমে ফ্রাংকের সহিত স্বর্ণের সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া যায়। আভ্যন্তরীন কোন ব্যাপারে স্বর্ণের কোন প্রয়োজন হইবে না; স্বর্ণের পরিমাণ হ্রাসবৃদ্ধির সহিত আভ্যন্তরীণ মূল্য কমিবে না বা বৃদ্ধি পাইবে না। কেবল মাত্র ফ্রাংকের বৈদেশিক মূল্য স্থিরীকৃত হইবে পাউণ্ডের সাহায্যে। আন্তর্জ্জাতিক ক্রয়-বিক্রয় সকল ব্যাপারে পাউণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া ফ্রান্সকে সকল কার্য্য করিতে হইবে। উপরি উক্ত তিন প্রকারের স্বর্ণমান পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু স্বর্ণসঞ্চয় মান কোন দেশেই স্থায়ী এবং সক্রিয় হয় নাই। ইহার কার্য্যপ্রণালীও ঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। অনেকখানি পরিমাণের সঞ্চিত স্বর্ণ এবং Exchange Equalisation Account এর সাহায্যে ইহাকে প্রবর্ত্তিত করা যায়। ইহার বিশদবর্ণনা সম্ভব নহে, প্রয়োজনও নহে।

স্বর্ণমানের সংজ্ঞা আমরা পাইয়াছি—কিন্তু তাহার কার্য্য কি; উপকারিতা কোথায়? স্বর্ণমানের দুইটি প্রধান কাজ—(১) মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য ঠিক রাখা অর্থাৎ দেশের পণ্যসম্ভারের মূল্য হঠাৎ কমিতে বা হঠাৎ বাড়িতে না দেওয়া। (২) মুদ্রার দ্বিতীয় কাজ হইল মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য ঠিক রাখা—বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হার নির্দ্দিষ্ট করা এবং বিনিময়-হারের পরিবর্ত্তন বন্ধ করা।

নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মুদ্রা দিয়া কতখানি দ্রব্য ক্রয় করা যায়—ইহার সাহায্যেই মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্য বুঝা যায়। অতএব মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা নির্ভর করে পণ্যের মূল্যস্তরের উপর। পণ্যের মূল্যস্তর নির্ভর করে পণ্যের যোগান এবং মুদ্রার যোগানের উপর। কাগজের মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ যথেচ্ছ প্রকাশ করিতে পারেন, তাহাকে সংযত করা চেষ্টা সাপেক্ষ। অতএব কাগজের মুদ্রা ব্যবস্থায় পণ্যের মূল্যস্তরের স্থিরতা রক্ষা করা শক্ত হইয়া দাঁড়ায়। কিন্তু মুদ্রা যখন স্বর্ণের উপর

প্রতিষ্ঠিত থাকে, স্বর্ণ তো মুদ্রা-কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছ পাইতে পারেন না। স্বর্ণের পরিমাণ স্বাভাবিকভাবে সীমাবদ্ধ, অতএব মুদ্রার পরিমাণও সীমাবদ্ধ না হইয়া পারে না। স্বর্ণখনির উৎপাদনের যে স্বাভাবিক সীমা, সেই সীমাই নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় মুদ্রার পরিমাণ। সুতরাং মুদ্রার পরিমাণ সংযত হয় এবং দ্রব্যের মূল্য এবং মুদ্রার ক্রয়-ক্ষমতা দুইই বেশ স্থির এবং স্থায়ী হইয়া যায়। অবশ্য অসুবিধা দু' একটি দেখা দেয়। স্বর্ণের উৎপাদন নির্ভর করে প্রকৃতির উপর। পণ্যের উৎপাদন নির্ভর করে মানুষের চাহিদার উপর। বৎসরের পর বৎসর জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সাথে সাথে পণ্যোৎপাদন বৃদ্ধি পায়। স্বর্ণের মোট পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এই দুইটি বৃদ্ধি যে সমান তালে চলিবে এমন কোন কথা নাই। দ্বিতীয়তঃ হঠাৎ যদি কোন দেশে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত হয় তবে স্বর্ণের উৎপাদন এবং তৎসহ মুদ্রার উৎপাদন বৃদ্ধি পায় এবং পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। অথবা যুদ্ধপ্রভৃতি কোন জরুরী অবস্থায় যদি অধিক পরিমাণ পণ্যের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে আর স্বর্ণমানকে ধরিয়া রাখা যায় না। মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট থাকার জন্য, পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইলে মূল্য কমিয়া যাইবে। অথচ পণ্যের মূল্য কমিলে আর অধিক উৎপাদন সম্ভব হয় না। অতএব এই সব জরুরী সময়ে স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া কৃত্রিম উপায়ে মুদ্রার পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়। ইহার ফলে পণ্যের মূল্যস্তর উচ্চতর হয়, ব্যবসায়ীদিগের লাভের পথ উন্মুক্ত করা হয় এবং প্রয়োজনানুসারে অধিকতর পণ্য উৎপন্ন করা সম্ভব হয়।

স্বর্ণমানের দ্বিতীয় কার্য্য হইল—বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মধ্যে বিনিময়-হার নির্দ্ধারিত করা। সকল দেশের মুদ্রা স্বর্ণের সহিত নির্দ্দিষ্ট হারে সংযুক্ত থাকায় তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সহজেই নির্দ্দিষ্ট হইয়া যায়। ধরা যাক্— ভারতের টাকার সহিত স্বর্ণের সরকারী সম্বন্ধ অনুসারে ১০০ টাকা=১ ভরি সোনা। সেইরূপ বিলাতের ৫ পাউণ্ড=১ ভরি সোনা। যেহেতু স্বর্ণ সর্ব্বজন-গ্রাহ্য বস্তু এবং যেহেতু স্বর্ণের অবাধ আমদানী-রপ্তানী প্রচলিত আছে, অতএব

স্বর্ণের মূল্য একস্থান হইতে অন্য স্থানে বিভিন্ন হইতে পারে না। যানবাহনের ব্যয় বাদ দিলে সমস্ত পৃথিবীতে স্বর্ণের মূল্য অভিন্ন হইবে। স্বর্ণের এই এক অপরিবর্ত্তনীয় আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের মধ্য দিয়া ভারতের টাকা এবং বিলাতের পাউণ্ডের সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় ১ পাউণ্ড=২০ টাকা। ইহাই হইবে স্থিতিশীল বিনিময় হার—যদিও কোন কারণে বিনিময়-হার ইহা হইতে ভিন্ন হয়, তখনই কতকগুলি স্বাভাবিক শক্তির সমাবেশে বিনিময়-হার এই স্থিতিশীল স্তরেই পুনর্ব্বার আসিয়া পৌছাইবে। ধরা যাক্, কোন কারণবশতঃ টাকা পাউণ্ডের বিনিময় হার হইল ১ পাউণ্ড=২৫ টাকা। স্বর্ণের ব্যবসায়ীগণ ভারতে ১০০০০ টাকা দিয়া ১০০ ভরি স্বর্ণ ক্রয় করিবে, বিলাতে রপ্তানী করিয়া বিক্রয় করিয়া ৫০০ পাউণ্ড আদায় করিবে এবং এই পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে (৫০০×২৫) ১২৫০০ টাকা পাইবে। অর্থাৎ কোনরূপ চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র স্বর্ণের আমদানী-রপ্তানী করিয়া তাহারা বিরাট লাভ করিবে। ইহা বেশীদিন চলিতে পারে না। বেশী দিন চলিলেই, ভারতে স্বর্ণ কিনিবার জন্য এবং পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে টাকা পাইবার জন্য টাকার চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে, টাকার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে, অপরদিকে সকলেই পাউণ্ডের পরিবর্ত্তে টাকা চাহিবে, টাকার পরিবর্ত্তে পাউণ্ড কেহই চাহিবে না। অতএব পাউণ্ডের মূল্য কমিয়া যাইবে। মোট ফল দাঁড়াইবে—টাকার হিসাবে পাউণ্ডের মূল্য হ্রাস হইবে এবং পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য বৃদ্ধি হইবে। দুই দিক হইতে এই দুইটি শক্তির চাপে ১ পাউণ্ড=২৫ টাকা থাকিতে পারিবে না —১পাউণ্ড=২০ টাকা হইয়া যাইবে। যতক্ষণ না তাহা হয়, ততক্ষণ স্বর্ণের এই আন্তর্জ্জাতিক প্রবাহ চলিতে থাকিবে, বিনিময় হারে চঞ্চলতা বজায় থাকিবে। অবশ্য এই অচঞ্চল বিনিময়-হার (১পাউণ্ড=২০ টাকা) ফিরিয়া আসিতে সময় লাগিতে পারে। এমন কি ফিরিতে ফিরিতে ইহা বিপরীত দিকে চলিয়া যাইতে পারে যখন ১পাউণ্ড হইবে ১৭ টাকা। তখন আবার ঐ একই প্রকৃতির বিপরীত শক্তিগুলি কার্য্য করিবে। দোলক যেমন একটি কেন্দ্রস্থ বিন্দুর দুই পার্শ্বে যাওয়া আসা করে, কিন্তু খানিক পরে সেই বিন্দুতেই আসিয়া স্থিরীভূত হয়, এই

বিনিময়-হারও সেইরূপ বিরুদ্ধ শক্তিগুলির চাপে পড়িয়া দুলিতে দুলিতে স্বর্ণের আন্তর্জ্জাতিক মূল্য-বিন্দুতে আসিয়া স্থির হইবে।

স্বর্ণ মূল্যের মধ্য দিয়া এই যে বিনিময়-হার স্থির থাকিত, ইহার দ্বারা সেই যুগে কী বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হইয়াছিল—তাহা বিস্ময়ের বস্তু। স্বর্ণমানের যুগ ছিল আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার অভূতপূর্ব্ব সম্প্রসারণের যুগ। বিনিময়-হার স্থির না থাকিলে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা প্রসার লাভ করিতে পারিত না, বর্ত্তমান পৃথিবীর উন্নত সভ্যতার বনিয়াদ্ গড়িয়া উঠিতে পারিত না। কেবল আভ্যন্তরীণ ব্যবসা দ্বারা দেশের পূর্ণাঙ্গ উন্নতি সম্ভব নহে, তাই আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার প্রসারের জন্য স্বর্ণমান প্রতিষ্ঠা করিয়া বিনিময়-হার ঠিক করা, এবং দেশীয় মুদ্রার বৈদেশিক মূল্য ঠিক করা—ইহাই হইয়াছিল সেই যুগের রাষ্ট্রের প্রধান কর্ত্তব্য।

কিন্তু অসুবিধাও অনেক ছিল। পূর্ব্বেই দেখিয়াছি পণ্যের উৎপাদন আর স্বর্ণের উৎপাদন ঠিক তালে তালে চলিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত করা হয় না; অতএব আভ্যন্তরীণ মূল্যের স্থিরতা স্বর্ণমান দ্বারা আসে না। বর্ত্তমানে আরও গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা দেখা যাইতেছে। মুদ্রার আন্তর্জ্জাতিক মূল্য নির্দ্দিষ্ট রাখিতে গিয়া কর্ত্তৃপক্ষকে ইহার আভ্যন্তরীণ মূল্যকে অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়া দিতে হয়। আভ্যন্তরীণ মূল্য ও আন্তর্জ্জাতিক মূল্য পরস্পর-বিরোধী শক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। দুইটিকে একই সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। কর্ত্তৃপক্ষ স্বর্ণমানের সাহায্যে মুদ্রার আভ্যন্তরীণ মূল্যকে অনির্দ্দিষ্ট রাখিয়া বৈদেশিক মূল্যকে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, ইহাতে বৈদেশিক মূল্যের উপর যত কিছু ঘাত-প্রতিঘাত আসে, সবগুলি শেষ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে আভ্যন্তরীণ মূল্য এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর। এক দেশের অর্থনৈতিক সংকট নির্দ্দিষ্ট বিনিময়-হারের মধ্য দিয়া অন্য দেশের মুদ্রাকে প্রভাবান্বিত করে। ইংলণ্ডের ভূমিকম্প, যুদ্ধ অথবা বাজার-মন্দার জন্য পাউণ্ডের মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি টাকার উপর আসিয়া পড়িবে এবং ভারতকে তাহার ভার

বহন করিতে হইবে। বৈদেশিক মূল্য ঠিক রাখিতে গিয়া সর্ব্বদা-পরিবর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ মূল্যের সকল কুফলগুলিই দেখা দেয়।

তথাপি সেই যুগে স্বর্ণমান কার্য্যকরী ছিল—কারণ তখন ছিল আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসাপ্রসারের যুগ। কোন গুরুতর আভ্যন্তরীণ সংকট তখনও দেখা দেয় নাই। কিন্তু ক্রমশ আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি প্রকট হইতে লাগিল। দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা অক্ষুণ্ণ রাখা, মুদ্রার আভ্যন্তরীণ ক্রয়ক্ষমতা ঠিক রাখা, শ্রমিকের মাহিয়ানা, সরকারী বাজেট, ইত্যাদি অপরিবর্ত্তিত রাখার প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এমন অবস্থা দেখা দিল, যখন আর আভ্যন্তরীণ মূল্যকে অনির্দ্দিষ্ট ফেলিয়া রাখা যায় না। শুল্কের ক্ষেত্রে যেমন অবাধ বাণিজ্যের স্থানে শুল্কপ্রাচীর উঠিতে লাগিল, মুদ্রার ক্ষেত্রেও তেমনি আন্তর্জ্জাতিকতা বাদ দিয়া জাতীয় স্বার্থের অনুকূল মুদ্রানীতি গৃহীত হইল। সকল দেশই বুঝিতে পারিল আন্তর্জ্জাতিক equilibrium অপেক্ষা জাতীয় equilibrium বেশী প্রয়োজন। এই উপলব্ধি হইতে তাহারা পূর্ব্বাহ্নে জাতীয় মূল্য-স্তরকে এবং মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতাকে নির্দ্দিষ্ট করার চেষ্টা করিল, এবং মুদ্রার বৈদেশিক মূল্যকে অনির্দ্দিষ্ট ফেলিয়া রাখিল। আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমান পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় মুদ্রানীতি (কাগজের সাহায্যে) গড়িল।

আন্তর্জ্জাতিক স্বর্ণমানের পতনে অনেকেই দুঃখিত হইয়াছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত, ইহাকে আর ধরিয়া রাখা যায় না বলিয়াই, ইহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতিদেশে শ্রমিক-কৃষক সমস্যা, বৈদেশিক প্রতিযোগিতা সমস্যা হইতে আরম্ভ করিয়া সকল আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি প্রকট হইতেছে। আভ্যন্তরীণ ব্যবসাকে সুদৃঢ় না করিয়া আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা প্রসার করিতে যাওয়াও মূর্খতা। অতএব প্রত্যেক দেশের ভিতরকার সমস্যাগুলিকে প্রথম সমাধান করা প্রয়োজন হয়। আন্তর্জ্জাতিক মূল্যের উপর প্রথম দৃষ্টি দেওয়া যায় না।

এ কথাও বুঝা প্রয়োজন যে, মুদ্রানীতিই হোক আর যে কোন ব্যবস্থাই

হোক, সকল সময়েই আমাদের লক্ষ্য ব্যবসাবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি করা। অতীতে যখন বিভিন্ন দেশের পরিস্থিতি অনেকটা একরূপ এবং বেশ সরল ছিল, তখন স্বর্ণমানের উপর প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা-ব্যবস্থা কল্যাণকর হইতে পারে। কিন্তু প্রতিদেশের ভিতরকার অবস্থা যখন ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠিতেছে, যখন একদেশের সমস্যার সহিত অন্য দেশের সমস্যার সাদৃশ্য দূরে থাকুক, বৈসাদৃশ্যই অত্যন্ত প্রকট তখন বল-পূর্ব্বক দেশের উপর একটি আন্তর্জ্জাতিক ব্যবস্থা চাপানোর চেষ্টা কখনই শুভ হইতে পারে না। ইহা ব্যতীত, আগেও দেখিয়াছি—যুদ্ধ, বাণিজ্য-চক্র, প্রভৃতি সংকট যখনই আসিয়াছে, স্বর্ণমান তখনই পরিত্যাগ করা হইয়াছে। তাহার অর্থ এই যে, স্বর্ণমান শান্তিপূর্ণ আবহাওয়ার ব্যবস্থা, (Fair weather friend) ঝড়বাদলের সম্মুখে ইহা টিকিতে পারে না; তখন বেসামাল অবস্থায় কাগজের মুদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। এতগুলি যাহার অক্ষমতা, বর্ত্তমানে সেই স্বর্ণমানকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখায় কী লাভ? উজ্জ্বল হরিদ্রাবর্ণ ধাতুটি আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের চিত্তহরণ করিয়াছিল! মার্জ্জিত-রুচি হইয়া আমরা ইহার কুফল পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করিয়া সামান্য রং এবং উজ্জ্বলতা দ্বারা প্রতারিত হইব কেন? সস্তার সাদা কাগজ তাহার চেয়ে অনেক ভালো!

বাণিজ্য-চক্র

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ, সুখানি চ।" জীবনের এই সত্য বাণিজ্য-জগতেও অতি নির্ম্মম ভাবে প্রযোজ্য। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বৃহত্তম দুর্ব্বলতা হইতেছে যে, বাণিজ্যের গতি ইহাতে সরল বা মসৃণ নহে। উত্থান এবং পতন পর্য্যায়ক্রমে দেখা দেয়। কিছুদিন সমৃদ্ধির পর কিছুদিন বাজার মন্দা

—ইহাই হইল বাণিজ্য-জগতের রীতি। পর্য্যায়ক্রমে এই যে বাণিজ্য-স্ফীতি এবং বাজার-মন্দা ইহাকেই বাণিজ্যচক্র বলে। মূল্যস্তর (Price-level) এবং বেকার-সংখ্যা—এই দুইটি লক্ষণ হইতে বুঝা যায় বাণিজ্যচক্র কোন্‌দিকে ঘুরিতেছে। যখন মূল্যস্তর উঠিতেছে ও বেকার-সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে, তখন বাণিজ্য-স্ফীতির যুগ। যখন মূল্যস্তর কমিতেছে ও বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে তখন বাণিজ্য-সংকোচের যুগ। এই উত্থান-পতনকে চক্রের সহিত তুলনা করা হয় এই জন্য যে, কোন সময়ে উত্থান অথবা পতনের মধ্যেই তাহার প্রতিক্রিয়ার বীজ লুক্কায়িত থাকে, স্ফীতি হইলেই ইহা অবধারিত যে পতনের দিকে চক্র ঘুরিবে। তাহা ছাড়া এই সকল চক্রাকারের বিবর্ত্তন একটি নির্দ্দিষ্ট সময় মানিয়া চলে। অতীতে এইরূপ বলা হইত যে, বাণিজ্য-চক্রের একবার পূর্ণ বিবর্ত্তনের জন্য ১০। ১১ বৎসর সময় লাগে।

বাণিজ্যচক্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সমস্ত ব্যবসা-জগতের মধ্যে যে সূক্ষ্ম অথচ দৃঢ় যোগসূত্র বিদ্যমান তাহারই শক্তিতে বিভিন্ন বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠানের স্ফীতি অথবা সংকোচন একই সময়ে দেখা যায়। ব্যবসা যখন একটি শিল্পে খুব সমৃদ্ধ তখন এই সমৃদ্ধি সেই যোগসূত্রের মধ্য দিয়া অন্যান্য শিল্পে ছড়াইয়া পড়ে। সমৃদ্ধ শিল্পটি অধিক কাঁচামাল ক্রয় করে, অধিক শ্রমিক নিয়োগ করে। কাঁচামাল বিক্রেতারা অধিক লাভ করে, এবং শ্রমিকেরা উচ্চ বেতন পায়। শ্রমিকেরা উচ্চ বেতন পাইয়া অধিক ব্যয় করে, অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য অধিক ক্রয় করে। যে সকল দ্রব্য তাহারা ক্রয় করে, সেই সকল শিল্পে মুনাফা এবং উৎপাদন বেশী হয়, বেশী শ্রমিক নিযুক্ত হয়। এই শ্রমিকেরা উচ্চতর বেতন পায়। এই সকল শ্রমিকেরা আবার অন্যান্য শিল্পের সমৃদ্ধি আনিয়া দেয়। এই যোগসূত্রটির কারণ হইতেছে—একজনের ব্যয় হইতে অপরের রোজগার আসে। অতএব সমৃদ্ধি কখনও একটি মানব গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না, বাণিজ্য জগতের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া যায়। আবার একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান হয়তো লোকসান দিতে দিতে

বন্ধ হইয়া যায়। তাহারা আর কাঁচামাল ক্রয় করিবে না এবং শ্রমিক ছাঁটাই করিয়া দিবে। কাঁচামাল-বিক্রেতাদের চাহিদা কমিবে, লোকসান হইবে, অতএব উৎপাদন কমাইয়া দিবে। শ্রমিকেরা যে সকল খাদ্য, বস্ত্র এবং অন্যান্য পণ্য ক্রয় করিত, তাহা আর ক্রয় করিবে না; অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিবে। সেখানেও লোকসান দেখা দিবে, এবং সেই সকল শিল্প সংকুচিত হইবে। শ্রমিক ছাঁটাই হইবে, বেকার-সমস্যা উগ্রতর হইবে। বাজার-মন্দা দেখা দিবে এবং পাপচক্র একবার চলিতে আরম্ভ করিলে নিজের গতিতে চলিতে থাকিবে। দুর্দ্দশার চরম সীমায় দেশ আসিয়া পৌছাইবে।

বাণিজ্য-চক্রের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হইতেছে চক্রটি দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে না—আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসার মধ্য দিয়া ইহা আন্তর্জ্জাতিক রূপ পরিগ্রহ করে। বেকার-সমস্যা এবং ব্যবসায়ের সংকোচন সকল দেশে ছড়াইয়া পড়ে। তৃতীয়তঃ বাণিজ্য-চক্রের গতি অনেকটা তরঙ্গের প্রবাহের মত। যুগের পর যুগ ধরিয়া ইহা উঠিতেছে, পড়িতেছে আবার সমানভাবে বহিয়া যাইতেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিচিত্র অবস্থার মধ্যে যে সকল বাণিজ্যচক্র দেখা দেয় তাহাদের একটির সহিত অন্যটির প্রভেদ যথেষ্ট আছে। কিন্তু প্রত্যেকটির গতির চিত্র যদি গ্রহণ করা যায়, দেখা যাইবে তরঙ্গোপম গতি প্রত্যেকটিরই বৈশিষ্ট্য। সংক্ষিপ্ত করিয়া বলা যায় বাণিজ্য-স্ফীতির লক্ষণ এবং পরিণাম হইতেছে—পণ্যের উচ্চ মূল্যান্তর, ব্যবসায়িগণের অতিরিক্ত মুনাফা, শ্রমিকের উচ্চ বেতন, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ, বেকার সমস্যার তিরোভাব এবং দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধি। বাজার মন্দার লক্ষণ হইতেছে—পণ্যের নিম্ন মূল্যান্তর, ব্যবসায়িগণের লোকসান, শ্রমিকের নিম্ন বেতন, ব্যবসায়ের সংকোচন এবং সারা দেশ জুড়িয়া উগ্র বেকার-সমস্যা। বাণিজ্য-চক্রের এই দুইটি বিপরীত রূপ পর পর দেখা দেয় এবং একটি অপরটির জন্মদাতা।

ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার বিঘ্ন স্বরূপ এই যে বাণিজ্য-চক্র—ইহার কারণ কী? পূর্ব্বাহ্নে বলিয়া রাখা যাইতে পারে বহু অর্থনীতিবিদ্ ইহার

কারণ দর্শাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ অভ্রান্ত কেহই নহেন। Jevons প্রমুখ পুরাতন লেখকেরা বলিতেন ১০।১২ বৎসর অন্তর সূর্য্যের মধ্যে একটি চিহ্ন দেখা যায়, এই সময়ে সূর্য্য পৃথিবীতে অল্পতর তাপ বিকীরণ করে, ফলে শস্য আশাপ্রদ জন্মায় না এবং বাজার-মন্দা দেখা দেয়। বাণিজ্যের উত্থান-পতনের উপরে প্রাকৃতিক আবহাওয়ার প্রভাব নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য, কিন্তু তাই বলিয়া বাণিজ্য-চক্র শুধু এই কারণে সংঘটিত হয়—ইহা বালক-সুলভ ভ্রান্তি। মার্ক্স প্রমুখ অর্থনীতিবিদগণ বলিতেন যে, সমাজের বর্ত্তমান কাঠামো—যাহাতে অধিক সংখ্যক দরিদ্র এবং অল্প সংখ্যক ধনী—তাহাই বাণিজ্য চক্রের জন্য দায়ী। ধনীগণ ব্যয় অপেক্ষা অর্থ সঞ্চয় বেশী করেন; অতএব পণ্য ক্রয় করিবার লোক কম থাকে। অপরদিকে ধনীদের সঞ্চিত অর্থ পুনর্ব্বার শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া সমধিক পণ্য উৎপাদন করে। একদিকে পণ্যের যোগান বৃদ্ধি পায় অপর দিকে চাহিদা কমিয়া যায়—পণ্যের মূল্য কমিয়া যায়, ব্যবসায়ে লোকসান্ হইতে থাকে। এই ক্ষেত্রে বলা যায়—এই যুক্তি বাজার-মন্দার কারণ হইতে পারে, বাণিজ্য-চক্রের নহে। Hawtrey প্রভৃতি আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন—পরিবর্ত্তমান মুদ্রানীতিই বাণিজ্য-চক্রের একমাত্র কারণ। মুদ্রাকর্ত্তৃপক্ষ কোন সময়ে দেশে অধিক মুদ্রা প্রকাশ করেন, দেশে ক্রয়-ক্ষমতা বা অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, মূল্যস্তর উচ্চতর হয়, মুনাফা বাড়িয়া যায়, বাণিজ্যের স্ফীতি হয়। অপর দিকে মুদ্রা কর্ত্তৃপক্ষ কোনসময়ে মুদ্রার পরিমাণ সংকুচিত করেন, অর্থের পরিমাণ অতএব পণ্যের মূল্য কমিয়া যায়, ব্যবসায়ে লোকসান হয়, বাজার-মন্দা দেখা দেয়। Hawtreyর তত্ত্বের মধ্যে অত্যন্ত শিক্ষণীয় বিষয় আছে। বাণিজ্যের উপর মুদ্রানীতির প্রভাব স্বীকার্য্য। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন, মুদ্রাস্ফীতি বা মুদ্রা-সংকোচ বাণিজ্য চক্রের অগ্রদূত; তাহার কারণ নহে। দিনের পর রাত্রি আসে এবং রাত্রির পর দিন আসে—তাই বলিয়া দিনকে রাত্রির অথবা রাত্রিকে দিনের কারণ বলিলে ভুল হইবে।

Hayek Keynes প্রভৃতি আধুনিকতম বিজ্ঞরা বলিয়াছেন—নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য, কোন বৎসরে দেশে যে পরিমাণ অর্থ নূতন ভাবে খাটানো (invested) হয়, সেই বৎসরে সমস্ত জনসাধারণ কর্ত্তৃক মোট অর্থ সঞ্চিত যাহা হয়, তাহা অপেক্ষা বেশী হইলে, তখনই শিল্পজাত দ্রব্যের চাহিদা কমিয়া যায়, বাজার-মন্দা দেখা দেয়। আবার যখন মোট বাৎসরিক সঞ্চয় অপেক্ষা নূতন খাটানো অর্থের পরিমাণ বেশী হয়, তখনই বাজারে যে পরিমাণ দ্রব্য উৎপন্ন হয়, চাহিদা হয় তাহা অপেক্ষা বেশী, অতএব মূল্য বৃদ্ধি এবং বাণিজ্য-স্ফীতি দেখা দেয়। Investment এবং Savings এর বৈষম্য বাণিজ্য-চক্রের কারণ।

বাণিজ্যচক্রের এই যে বিভিন্ন কারণ দেখানো হইয়াছে, সবগুলির মধ্যে কিছু পরিমাণ সত্য আছে, কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনটিই নহে। বাণিজ্যচক্রের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ আর্থিক নহে, মুদ্রাসম্বন্ধীয় নহে—উহা মানসিক। ব্যবসায়ীগণ যখন আশাবাদী হয়, অনুভব করে ব্যবসায়ে লাভ হইবে, তখন বাণিজ্য-স্ফীতি দেখা দেয়। যখন সন্ত্রস্ত হইয়া মনে করে ব্যবসায়ে লোকসানের সম্ভাবনা বেশী তখনই বাজার-মন্দা আরম্ভ হয়। আশাবাদের বা সন্ত্রাসের কোন বাস্তব কারণ থাকুক আর নাই থাকুক, বাণিজ্যচক্রের বিবর্ত্তন ঠিক সুরু হইবে।

বাণিজ্যচক্র-বিবর্ত্তন নিবারণের বহু প্রচেষ্টা সকল দেশের সরকার এবং মুদ্রা-কর্ত্তৃপক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার কারণও ঠিকমতো নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, নিবারণের পন্থাও পাওয়া যায় নাই। বাণিজ্যচক্র নিবারণ করা যাক্ আর নাই যাক্, ইহার কুফলগুলি অংশতঃ কমাইয়া দেওয়া যায়; তরঙ্গ-প্রবাহ রুদ্ধ করা না গেলেও তরঙ্গের উচ্চতম শিখর হইতে নিম্নতম গহ্বরের পার্থক্য অল্পতর করা যায়।

প্রধানতঃ দুইটি উপায়ে ইহা করার চেষ্টা হয়। মুদ্রানীতিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেশের অর্থের পরিমাণ এমন ভাবে বৃদ্ধি এবং হ্রাস করা হয়, যাহাতে বাণিজ্যস্ফীতির সময়ে মূল্যস্তর উঠিতে না পারে, এবং বাজার মন্দার সময়ে

মূল্যস্তর নামিতে না পারে। বাণিজ্যচক্রের নিকটতম সহচর হইল মূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি। অতএব এই হ্রাসবৃদ্ধিকে বন্ধ করিয়া চক্রের বিবর্ত্তন সংযত করা যায়। অর্থের পরিমাণ এবং মূল্যস্তর সংযত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুদের হার হ্রাসবৃদ্ধি করে, এবং সেই সঙ্গে টাকার বাজারে খোলাখুলিভাবে Security ক্রয়-বিক্রয় করে।

আর একটি উপায় হইতেছে রাষ্ট্রের স্বীয় অর্থনৈতিক কার্য্যাবলীকে কৌশলে সজ্জিত করা। প্রত্যেক রাষ্ট্রকেই নিজের অস্তিত্ব সার্থক করিবার জন্য রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ, রেলওয়ে সেতু নির্ম্মাণ, Public utility Services, প্রভৃতি গড়িয়া তুলিতে হয়। ইহার জন্য রাষ্ট্রকে প্রচুর শ্রমিক নিয়োগ এবং অর্থব্যয় করিতে হয়। দেশে যখন বাণিজ্যস্ফীতির সূচনা দেখা দিবে, তখন রাষ্ট্র এই সমস্ত গঠন মূলক ও উৎপাদন সম্বন্ধীয় কার্য্য একেবারে ছাড়িয়া দিবে। আর বাজার মন্দার যুগে এই সমস্ত কার্য্যকে যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিবে। ব্যক্তিগত ব্যবসা স্বীয় কারণে কমিবে বা বাড়িবে। রাষ্ট্র যদি সেই হ্রাসবৃদ্ধির ঠিক বিপরীত দিকে কার্য্য করিতে পারে, তবে স্বাভাবিক হ্রাসবৃদ্ধির গুরুত্ব অনেক কমিয়া যাইবে। সাধারণ বাজারে যখন শ্রমিকের চাহিদা অত্যন্ত বেশী, রাষ্ট্র তখন নিজের সকল কার্য্য কমাইয়া শ্রমিকগণকে সাধারণ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবে। আর বাজার-মন্দার সময়ে যখন বেকার-সমস্যা প্রকট, রাষ্ট্র তখন রাস্তা-নির্ম্মাণ, সেতু-নির্ম্মাণ, পুষ্করিণী-খনন, প্রভৃতি কার্য্য ব্যাপকভাবে আরম্ভ করিয়া বেকার-সমস্যার উগ্রতা এবং দেশের দুর্দ্দশা অনেক খানি কমাইতে পারেন।

বাণিজ্যচক্রের প্রধান কারণ মানসিক; সেইজন্য কোন সরকারী নীতির সাহায্যে ইহাকে রোধ করা যায় না। ইহার উগ্রতা অনেক সময়ে কমানো যায় কিন্তু যোড়াতালি দিয়া আসল সংকটকে সাময়িকভাবে এড়াইয়া লাভ খুব বেশী হয় না। পৌনঃপুনিকভাবে বাণিজ্যচক্র সমাজকে আঘাত করে। বর্ত্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা অচল এবং জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থাকে টিকাইয়া

রাখিয়া সমস্যার স্থায়ী সমাধান অসম্ভব। বর্ত্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং সামাজিক কাঠামো শোষণের ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত, অবিশ্বাস ইহার মূলমন্ত্র। এই ব্যবস্থায় মানসিক ভীতিকেও রোধ করা যায় না; Speculative Optimism কেও সংযত করা যায় না। সমস্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা যদি ন্যায়ের ভিত্তিতে, সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, মানসিক দিক হইতে মূল সমাধানের চেষ্টা হয়, মুনাফা মনোবৃত্তির পরিবর্ত্তে সামাজিক কল্যাণকে ব্যবসার মাপকাঠি করা হয়, তবেই বাণিজ্যচক্রকে রোধ করা যাইবে। বাণিজ্যচক্রের স্থায়ী সমাধান হইতেছে—ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত করিয়া সাম্যের ভিত্তিতে সভ্যতা এবং সমাজকে গড়িয়া তোলা।

ভারতে যুদ্ধোত্তর বেকার-সমস্যা

বেকার-সমস্যা আমাদের দেশে চিরন্তন—কোন একটি বিশেষ সময়ের সমস্যা নহে। পরিবার-পিছু ৪ জন লোক—এই হিসাবে ৪০ কোটি লোকের জীবিকার্জ্জনের জন্য ১০ কোটি লোকের উপার্জ্জনশীল হওয়া প্রয়োজন। ১০ কোটি লোককে কার্য্য যোগাইতে পারে—এইরূপ উন্নত কৃষি, সম্প্রসারিত শিল্প ও সহানুভূতিশীল সরকার আমাদের নাই। কৃষিকার্য্যের মধ্যে যত লোকের সংস্থান হওয়া সম্ভব, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক কৃষির উপর নির্ভর করিতেছে। অতএব কৃষিকার্য্যে প্রচ্ছন্নভাবে বেকার-সমস্যা সর্ব্বদাই রহিয়াছে। ১০০ জন লোকের কাজ যদি ২০০ জন লোক করে, তাহা হইলে—'কেহ বেকার নাই বলিয়া' মানসিক পরিতৃপ্তি পাওয়া যাইতে পারে, আসলে কিন্তু বেকার-সমস্যা একই ভাবেই থাকিয়া যায়। এই ব্যাপক চিরকালীন বেকার-সমস্যার সহিত যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগ বা যুদ্ধোত্তর যুগের কোন বিশেষ সম্বন্ধ নাই। কোটি কোটি ভূমিহীন কৃষক কোন রকমে অর্দ্ধমৃত, অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় জীবন ধারণ করিতেছে

—সামান্য পরিবর্ত্তনের আঘাতেই মৃত্যুর কবলে পড়িতেছে। এই বেকার সমস্যার কারণ হইল—আমাদের অনগ্রসর কৃষি, অপ্রসারিত শিল্প, ভূমির উপর ক্রমবর্দ্ধমান জনসংখ্যার চাপ, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতির প্রতি নিদারুণ সরকারী ঔদাসীন্য। এই চিরন্তন সমস্যাটি বর্ত্তমানে আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু নহে। মহাযুদ্ধের ফলে দেশের এই স্থায়ী বেকার সমস্যার উপর একটি অতিরিক্ত সমস্যা আসিয়া জুটিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে অসংখ্য কৃষিজীবী এবং মধ্যবিত্ত যুদ্ধসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে তাহারা দলে দলে কার্য্যচ্যুত হইতেছে এবং দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর আর একটি বৃহৎ সমস্যা উপস্থিত করিতেছে। যুদ্ধোত্তর যুগের এই বিশেষ সমস্যাটি বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য।

দেশের সামনে সমস্যাটি যে কত বিপুল তাহা ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বেকার হওয়ার আশঙ্কা যাহাদের সম্মুখে, তাহাদের সংখ্যা যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগে শিল্পে নিযুক্ত সেই কর্ম্মীর সংখ্যার আড়াইগুণ। খুব কম করিয়া হিসাব লইয়া দেখা গিয়াছে অন্ততঃ পঞ্চাশ লক্ষ লোক কার্য্যচ্যুত হইয়া যাইবে। আগামী বৎসরের মধ্যে পঁচিশ হইতে ত্রিশ লক্ষ লোক সৈন্য বাহিনী হইতে ছাঁটাই হইবে। ইহার মধ্যে আছে সেনাবাহিনী কর্ত্তৃক দেশরক্ষার কার্য্যে নিযুক্ত লক্ষ লক্ষ অপটু মজুর। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারগুলির দপ্তর হইতে প্রায় দশ লক্ষ লোক ছাঁটাই হইবে। বিভিন্ন কারখানা হইতে দশ লক্ষ লোকের কাজ চলিয়া যাইবে—কারণ হিসাবে জানা যায় যে, শিল্পে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা যুদ্ধের সময়ে বিশ হইতে ত্রিশ লক্ষে উঠিয়াছিল। অসংগঠিত শিল্প হইতে যাইবে আরও পাঁচ লক্ষ লোক। মোট হিসাবে বেকার সংখ্যা দাঁড়াইল অর্দ্ধ কোটি। পরিবার পিছু ৪টি লোক, এই ন্যূনতম হিসাবেও, এই অর্দ্ধ কোটি লোকের কার্য্য গেলে ফল ভুগিবে আমাদের দেশের দুই কোটি লোক। পঞ্চাশ লক্ষ লোকের কার্য্য নাই—দুই কোটি লোকের জীবিকা নাই—যুদ্ধ শেষে ইহাই আমাদের ভবিষ্যৎ। প্রত্যক্ষভাবে যাহারা জড়িত হইবে, তাহাদের দুঃখদুর্দ্দশা এবং মধ্যবিত্ত ও

মজুর পরিবারের সর্ব্বনাশের কথা বাদ দিলেও সহায়-সম্বল-শূন্য, ক্রয়-শক্তিহীন এই বিপুল বেকার-বাহিনী দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক বনিয়াদকে বিপর্য্যস্ত করিবে। ইহার ফলে প্রতিটি শিল্পে মজুরী অনেক নীচে নামিয়া যাইবে। ভদ্রলোক কেরাণী ও কর্ম্মচারীদের মাহিনাও দুঃসহরূপে কমিবে। আর রোজকারী লোকমাত্রই আসন্ন সঙ্কটের জালে জড়াইয়া পড়িবে। অর্থাৎ অবিলম্বে এই নূতন বিপদকে ঠেকাইবার পন্থা গ্রহণ না করিলে অতি শীঘ্র আমাদের অসংখ্য দেশবাসীর আয় গুরুতরভাবে হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা দেখা দিয়াছে।

নিঃস্বতা ও বেকারের বিভীষিকা আজ প্রতিটি মধ্যবিত্ত ও মজুর পরিবারের সম্মুখে। ইহা দূর করিতে না পারিলে অবস্থার উন্নতির জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা অসম্ভব। প্রশ্ন হইতেছে—ছাঁটাই ব্যক্তিদিগকে কোথায় পুনর্নিয়োগ করা যাইবে? কৃষিকার্য্যে তাহাদের সংস্থান হওয়া সম্ভব নহে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, জমিতে যত লোকের সংস্থান হইতে পারে, তাহা অপেক্ষা ১,৫৫,০০,০০০ বেশী লোক ইতিমধ্যেই জমির উপর নির্ভরশীল। শিল্পের অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর। শিল্পের দিক দিয়া ভারতকে পশ্চাৎপদ রাখাই বরাবরকার বৃটিশনীতি। গত ত্রিশ বৎসরে শম্বূকগতিতে দু'চারিটি বৃহৎ কারখানা গড়িয়া উঠিলেও, আসলে শিল্পে নিযুক্ত মোট লোক সংখ্যা কমিয়াছে। ১৯১১ সালে মোট ১৭½ লক্ষ লোক শিল্পে নিযুক্ত ছিল, ১৯৪১ সালে ১৬ লক্ষ। শিল্প এবং কৃষির এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আমাদের পুনর্নিয়োগের উপায় আলোচনা করিতে হইবে।

যুদ্ধোত্তর যুগে বেকার সমস্যা শুধু যে ভারতেই দেখা দিবে তাহা নহে, সমস্ত পৃথিবীর বুকে ইহার আবির্ভাব সুনিশ্চিত। কিন্তু ভারতে সমস্যাটির গুরুত্ব অনেক বেশী। তাহার কারণ ইহা নহে যে সমস্যা সমাধানের পথে ভারতে কোন দুরতিক্রম্য বাধা বিদ্যমান। একমাত্র কারণ হইতেছে—যে-শিল্প-বিরোধী নীতি সরকার এতদিন অনুসরণ করিয়া আসিতেছে, আজিও তাহার অবসান হয় নাই। ভারতে গুরু শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রতি সাম্রাজ্যবাদ একেবারে

খড়্গহস্ত। কারণ উহার ফলে যন্ত্র ও অন্যান্য একান্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর জন্য ভারতকে আর বৃটিশ শিল্পের মুখাপেক্ষী থাকিতে হইবে না। যুদ্ধের ছয় বৎসরে ভারতে উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রচুর, কিন্তু কয়লা, লৌহ, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক সামগ্রী, জাহাজনির্ম্মাণ, প্রভৃতি মূল শিল্প সাম্রাজ্যবাদের বাধায় প্রসারিত হইল না। সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির মধ্যে একই সামগ্রীর পুনরাবৃত্তি ঘটানো অনুচিত,—এই মিথ্যা যুক্তি দিয়া ভারতকে যন্ত্র, এরোপ্লেন প্রভৃতি শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে দেওয়া হইল না। শিল্পে উৎপাদনের প্রসার যেটুকু ঘটিল, পূর্ব্ব হইতে যে যন্ত্রপাতি ছিল তাহা বারবার চালাইয়াই হইল।

যুদ্ধের সময়ে গুরু শিল্প প্রসারলাভ করিলে যুদ্ধের পর সেই সব যন্ত্রপাতিকে শান্তিকালীন শিল্পে রূপান্তরিত করিয়া বেকার সমস্যার সমাধান অনেক সহজ হইয়া পড়ে। যুদ্ধের সময়ে উৎপাদনযন্ত্র যুক্তরাষ্ট্রে শতকরা ৫০ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে, বোমাবিধ্বস্ত বৃটেনে শতকরা ২৫ ভাগ, আর ভারতে বাড়িয়াছে ১ ভাগ। অর্থাৎ আমাদের মজুরের কার্য্য যোগাইবার জন্য আমাদের আছে শুধু আগেকার যন্ত্রপাতি। ছাঁটাই লোকজনের জন্য তাই কোন কাজ নাই, কাজের ক্ষেত্র নাই। যে দেশে যন্ত্রপাতি বাড়িয়াছে, সেই দেশের তুলনায় তাই ভারতে সমস্যাটি এত অধিক গুরুত্বপূর্ণ। বৃটিশ সরকারের নীতি শুধু বেকারের বিভীষিকা সৃষ্টি করে নাই ; উহা দূর করিবার শক্তি হইতেও আমাদের বঞ্চিত করিয়াছে। মেরামত করা, যন্ত্রের অংশ জোড়া লাগানো,—প্রভৃতি কাজ আমাদের দেশে হইতেছিল। সাম্রাজ্যবাদীদের ঐসব কাজের আর প্রয়োজন নাই; অতএব কারখানাগুলিও উঠিয়া গেল। বিদেশী শাসকের প্রয়োজনের সামগ্রী ব্যতীত অন্য কিছু উৎপাদনের উপায় হইতে আমরা বঞ্চিত হইলাম। ১৯৪৫ সালের ৩১শে আগষ্টের Eastern Economist-এ সরকারী নীতির সমালোচনা করিয়া লেখা হয়—"আমাদের উপর ভার ছিল দুনিয়ার সব কিছু মেরামতের—সৃষ্টির নয়। আমাদের না ছিল নীতি, না ছিল পরিকল্পনা। শুধু একটি পরিকল্পনা

ছিল—অতি স্পষ্ট এবং সুষ্ঠ পরিকল্পনা—কি ভাবে যুদ্ধের পরে দেশের শিল্প-প্রতিষ্ঠায় বাধা দেওয়া যায়।"

বেকার সমস্যার দীর্ঘ মেয়াদী সমাধান হইতে পারে, আবার অল্প মেয়াদী সমাধানও হইতে পারে। দীর্ঘকালের সমাধানের জন্য প্রয়োজন—ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন, কৃষির বৈপ্লবিক পরিবর্তন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য যানবাহনের স্থায়ী উন্নতি, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কথা আমরা বলিব না, বলিয়া লাভ নাই। তাহা সময়-সাপেক্ষ, ব্যবস্থা-সাপেক্ষ। সরকার তৎপর হইলে কার্য্যোপযোগী সুচিন্তিত প্ল্যান করা মোটেই কঠিন নহে। কিন্তু তৎপূর্ব্বে এই মুহূর্ত্তেই প্রয়োজন পঞ্চাশ লক্ষ মানুষের কাজ। অর্দ্ধকোটির পুনর্নিয়োগের সমস্যাই হইল এদেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়িবার—সমস্ত পরিকল্পনা যাচাই করিবার কষ্টি-পাথর।

পঞ্চাশ লক্ষ লোককে কার্য্য যোগাইবার জন্য প্রয়োজন—যুদ্ধের সময়ে যে কর্ত্তব্যে আমরা অবহেলা করিয়াছি—তাহা সম্পন্ন করা। নূতন যন্ত্র বসাইতে হইবে, নূতন কারখানা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। আর যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান যুদ্ধের সময়ে গড়িয়া উঠিয়াছে, সেইগুলিকে শান্তির সময়োপযোগী করিয়া স্থায়ী করিতে হইবে। যুদ্ধের সময় যে সব ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার উদ্ভব হইয়াছে তাহার অধিকাংশ, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, এবং বন্দুক গোলাগুলি প্রস্তুতের জন্য কারখানা—ইহাদের সামান্য পরিবর্ত্তন করিলে বা কিছু যন্ত্রপাতি যোগাইলে শান্তির সময়ে কাজে লাগানো যায়,—শেলাইকল, ছোটখাট কলকব্জা, প্রভৃতি অনায়াসে উৎপন্ন করা যায়। মেরামতী কারখানার কতকগুলিকে কিছু যন্ত্রপাতি যোগাইয়া উৎপাদনের কারখানায় পরিণত করা যায়, আর কতকগুলিকে মেরামতী হিসাবেই স্থায়ী করা যায়। রেলওয়ে হইতেও মজুর ছাঁটাইএর প্রয়োজন নাই। ভারতের দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাইতে হইলে উন্নত যানবাহন ব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণ অংশ গ্রহণ করিবে। যুদ্ধের সময়ে রেলের লাইন, ইঞ্জিন এবং গাড়ীগুলিকে অত্যন্ত বেশী ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রয়োজনীয় মেরামত

হয় নাই ; Depreciation দ্রুত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেই সব অতি প্রয়োজনীয় মেরামত কার্য্যগুলি করা, ষ্টেশনগুলি আধুনিক করা, ক্ষয়প্রাপ্ত লাইনগুলিকে নূতন করা এবং লাইন বসানো—ইত্যাদি কার্য্যের কথা মনে রাখিলে বুঝা যায় যে, রেলওয়ে হইতে লোক ছাঁটাইএর বাস্তব প্রয়োজন কিছু নাই।

বর্ত্তমান প্রতিষ্ঠানগুলিকে কার্য্যে লাগাইবার জন্য এবং নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথম প্রয়োজন নিম্নলিখিত বিশেষ ধরণের উৎপাদন যন্ত্র আমদানী করা। (১) বর্ত্তমানে কয়লার অভাবে শিল্পের অসুবিধা হয় ; কয়লা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কয়লা তোলার যন্ত্রপাতি আনিতে হইবে। জার্ম্মাণী হইতে ইহা আনা সম্ভব, আমেরিকা হইতেও সম্ভব। (২) রেলগাড়ী, কয়লার আনুসঙ্গিক শিল্পের পক্ষে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য রেলওয়ে ওয়ার্কশপ ও বর্ত্তমান কারখানাগুলির পরিবর্ত্তন সাধনের জন্য অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি। (৩) মোটর গাড়ী, লরী, এরোপ্লেন, জাহাজ বানাইবার মত এবং যন্ত্রোৎপাদন ও লৌহ ও ইস্পাত শিল্প প্রসারের জন্য ভারী মূল যন্ত্রপাতি। (৪) মূল রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদন ও পুরাতন কাপড়-কলের যন্ত্রপাতি প্রভৃতির স্থানে নূতন আধুনিক যন্ত্রপাতি।

এই সমস্তগুলিই আশু সমাধানের একমাত্র পথ। তবু এইগুলি করিতেও খানিক সময় লাগিয়া যাইবে। এইটুকু সময়ের জন্যও পঞ্চাশ লক্ষ লোককে বেকার করা চলিবে না। তাই এখনই প্রয়োজন পঞ্চাশ লক্ষ ছাঁটাই সৈন্য, শ্রমিক ও কেরাণীর জন্য নূতন কাজ। একমাত্র উপায় হইতেছে গভর্ণমেণ্টকে দরাজহস্তে রাষ্ট্রের তহবিল হইতে খরচ করিতে হইবে। যুদ্ধের জন্য সরকারী ব্যয়ের ফলেই অধিকসংখ্যক লোক কাজ পাইয়াছিল। ১৯৩৮-৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয় ছিল ৮৫ কোটি টাকা, ১৯৪৫-৪৬ সালে ইহা হইয়াছে ৫০৬ কোটি। প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যয় ১৭০ কোটি হইতে ১২০০ কোটিতে উঠিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে ধ্বংস কার্য্যের জন্য যদি রাষ্ট্রের আয়-ব্যয় এই অভাবনীয়ভাবে বৃদ্ধি পাইতে পারে, শান্তির সময়ে পুনর্গঠন ও আত্মোন্নতির

কার্য্যে সরকারী তহবিল হইতে এই পরিমাণ অর্থ ব্যয় না করিবার কোন কারণ নাই। যুদ্ধের সময়ে যাহারা সরকারকে কাজ দিয়াছে, যুদ্ধের পরে তাহাদের কাজ যোগানো সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। আর এইরূপ কাজের পথও অফুরন্ত। এমন সব গঠনমূলক প্রচেষ্টা আমাদের করিতে হইবে, যাহা ভবিষ্যতে মহান্ জাতীয় সম্পদে পরিণত হইতে পারে। বেশী চিন্তা না করিয়াও বলা যায়—গৃহনির্ম্মাণ, পথঘাট নির্ম্মাণ, রেলপথ বিস্তার, এবং যুদ্ধ কারখানাগুলিকে শান্তিকালীন উৎপাদন কার্য্যে রূপান্তরিত করা—এই সমস্ত কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করা যায়।

ভারতবর্ষে শিল্পমজুরদের জঘন্য বস্তি ও সাধারণ বাসস্থানের অভাবের কথা মনে রাখিলে গৃহনির্ম্মাণের প্রয়োজন স্পষ্ট বুঝা যায়। মধ্যবিত্তের জন্য সস্তা স্বাস্থ্যকর বাসস্থানের আবশ্যকতা আছে। গ্রাম, সহর এবং বস্তীগুলিতে গৃহনির্ম্মাণ কার্য্য অবিলম্বে আরম্ভ করিতে হইবে; ইহার জন্য বিদেশের যন্ত্রপাতির উপর খুব নির্ভর করিতে হইবে না। রাস্তা ও রেলপথ বিস্তারের জন্য সাজ সরঞ্জাম আমদানীর বিশেষ প্রয়োজন নাই। হিসাবে জানা যায় যে, রাস্তা ও রেলপথ উভয় ক্ষেত্রেই সমগ্র খরচের শতকরা ৫½ ভাগের জন্য মালমশলা বা সরঞ্জামের আমদানীর প্রশ্ন উঠে। যুদ্ধ কারখানাগুলির পুনর্গঠনের জন্য যেটুকু যন্ত্রপাতি আবশ্যক তাহা যুক্তরাষ্ট্রের বাড়তি সরঞ্জাম হইতে ক্রয় করা সম্ভব। সরকার যদি বাধা না দেয়, যুক্তরাষ্ট্রও ইহাতে সম্মত আছে। সরকারের বাধা ঠেলিয়া ইহা ক্রয় করিতে হইবে।

পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে চারিটি ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। (১) বৃটেন হইতে উৎপাদন-যন্ত্র আমদানী করার জন্য গভর্ণমেণ্টকে উহার পুরাপুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে বাধ্য করা; (২) ঐ উদ্দেশ্যে ১৫০ কোটি পাউণ্ড পরিমাণের যে ষ্টার্লিং আমাদের নামে জমা আছে, তাহা ব্যবহার করা; (৩) আমেরিকা হইতে উৎপাদন-যন্ত্র ক্রয়ের জন্য অবিলম্বে ভারতের অর্জ্জিত ডলার পুঁজি ছাড়িয়া দেওয়া; (৪) ভারতের আমদানী নীতির অবিলম্বে

এইরূপ নিয়ন্ত্রণ করা যাহাতে যুদ্ধের সময়ে যে সব ভারতীয় শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে সেগুলি রক্ষা পায়।

এই সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য টাকা কোথা হইতে পাওয়া যাইবে —এই প্রশ্ন তোলা হইয়া থাকে। সরকার যদি তাঁহাদের চিরন্তন জড়তা একটু খানি কাটাইয়া উঠেন, তাহা হইলে পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য টাকার অভাব হইবে না। বিদেশ হইতে শুধু যন্ত্রপাতি নয়, দক্ষ কর্ম্মী এবং পরিকল্পনাকারী ইঞ্জিনিয়ার আনিবার মত পর্য্যাপ্ত ষ্টার্লিং ব্যালান্স এবং ডলার পুঁজি আমাদের আছে। দেশের মধ্যেও টাকা উঠিবে, যদি যুদ্ধকালীন ব্যবস্থাগুলিকে বজায় রাখা যায়। টাকা তুলিবার জন্য দরিদ্র জনসাধারণের উপর কর বসাইবার প্রয়োজন নাই। গত বৎসরের বাজেটে ধনীদিগের উপর হইতে অতিরিক্ত মুনাফা কর উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে। ধনীদিগের এই সুবিধা করিয়া দিবার কোন প্রয়োজন নাই। সরকারের তহবিলে অতিরিক্ত মুনাফা কর ও আয়কর ফেরত দিবার জন্য সঞ্চিত আছে ১৫০ কোটি টাকা। জনসাধারণকে শোষণ করিয়া যে মুনাফা, তাহা শিল্পপতিগণকে ফেরত দিবার কোন প্রয়োজন নাই। রেলওয়ে ও ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলির Depreciation (ক্ষয়-ক্ষতির জন্য জমানো টাকা) ও Reserve fund কমপক্ষে ১৫০ কোটি টাকা। ইহা দ্বারা কলকব্জা ক্রয় করা, মেরামত কার্য্য চালানো অনায়াসে হইতে পারে। ইহা ছাড়া চোরাকারবারীদের হস্তে কোটি কোটি টাকা লুকানো আছে; এই টাকা বাহির করিতে হইবে ও দেশের উন্নতির কাজে নিয়োগ করিতে হইবে। সাধারণের সঞ্চয় ভারতের মত দরিদ্র দেশে খুব কম। তবু ইহা হইতে বৎসরে ৮ কোটির মত টাকা কাজে লাগানো যাইতে পারে।

পরিশেষে বলা প্রয়োজন, অসুবিধা ভারতের ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশী। এতদিনের সরকারী নীতি তাহার জন্য দায়ী। কিন্তু উদ্যম লইয়া

অগ্রসর হইলে, দুরতিক্রম্য বাধা কিছুই নাই। যন্ত্রপাতি ক্রয় করিবার টাকা এবং বিক্রয় করিবার দেশের অভাব হইবে না; মজুরের অভাব, কারিগরের অভাব, ইঞ্জিনিয়ারের অভাব দূর করা যাইবে। উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিবার বাজারের অভাব হইবে না। অফুরন্ত কাজের ক্ষেত্র, অসীম পণ্যের চাহিদা, একমাত্র প্রয়োজন—সক্রিয় উদ্যম।

ধনতন্ত্রবাদ

ধনিকতন্ত্রের কথা চিন্তা করিলেই আমাদের মনে কতকগুলি সমস্যা আসিয়া দেখা দেয়—ধনী-দরিদ্রের উৎকট বৈষম্য, বাণিজ্যচক্র, অর্থ সঙ্কট, বেকার সমস্যা এবং যুদ্ধ। প্রত্যেকটি সমস্যাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার সহিত অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। নানা উপায়ে সমস্যাগুলির গুরুত্ব কিছু পরিমাণে লাঘব করা যাইতে পারে, কিন্তু তাহাদের সমাধান বর্ত্তমান উৎপাদন-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তন ভিন্ন সম্ভব নহে। এই উৎপাদন-ব্যবস্থা বলিতে আমরা কি বুঝি? ইহার সংজ্ঞা কি? প্রকৃতি কি? ইতিহাস কি? ভবিষ্যৎ কি? এক কথায় ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার স্বরূপ বিশ্লেষণই আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

ব্যক্তিগত স্বত্ব বা মালিকানা ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধান নিদর্শন। উৎপাদনের যাবতীয় যন্ত্র, উপাদান ও কল-কারখানার মালিক কয়েকজন ব্যক্তি, তাহাদের কর্ত্তৃত্বে এবং ইচ্ছাধীনে সেইগুলি পরিচালিত। তাহাদের চরম এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা। ব্যক্তিগত সম্পত্তি, ব্যক্তিগত মুনাফা—ইহাই হইল ধনতন্ত্রের মূলভিত্তি। উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন জমি, খনি,

যন্ত্রশিল্প, কারখানা, ও ব্যবসাবাণিজ্য; বর্ত্তমানে এই সবগুলিরই মালিক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি। তাহারা কৃষিকার্য্যের জন্য জমি ভাড়া দেয়, শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলে, খনি হইতে সম্পদ আহরণ করে, ব্যবসা-বাণিজ্য চালায়—সর্ব্বত্রই, উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত মুনাফা। কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিয়ন্ত্রিত করে না। কোনো শিল্প বা ব্যবসায়ে যদি মুনাফা না হয়, কেহ হিসাব করিবে না, তাহা সামাজিক প্রয়োজনে অথবা কল্যাণে লাগিতেছে কিনা; তাহা উঠিয়া যাইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফাহীন ব্যবসায়ের টিকিয়া থাকার সাধ্য নাই।

এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা অকস্মাৎ একদিনে পৃথিবীতে আসে নাই। শত শত বৎসরের আবর্ত্তন-বিবর্ত্তন ক্রমোন্নতির মধ্য দিয়াই মানবসমাজ এই ব্যবস্থাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। এমন এক সময় ছিল যখন কারখানা ছিল না, যন্ত্রশিল্প ছিল না, মুনাফা-মনোবৃত্তিও ছিল না। জমির মালিকদের হাতে দেশের শাসনভার ছিল। কিন্তু সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই প্রথা ধ্বংস হইতে থাকে এবং ধনতন্ত্র তাহার স্থান অধিকার করে। জমির কর্তৃত্ব নষ্ট হইয়া গেল, কারখানার মালিকেরাই সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামীরা দাস, ক্রীতদাস এবং কর্ষণকারীদের শোষণ করিতেন। ধনতন্ত্রের বাহক ধনপতিরা তাহাদের এই শোষণ-ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া যন্ত্রশিল্পের সাহায্যে শ্রমিকদিগকে নূতনভাবে শোষণ করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেন। জমি হইতে উৎখাত করিয়া আনাইয়া ক্রীতদাসদিগকে তাঁহারা কারখানার কাজে নিযুক্ত করিলেন; জমিহীন সহায়-সম্বলহীন কৃষকদিগকে যতদূর সম্ভব অল্প বেতন দিয়া, তাহাদের শ্রমজাত দ্রব্য উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রয় করিয়া বিরাট মুনাফা করিতে লাগিলেন। ছোটো বড়ো বহু ধনিক আসিয়া জুটিলেন। হাজারে হাজারে নূতন কল-কারখানা গড়িয়া উঠিল; পুরাতন কারখানাগুলির শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল; ধনতন্ত্র কায়েম হইল।

বর্ত্তমান যুগে সভ্যতার বনিয়াদ হইতেছে এই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন, এই

যন্ত্রশিল্প, খনি এবং কারখানা। পূর্ব্বে যেখানে ১০০০টি বিচ্ছিন্ন চরকায়, ১০০০ জনের পরিশ্রমে ১০০০টি বস্ত্র উৎপন্ন হইত, এখন সেখানে একটি কাপড়ের কলে ১০ জনের পরিশ্রমে অল্প সময়ে অধিক বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে। মুনাফার লোভে ধনপতিগণ বিরাট বিরাট শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিয়াছেন, সমাজের মোট উৎপাদন অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পাইতেছে, সমাজ অধিক সম্পদশালী হইতেছে, মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন এবং বিলাস মিটিতেছে। অল্প শ্রমে অধিক উৎপাদন হওয়ায় সময় এবং শ্রমের অপচয় নিবারণ হইতেছে; যে সমস্ত দ্রব্য পূর্ব্বে উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ছিল না, সেইগুলি অনায়াসে বিশাল পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে; যাহারা ভূস্বামীর অধীনতা-পাশে আজীবন আবদ্ধ থাকিয়া কৃষিকার্য্য করিত, তাহারা স্বাধীনভাবে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিতেছে; মানবসমাজের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইয়াছে, স্বাচ্ছন্দ্যবিলাস, প্রাচুর্য্য চারিদিকে দেখা যাইতেছে। বর্ত্তমানে আমরা সকালে উঠিয়া ফ্রান্স বা আমেরিকায় তৈয়ারী Tooth paste-এর দ্বারা দন্ত পরিষ্কার করি, আসামে প্রস্তুত চা পান করি, নরওয়ের কাগজে কলিকাতায় মুদ্রিত সংবাদপত্র পাঠ করি, বৃটেনের পুস্তক ও জার্ম্মানীর যন্ত্রপাতি লইয়া বিজ্ঞানের আরাধনা করি, বৈদ্যুতিক পাখার তলায় বসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করি, রেলগাড়ীতে চড়িয়া গৃহ হইতে কর্ম্মস্থলে গমন করি, বৈকালে সিনেমায় যাই, রেডিও শুনি—সমস্তই ধনতন্ত্রের কল্যাণে। ধনতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থাই আধুনিক সভ্যতার জনক।

ধনতন্ত্রের সংজ্ঞা, ও ব্যাখ্যা এবং ইহার কতকগুলি অবদানের কথা বলিয়াছি, এইবার ইহার কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণের কথা বলা প্রয়োজন। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় একদিকে থাকে অল্প কয়েকজন বিত্তশালী শিল্পপতি, যাহাদের কর্তৃত্বে এবং অধীনে উৎপাদন পরিচালিত হয়; অপরদিকে থাকে বিশাল-সংখ্যক দরিদ্র শ্রমিক, শ্রমশক্তি ছাড়া তাহাদের আর কোনো সম্বল নাই; শ্রমের পরিবর্ত্তে তাহারা পায় মাত্র জীবনধারণোপযোগী ন্যূনতম বেতন, শিল্প-সমৃদ্ধি তাহারাই আনয়ন করে কিন্তু সমৃদ্ধির অংশ কিছু পায় না। তাহারা উপযুক্ত

খাদ্যবস্ত্র, আশ্রয়, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হইতে চিরদিন বঞ্চিত; তাহারা সভ্যতার ধারক, বাহক এবং স্রষ্টা, কিন্তু অংশীদার নহে। বিত্তশালী ও বিত্তহীন; ধনিক ও শ্রমিকের মধ্যে এই বিশাল ব্যবধানই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রথম বৈশিষ্ট্য।

দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত মুনাফা হইতেছে উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রধানতম চালকশক্তি। মুনাফার সম্ভাবনা না থাকিলে কোন খনি খনন করা হয় না, শিল্প গড়িয়া উঠে না, ব্যবসায় সুরু করা হয় না। সামাজিক কল্যাণের দিক হইতে কোন শিল্প যদি অত্যন্ত হানিকর হয়, কিন্তু মুনাফার সম্ভাবনা যদি তাহাতে থাকে, তবে সেই শিল্প সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া পূর্ণোদ্যমে চলিতে থাকিবে। গাঁজা, আফিম, প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের ব্যবসা এইজন্যই সকল দেশেই প্রচলিত আছে। কোন ব্যবসা সমাজের পক্ষে যত কল্যাণকর হউক না কেন, মুনাফা যদি ইহা হইতে আসা বন্ধ হয়, তবে তাহা উঠিয়া যাইবে। মুনাফা-লোভী পুঁজিপতিরা কোন শ্রম করে না, তাহারা শিল্পের সমস্ত মুনাফা গ্রহণ করে, মুনাফা না হইলে প্রতিষ্ঠান উঠাইয়া দেয় এবং লক্ষ লক্ষ শ্রমজীবীর জীবন লইয়া ছিনিমিনি খেলে।

তৃতীয়তঃ, সমাজের সমস্ত সম্পদ্ পুঞ্জীভূত হইয়া কতকগুলি পুঁজিপতির হাতের মধ্যে থাকে; একদিকে সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত সমাজ, আর অপর পার্শ্বে বিশাল, শোষিত শ্রমিক সম্প্রদায়। ধনপতিরা বুদ্ধিজীবীদিগকে নিযুক্ত করিয়া খবরের কাগজ, রেডিও, সিনেমা, শিক্ষায়তনের উপর কর্ত্তৃত্ব করে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সাহায্যেই দেশের জনমত গড়িয়া উঠে। অতএব জনমতকে স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে রাখার উপায় তাহাদের হাতে থাকে। এইজন্যই রাষ্ট্র পরিচালন-ব্যবস্থাও তাহাদের আয়ত্বাধীন। শুনিতে আশ্চর্য্য লাগিতে পারে, কিন্তু ইহাই সত্য কথা। স্বৈরতান্ত্রিক দেশে পুঁজিপতিগণ সরাসরি দেশের শাসন-ব্যবস্থা ইচ্ছানুরূপ পরিচালনা করেন। আর গণতান্ত্রিক দেশে রাষ্ট্র জনমতের দ্বারা পরিচালিত হয়, খবরের কাগজ জনমত গঠন

করে, খবরের কাগজ থাকে পুঁজিপতিদের অধীনে। অতএব রাষ্ট্র থাকে পুঁজিপতিদের আয়ত্বে।

শুধু রাষ্ট্র নহে। সমস্ত সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা, নিয়ম-প্রণালী, আচার-ব্যবহার, এমন কি কৃষ্টি-সংস্কৃতি পর্য্যন্ত গড়িয়া ওঠে, পুঁজিপতিদের স্বার্থের অনুকূলে। পুঁজিপতিরা হইয়া পড়েন সমাজপতি। একটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। সামন্ততন্ত্রে ভূস্বামীগণ ক্রীতদাসদিগকে বাধ্যতা-মূলকভাবে কার্য্যে নিয়োগ করিত। ধনতন্ত্রে শ্রমিক স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের সুযোগ পাইল। ইহার কারণ, ভূস্বামীর কার্য্য হইতে শ্রমিকদিগকে ছাড়াইয়া না আনিলে, নব প্রতিষ্ঠিত শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কার্য্য করিবার লোক পাওয়া যাইত না; ছাড়াইয়া আনিবার ব্যাপারে "স্বাধীন শ্রমিকের" ধ্বনি খুব ফলপ্রসূ হইল। স্বাধীন শ্রমিকের আদর্শ একদিকে শ্রমিকের নিকট চিত্তাকর্ষক, অপরদিকে বণিকের নিকট লাভজনক। বিলাতের Parliamentএ House of Lords ভূস্বামী দ্বারা প্রভাবান্বিত, House of Commons শিল্পপতি দ্বারা প্রভাবান্বিত। House of Commons যে ধীরে ধীরে House of Lordsএ অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছে, তাহা পুঁজিতন্ত্রের জয়ের পরিচায়ক।

আর একটি লক্ষণ হইতেছে, পুঁজিতন্ত্রের বিকাশ এবং পরিবর্দ্ধনের সহিত শ্রমিকশ্রেণীর উপর শোষণ উগ্র হইতে উগ্রতর হইতে থাকে, সংখ্যায় কম শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, বেকার শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, নিযুক্ত শ্রমিকের বিরুদ্ধে বেকার শ্রমিককে ব্যবহার করিয়া মালিক সকলের বেতন কমাইয়া দেয়। অপরদিকে ধনিকের হাতে পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, বৃহৎ ব্যবসায়ীরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদিগকে প্রতিযোগিতা বলে ব্যবসায়ক্ষেত্র হইতে হঠাইয়া দেয়, সর্ব্বহারা শ্রমিক এবং সম্বলহীন মধ্যবিত্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, ধনীর সংখ্যা কম এবং টাকার পরিমাণ বেশী হয়। একচেটিয়া ব্যবসায় বৃদ্ধি পায়, শোষণ বৃদ্ধি পায়, মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

ধনতন্ত্রের এই সকল বিশিষ্টতা হইতেই ইহার কতকগুলি দুর্ব্বলতা জন্মায়। ধনীদরিদ্রের বৈষম্য সমাজকে কৃত্রিম ভাগে ভাগ করিয়া দেয়। শ্রেণীবৈষম্য একেই অত্যন্ত ক্ষতিকর; তাহা ছাড়া ইহা হইতে কতকগুলি বিশেষ কুফল দেখা দেয়। আলস্য, অপচয়, অমিতব্যয়িতা, মানসিক অধঃপতন—ইহাদের মূল কারণ ধনবৈষম্য। ধনবৈষম্য হইতে জন্মায় হিংসা, দ্বেষ, ভয়, লোভ, পরশ্রীকাতরতা। সমাজে খ্যাতি, পদমর্য্যাদা নির্দ্ধারিত হয় অর্থদ্বারা—একজন লোক ধনী হয়, গণ্যমান্য হয়, তাহার নিজের কোন দক্ষতা বা কৃতিত্বের জন্য নহে, হয়তো তাহার পিতার কোন লাভজনক ব্যবসায়ের জন্য, তাহার ভূমিতে কোন আকস্মিক খনি আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য অথবা কোন যুদ্ধজনিত বাণিজ্য-স্ফীতির জন্য। যে অর্থ বিনাক্লেশে অর্জ্জিত হয়, তাহা ব্যয় হয় বিনা চিন্তায়। নানারকম ক্ষতিকর বিলাসে যে প্রভূত অর্থ অপব্যয় হয় তাহার কারণ ধনীরা নিজেরা শ্রম করে না; কিন্তু সমাজের উপর পরগাছার মত ভোগবিলাসে অপচয় করে। বাস্তব অপচয়ের চেয়ে মারাত্মক ক্ষতি হয় এই যে, এই পরগাছার জীবনই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলের কাম্য হইয়া উঠে। সকলেই চায় বিনাশ্রমে ভোগবিলাসে জীবন ধারণ করিতে। সমাজের চরম মানসিক অধঃপতন এইখানেই।

তাহা ছাড়া উৎপাদন ঠিক সামাজিক প্রয়োজনমত চলে না। যে দ্রব্যের টাকার হিসাবে চাহিদা বেশী, তাহা উৎপন্ন হইবে। অপেক্ষাকৃত অধিক প্রয়োজনীয় অথচ টাকার হিসাবে কম চাহিদা—এইরূপ দ্রব্য উৎপন্ন হয় না। বিলাসের দ্রব্যের জন্য ধনীদিগের চাহিদা আছে; প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য দরিদ্রের অভাব আছে। কিন্তু অর্থের অভাবে সেই অভাব চাহিদা হইতে পারে না। তাই বিলাসের জিনিষ উৎপাদনের জন্য উৎপাদনশক্তি নিযুক্ত হয়; কিন্তু প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের জন্য হয় না। উৎপাদনের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় বিলাস প্রয়োজনকে দূরে সরাইয়া দেয়। ইহার উপরে, অনেক সম্ভাব্য উৎপাদন নষ্ট হইয়া যায়। অনেক উৎপাদনের শক্তি অলস অকেজো

হইয়া পড়িয়া থাকে। হয়তো কোন স্থানে একটি লৌহখনি আছে—তাহাকে কার্য্যকরী করিলে দেশের লৌহ-সম্পদ্ বৃদ্ধি পায়—দেশের চাহিদা মিটিতে পারে—কিন্তু আশু মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া সেই খনিতে পুঁজি নিযুক্ত হয় হয় না। এইরূপ ঘটনা প্রায়ই দেখা যায়—হাজার হাজার শ্রমিক বেকার রহিয়াছে। অথচ মানুষের পরিধানের বস্ত্র নাই, বাসের গৃহ নাই। তাহারা বেকার না থাকিয়া বস্ত্র অথবা গৃহ প্রস্তুত করিতে পারিত; জনগণের অভাব তাহা হইলে মিটিত। কিন্তু মুনাফার সম্ভাবনা নাই বলিয়া উৎপাদন কার্য্যে তাহাদের নিয়োগ করা হয় না। মানুষের অভাব থাকিয়া যায়, অভাব মিটাইবার শক্তি থাকে, কিন্তু সেই শক্তি কার্য্যকরী হয় না—কারণ তাহাতে মুনাফা নাই; ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফা না থাকিলে উৎপাদন অসম্ভব। আবার এইরূপ ঘটনাও আমরা দেখিয়াছি—যে লক্ষ লক্ষ মণ তুলা, গম বা হাজার হাজার মোটর গাড়ী নষ্ট করিয়া ফেলা হইতেছে। পথে পথে যখন নিরাশ্রয় জনতা রৌদ্র জল ঝড় রাত্রি অন্ধকারে দিন কাটাইতেছে ঠিক তখন হাজার হাজার তালা-বন্ধ গৃহে বড় বড় অক্ষরে "To let" ঝুলানো রহিয়াছে। একদিকে প্রচুর অভাব, অন্যদিকে ততোধিক অপচয়—ইহাই ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার অনিবার্য্য ফল। অধিক গম বা বস্ত্র বাজারে আসিলে মূল্য কমিয়া যাইবে, মুনাফা কমিয়া যাইবে। অতএব সেগুলি নষ্ট করিয়া কৃত্রিমভাবে যোগান কমাইয়া মূল্য উচ্চ রাখিয়া অধিক মুনাফা করা হয়।

বাণিজ্য-চক্রের কথা আমরা পড়িয়াছি—তাহাও ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থারই ফল। লাভের আশায় নূতন নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠে; বাণিজ্য-স্ফীতি দেখা দেয়। আবার লোকসানের আশঙ্কায় ব্যবসা-বাণিজ্য উঠিতে থাকে, বাজার-মন্দা দেখা দেয়, বেকার-সমস্যা বৃদ্ধি পায়। জনসাধারণের প্রয়োজন অথবা সামাজিক কল্যাণ যদি উৎপাদনের মূল লক্ষ্য হইত, তাহা হইলে এইরূপ হইত না। আবার ব্যবসা-বাণিজ্য বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ধনপতির কর্তৃত্বে না থাকিয়া কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে থাকিলে বাণিজ্য-

চক্রকে রুদ্ধ করা যাইত অনেক সহজে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেন্দ্রীভূত প্রচেষ্টা সম্ভব নহে। পৌনঃপুনিক বাণিজ্য-সঙ্কট, বেকার-সমস্যা, দুঃখ অভাব, বিপর্য্যয়ের মূলে রহিয়াছে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা।

মুনাফা মনোবৃত্তিই আবার সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধে পরিণত হয়। একটি দেশের শিল্পপতিগণ সেই দেশের শ্রমিক ও জনসাধারণকে শোষণ করিয়া পরিতৃপ্ত হয় না, তাহাদের শোষণকে তাহারা আরও ব্যাপক করিতে প্রয়াস পায়, মুনাফা আরও বৃদ্ধি করিতে চায়। এই কারণে বিদেশের বাজার দখল করা তাহাদের নিকট প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়ায়। বাজার দখল করার জন্য, সেই দেশের উপর রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব প্রয়োজন। অতএব যুদ্ধ করিয়া সেই দেশের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব নিজ হস্তে আনয়ন করিতে হয়। রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব হস্তে লইয়া বাজার দখল করা হয়। সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় করা হয়, এবং উচ্চমূল্যে শিল্পজাত দ্রব্য বিক্রয় করা হয়; জনসাধারণের উপর শোষণ কায়েম হয়। সাম্রাজ্যবাদ চাপিয়া বসে। অপর দিকে নূতন নূতন শক্তিশালী জাতি বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাহারা শিল্প-ব্যবসা-বাণিজ্যকে উন্নত করিয়াছে, যাহারা বিদেশে শোষণ প্রতিষ্ঠা করিতে চায়। কিন্তু পৃথিবী বৃহৎ হইলেও অসীম নয়; শোষণের নূতন ক্ষেত্র তাহারা পায় না। অতএব পুরাতন সাম্রাজ্যবাদীর নিকট হইতে যুদ্ধ করিয়া উপনিবেশ কাড়িয়া লইতে তাহারা অগ্রসর হয়। ফলে হয় যুদ্ধ। এক কথায় সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ধনতন্ত্রবাদেরই শেষ স্তর।

নিদারুণ অর্থনৈতিক সঙ্কট—একশ্রেণী কর্ত্তৃক অপর শ্রেণীর শোষণ—পুঁজিপতির স্বার্থে রাষ্ট্রের পরিচালনা—সামাজিক শক্তি এবং ঐশ্বর্য্যের অনিষ্টকর অপচয়—বাণিজ্য-চক্র, বেকার সমস্যা—অভাব-দুঃখ, দারিদ্র্য, অনশন—এক দেশ কর্ত্তৃক অপর দেশ শোষণ এবং শাসন—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ—এবং চরম মানসিক অধঃপতন—এই ধনতান্ত্রিক শিল্প-ব্যবস্থারই পরিণতি—উনবিংশ শতাব্দীতে যে ব্যবস্থা সভ্যতার বনিয়াদ্ গড়িয়াছিল। মূল কথা হইতেছে গতি-

শীল পৃথিবীতে কোন একটি ব্যবস্থা চিরকালের জন্য কল্যাণকর থাকিতে পারে না। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ব্যবস্থা কার্য্যকরী এবং ফলপ্রসূ হয়। প্রয়োজনীয়তা ফুরাইয়া গেলেও কোন একটি ব্যবস্থাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিলে ইহার কুফল আমাদের ভোগ করিতেই হইবে। ধনতন্ত্রের মধ্যেই পৃথিবীর চূড়ান্ত অগ্রগতি হইয়াছে—এই ধারণা ভ্রান্ত। গতিশীল পৃথিবীতে চূড়ান্ত কোন কিছু আজিও হয় নাই। ধনতন্ত্রও তাহার প্রয়োজনীয়তার যুগ কাটাইয়া আসিয়াছে। এখন অন্য কোন সময়োপযোগী ব্যবস্থা খুঁজিয়া না লইলে পৃথিবীর অগ্রগতি সম্ভব নহে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার দুর্ব্বলতা যাহা, কুফল যাহা, ক্ষতিকর যাহা, তাহা হইতেই নূতন ব্যবস্থার সন্ধান পাওয়া যাইবে।

ভারতের খনিজ ও তাহার সম্ভাবনা

যে কোন দেশের শিল্পের সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে তাহার ভূগর্ভস্থিত সম্পদের উপর। ভূমির উর্ব্বরতা, জনগণের শ্রমশক্তি ও কর্ম্মনৈপুণ্য, মালিকের মূলধন, শিল্পপতিদের পরিকল্পনা—শিল্পের সমৃদ্ধির জন্য এই সমস্তই প্রয়োজন। একথাও সত্য যে, কোন রকম খনিজ সম্পদ না থাকিলেও উন্নত যানবাহনের সাহায্যে বিদেশ হইতে সব কিছু আমদানী করিয়া উচ্চধরণের শিল্প গড়িয়া তোলা অসম্ভব নয়। কিন্তু এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল। প্রয়োজনীয় খনিজ-সম্পদের প্রাচুর্য্য শিল্পের প্রসারকে অনেক সহজ করিয়া দেয় এবং শিল্পের সমৃদ্ধি হইলেই খনিজ-সম্পদের সর্ব্বাপেক্ষা সদ্ব্যবহার পাওয়া যায়।

অধিকাংশ সময়েই আমরা ভারতের খনিজ সম্বন্ধে অতিরঞ্জিত সংবাদ পাইয়া থাকি। ইহার জন্য দায়ী আমাদের অনগ্রসর সংখ্যাতত্ত্ব এবং অনুন্নত সংবাদ-প্রকাশ-ব্যবস্থা। সত্যের অপলাপ না করিয়া একথা বলা যাইতে পারে যে, মোটের উপর

ভারতের খনিজ সম্পদ্ ভালই। পৃথিবীর কোন দেশই, এমন কি U. S. A. বা U. S. S. R. খনিজের দিক হইতে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, ভারতবর্ষও নয়। কতকগুলি প্রয়োজনীয় খনিজ ভারতে প্রচুর পরিমাণে আছে, কতকগুলি অল্পপরিমাণে আছে, আবার কতকগুলি একেবারেই নাই। ভারতের খনিজ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত ভাসাভাসা এবং সামান্য। কোন বিশেষ অঞ্চল সম্বন্ধে তেমন কিছু ভূ-বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয় নাই; সাধারণভাবে কোন্ প্রদেশে কি পাওয়া যায়, কি পরিমাণ পাওয়া যায়, কি তাহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা—এখন পর্য্যন্ত এইটুকুর বেশী আমরা বিশেষ কিছু জানি না।

খনিজ দ্রব্যগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—ধাতু, অধাতু এবং ইন্ধন। খনিজ ধাতুর দিক হইতে ভারতকে বেশ প্রাচুর্য্যবান্ বলা যাইতে পারে। এই স্থানে লৌহ-শিল্পকে বিজ্ঞান-সম্মতভাবে উন্নত করিলে ভবিষ্যতে উহা দেশের অভাব মিটাইয়া বিদেশের বাজারে বিস্তার লাভ করিতে পারে। তামা এবং দস্তা কিয়ৎপরিমাণ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু সীসা, নিকেল, প্রভৃতি মোটেই পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই ভারতে উন্নত ধরণের লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। সহজ-লভ্য লৌহ প্রস্তর এবং পাথুরে কয়লার সাহায্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ডে এই সমস্ত ইস্পাত প্রস্তুত হইত। ৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বেও এই ধরণের অগ্নিকুণ্ড সারা দেশময় ছড়ানো ছিল। তারপর কারখানা শিল্পের বৃহৎ উৎপাদন-ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় এইগুলি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইয়া যায়। বর্ত্তমানে বৃহৎ কারখানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে Indian Iron & Steel Co., Tata Iron & Steel Works, Mysore Iron Works, Steel Corporation of Bengal, এবং National Iron & Steel Works উল্লেখযোগ্য। ইহাদের মধ্যে Tata হইতেছে বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে বৃহত্তম লৌহ-শিল্প-প্রতিষ্ঠান।

বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশ, সিংভূম, চান্দা এবং দ্রুগ জেলা, ময়ূরভঞ্জ,

কেয়ঞ্জর এবং বাস্তার রাজ্যের খনিগুলিতে ভারতের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তর পাওয়া যায়। এই খনিগুলিতে ন্যূনকল্পে ৪ শত কোটি টন উৎকৃষ্ট প্রস্তর (যাহার মধ্যে লৌহের ভাগ শতকরা ৬০%) পাওয়া যাইবে। ইহা ছাড়া মাদ্রাজ, হায়দ্রাবাদ, সিমলা পাহাড় অঞ্চল, প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌহ আকর বিস্তৃত রহিয়াছে। অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট প্রকৃতির লৌহপ্রস্তর প্রচুর পরিমাণে ভারতের সর্ব্বত্র পাওয়া যায় এবং নানারূপ বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার দ্বারা এইগুলিকে প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োগ করা সম্ভব।

লৌহ-খনির কার্য্য চালাইবার সর্ব্বাপেক্ষা বড় অসুবিধা হইতেছে কয়লা বা অনুরূপ কোন শক্তির অভাব। বিহার-উড়িষ্যার খনিগুলিকে কয়লার সাহায্যে চালানো হইয়া থাকে। কিন্তু এই সকল স্থানেও ভবিষ্যতে কয়লার অভাব দেখা দিবে, এই আশঙ্কা ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ করিয়া থাকেন। ইহা ছাড়া, নিকটে কয়লা-খনি না থাকার জন্য হায়দ্রাবাদ, বাস্তার, চান্দা, দ্রুগ, প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও লৌহ উত্তোলন এবং গালাইবার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োজন। ভারতের বিশাল লৌহ সম্পদ্‌কে কার্য্যে নিয়োগ করিতে হইলে বৈদ্যুতিক শিল্পের প্রসার অপরিহার্য্য। তাহা না হইলে ভারতবর্ষের অধিকাংশ লৌহ অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে।

যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ভারতে ১৫ লক্ষ টন কাঁচা লোহা প্রস্তুত হইত; ইহার মধ্যে ৫ লক্ষ টন বিদেশে রপ্তানী যাইত। উৎপন্ন ইস্পাতের পরিমাণও ১৫ লক্ষ টনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিছুদিন হইতে রেলওয়ে, যানবাহন, যুদ্ধের অস্ত্র, প্রভৃতির জন্য উন্নত গুণ-সম্পন্ন ইস্পাত ভারতেই প্রস্তুত হইতেছে। যুদ্ধের পূর্ব্বের তুলনায় উৎপাদনের পরিমাণও এখন অনেক বেশী। ইহার উপর বাৎসরিক আমদানীর পরিমাণ এখনও ২৫ কোটি টাকা। এই আমদানী হইতে বুঝা যায় ভারতে ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণের এবং সমৃদ্ধির সুযোগ এখনও অনেক আছে এবং অস্ত্রশস্ত্র, ট্যাঙ্ক,

ইঞ্জিন, কলকব্জা, প্রভৃতির জন্য ইস্পাত ভারতেই স্থায়ীভাবে প্রস্তুত হইতে পারে।

লৌহ ও ইস্পাতের সহিত সংমিশ্রণ করিবার জন্য এবং বিভিন্ন মিশ্রধাতুর খাদ হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য ম্যাংগানীজ নামক এক বিশেষ ধাতুর প্রয়োজন। গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর ম্যাংগানীজ উৎপাদনে ভারত বৃহৎ অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছে এবং প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য রুশিয়া এবং ব্রেজিলের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেছে। বম্বে প্রদেশে, মধ্য প্রদেশে (নাগপুর, চিন্দোয়ারা), উড়িষ্যায় (গাঙ্গপুর, গঞ্জাম), মাদ্রাজে (ভিজাগাপট্টম, খান্দুর) এবং সিংভূমে ম্যাংগানীজের খনি আছে। সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সর্ব্ববিধ ম্যাংগানীজ প্রস্তর আসে মধ্যপ্রদেশ হইতে। সমস্ত ভারতের বার্ষিক উৎপাদন ৬৭ লক্ষ টন এবং ইহার অধিকাংশ মধ্য প্রদেশে উৎপন্ন হয়। এই সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষণীয় হইতেছে যে, সমগ্র উৎপাদনের সুবৃহৎ অংশ বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায় এবং অতি অল্প অংশই ভারতের লৌহ শিল্পে ব্যবহারের জন্য থাকে। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা যে, এই রকম একটি মূল্যবান্ ধাতু সস্তা দামে কাঁচা অবস্থায় বিদেশে চলিয়া যায়, অথচ ভারতের যন্ত্রশিল্পেই ইহাকে ব্যবহার করার যথেষ্ট সুযোগ রহিয়াছে।

Stainless ইস্পাত প্রস্তুত করার জন্য, রং-শিল্প এবং চামড়ার ব্যবসায়ের জন্য ক্রোমিয়ম ধাতুর প্রয়োজন হয়। এই ক্রোমিয়মের উৎপত্তিস্থল হইতেছে মহীশূর রাজ্য, বেলুচিস্থান, সিংভূম, এবং মাদ্রাজের কৃষ্ণা জেলা। ক্রোমিয়মের বার্ষিক উৎপাদন ৪০,০০০ টনের মধ্যে অধিকাংশই বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। তাহার কারণ ইহাকে কাজে লাগাইবার মত উন্নত শিল্প-ব্যবস্থা আমাদের নাই।

তামা, দস্তা, সীসা, টিন এই সাধারণ ধাতুগুলি যুদ্ধের অস্ত্র উৎপাদনে এবং সভ্যতার অগ্রগতির জন্য নানারূপ শান্তি-শিল্পে ব্যবহৃত হয়। বিহার, মাদ্রাজ, সিক্কিম, রাজপুতানা, প্রভৃতি স্থানে তামার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে,

ইহাদের মধ্যে একমাত্র বিহারের খনিগুলি হইতেই নিয়মিত উৎপাদন হইয়া থাকে। মোট উৎপাদন বৎসরে ৭ হাজার টন—মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রয়োজন এতো বেশী যে, প্রতি বৎসর আমাদের প্রায় ২ কোটি টাকার তামা আমদানী করিতে হইতেছে। সীসার খনি বিহারে বা মধ্য প্রদেশে আছে বলিয়া জানা গিয়াছে, কিন্তু কোনটিই উল্লেখযোগ্য নহে। বর্ম্মা ও মালয়ে জিঙ্ক, টিন, তামা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত। বর্ম্মা পৃথক হইয়া যাইবার ফলে জিঙ্ক এবং টিন ভারতে একেবারেই দুষ্প্রাপ্য।

মূল্যবান্ ধাতুর মধ্যে স্বর্ণই প্রথম। বহু প্রাচীন কাল হইতেই ক্ষুদ্র, অগভীর খনি হইতে এবং নদীগর্ভ ধৌত করিয়া স্বর্ণের উৎপাদন চলিয়া আসিতেছে। গত শতাব্দীর শেষভাগে মাদ্রাজ এবং ছোটনাগপুরে স্বর্ণ খনি খনন করার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। সাময়িক সমৃদ্ধির পরই সেই প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হইয়াছিল। বর্ত্তমানে একমাত্র মহীশূরের কোলার অঞ্চলে তিন ফুট বিস্তৃত এবং ৫ মাইল দীর্ঘ স্বর্ণপরিখা ৪টি কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত হয়। বৎসরে মোট উৎপাদন প্রায় ৩ লক্ষ আউন্স—পৃথিবীর সমগ্র উৎপাদনের তুলনায় নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। রূপার উৎপাদনও ভারতে যৎসামান্য, মাত্র ২৫ হাজার আউন্স; স্বর্ণ ধৌত করিবার সময়ে by-product হিসাবে রূপা উৎপন্ন হয়।

এ্যালুমিনিয়ম এবং ম্যাগনেসিয়াম এই দুই হাল্কা ধাতু বর্ত্তমানে বিভিন্ন শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এরোপ্লেন নির্ম্মাণ, যানবাহন ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় এই দুই ধাতুর প্রায়ই প্রয়োজন হইয়া থাকে। বম্বে, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, কাশ্মীর এবং বিহারের মাটীতে এ্যালুমিনিয়ম প্রচুর পরিমাণে আছে। কিন্তু অসুবিধা হইতেছে এই যে, মাটী হইতে বিশ্লেষণ করিয়া তাহাকে ধাতুরূপ দেওয়া অত্যন্ত দুষ্কর। প্রচুর যন্ত্রপাতি এবং বৈদ্যুতিক শক্তি ইহার জন্য প্রয়োজন। বিহারের নিকট একটি এ্যালুমিনিয়ম কারখানা গড়িয়া তোলার পরিকল্পনা অনেকদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে;

কিন্তু সস্তায় বৈদ্যুতিক শক্তিব্যতিরেকে ইহা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া আন্তর্জ্জাতিক প্রতিযোগিতার জন্য ভারতের এ্যালুমিনিয়ম-শিল্প বাধা পাইতেছে।

অধাতু খনিজের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভ্র। বৈদ্যুতিক শিল্পের অপরিবাহী (Insulator) হিসাবে ইহার চাহিদা সমধিক। বিহারের হাজারীবাগ, মুঙ্গের ও গয়া, মাদ্রাজের নেলোর, নীলগিরি এবং মেবার প্রদেশ —এই সকল স্থানে অভ্রখনি পাওয়া গিয়াছে। হিসাব মত বাৎসরিক উৎপাদন ৬।৭ হাজার টন। কিন্তু রপ্তানীর পরিমাণ ১০ হাজার টন। স্পষ্টই বুঝা যায়, হিসাবের বাহিরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভ্র-আকরে Small Scale উৎপাদন চলিতে থাকে। উৎপন্ন পরিমাণের সবটাই বাহিরে রপ্তানী হইয়া যায়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রশিল্পের সম্প্রসারণ হইলেই ভারতের আভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি পাইবে; অভ্রখনিগুলি এখনো খুব অগভীর; গভীরতর খননকার্য্য দ্বারা ভবিষ্যতে অভ্র উৎপাদনে কল্পনাতীত সম্প্রসারণের সুযোগ আছে।

মৃন্ময় এবং কাচ-নির্ম্মিত দ্রব্য প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন প্রকারের কাদা এবং মৃত্তিকার প্রয়োজন হয়। চীনেমাটী, আগুনে মাটী (Fire clay, Pipe clay), প্রভৃতি মৃত্তিকা অল্প-বিস্তর রাজমহল পর্ব্বত, সিংভূম, জব্বলপুর, ইত্যাদি অঞ্চলে পাওয়া যায়। মৃৎশিল্প এবং কাঁচশিল্প আমাদের দেশে দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে; ইহাদের সমৃদ্ধির জন্য এই সকল বিভিন্ন প্রকৃতির মৃত্তিকার ক্রমশঃ অধিকতর প্রয়োজন আমাদের দেশে হইবে। যত্ন ও চেষ্টা করিলে বিভিন্ন ধরণের মৃত্তিকা পাওয়া যাইবে এই আশ্বাস ভূবৈজ্ঞানিকগণ আমাদের দিয়া থাকেন।

এই শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতে সিমেণ্ট উৎপন্ন হইত বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ১৯১৪ সালেই প্রথম portland সিমেণ্ট উৎপাদন আরম্ভ হয়। তারপরে গত ৩০ বৎসর ধরিয়া এই শিল্পের অত্যন্ত দ্রুত উন্নতি হইয়াছে। বাৎসরিক উৎপাদন যুদ্ধ-পূর্ব্ব যুগেও ১০ লক্ষ টনের অধিক ছিল। খড়িমাটী এবং এক বিশেষ ধরণের মৃত্তিকা হইতে সিমেণ্ট উৎপন্ন হয়। এই দুইটা জিনিষই

ভারতের প্রায় প্রত্যেক প্রদেশে পাওয়া যায়; এবং প্রতি প্রদেশেই অন্ততঃ একটি করিয়া সিমেণ্টের কারখানা আছে। ভারতবাসীর জীবনযাত্রা-মানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গৃহ-নির্ম্মাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং সিমেণ্টের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইবে। বর্দ্ধিত চাহিদা মিটাইবার মত নৈসর্গিক উপাদান ভারতের মাটীতেই আছে—এই নিশ্চিতি আমরা পাইয়াছি।

বিভিন্ন রং প্রস্তুত করার জন্য কতকগুলি খনিজের প্রয়োজন হয়। Red Oxide, Titanium dioxide, carbon black, প্রভৃতি উপাদান ভারতের বিভিন্ন স্থানে অল্পবিস্তর পাওয়া যাইতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রই এখনো অপরীক্ষিত অবস্থায় পড়িয়া আছে। জব্বলপুর, কুডাপা, বেলারী, মাদ্রাজ, আলোয়ার রাজ্য এবং ত্রিবাঙ্কুরে রং-প্রস্তুতের উপাদান পাওয়া যায় এবং এই সকল স্থান হইতেই বর্ত্তমানে ঐগুলি সংগৃহীত হইতেছে। বর্ত্তমানে অন্ততঃ ৭০ লক্ষ টাকার রং বিদেশ হইতে আমদানী হয়। ভালো করিয়া পর্য্যবেক্ষণ করিলে রং প্রস্তুতের উপাদান প্রচুর মিলিবে; অতএব রং-এর শিল্প বর্দ্ধিত করিবার চাহিদা এবং সুযোগ দুইই আছে।

Phosphate, Potash এবং Ammonia Salts ভূমির উৎপাদিকা শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে কার্য্যকরী। ত্রিচিনপল্লীতে Phosphate-এর বৃহৎ খনি পাওয়া গিয়াছে। Nitrate, Ammonia অন্যান্য খনিজের bye-product হিসাবে পাওয়া যায়। ভারতের কৃষি এখনো অনগ্রসর এবং অনুন্নত। ইহাকে উন্নত করিতে হইলে বৈজ্ঞানিক সারের প্রয়োজন। এই সার পাওয়া যাইবে এই সকল উৎপাদিকা-শক্তি-সম্পন্ন খনিজ উপাদান হইতে। গন্ধক জাতীয় উপাদান এতদিন ভারতে উৎপন্ন হইত না। বর্ত্তমান যুদ্ধের সময় বেলুচিস্তানের কোহি সুলতান অঞ্চলের খনি হইতে গন্ধক যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে; যুদ্ধোত্তর যুগে এই উৎপাদনকে বজায় রাখিতে এবং বর্দ্ধিত করিতে হইবে।

এই সমস্ত খনিজ ধাতু ও অ-ধাতু আলোচনার পর খনিজ ইন্ধনের কথা আসিয়া পড়ে। ইন্ধনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কয়লা। রাজপুতানা, পাঞ্জাব, কাশ্মীর, সীমান্ত প্রদেশ, প্রভৃতি স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি কয়লার খনি থাকিলেও, প্রধানতঃ কয়লা-খনিগুলি পূর্ব্ব ভারতে কেন্দ্রীভূত। ভারতের কয়লাকে দুইটি প্রধানস্তরে ভাগ করা যায়—বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশে দামোদর, শোন, ওয়ার্ধা, গোদাবরী এবং মহানদী উপত্যকার উচ্চগুণসম্পন্ন কয়লা; এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের এবং আসামের অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট কয়লা। উচ্চ ধরণের কয়লার মোট পরিমাণ ছয় হাজার কোটি টন। নিকৃষ্ট কয়লার মোট পরিমাণ ঠিক হিসাবের মধ্যে পাওয়া যায় নাই; তবে ৩০০ কোটি টনের কম হইবে না ইহা নিশ্চিত। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই রহিয়াছে আসামের জঙ্গলে-ঢাকা অনাবিষ্কৃত এলাকায়। বর্ত্তমানে বার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ মোট ২½ কোটি টন। কিন্তু ঠিকভাবে উৎপন্ন করিতে পারিলে উৎপাদন অনেকখানি বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। ভারতের উৎপন্ন কয়লার সবটাই আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে খরচ হইয়া যায়। কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে কত কয়লা খরচ হয় লক্ষ্যণীয় বিষয়। রেলওয়েতে মোট উৎপন্ন কয়লার শতকরা ৩২%, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে ২২%, বয়নশিল্পে ১০%, খনিগুলিতে ১০%, এবং অন্যান্য শিল্পে ২৬% খরচ হয়। এখনো পর্য্যন্ত উৎপাদন-ব্যবস্থা উন্নত না হওয়ার জন্য কয়লার খনিগুলিতে প্রচুর কয়লা অপচয় হয়। এই অপচয় বন্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চলিতেছে। ইহা ছাড়া কয়লার পরিবর্ত্তে যদি বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কয়লাখনিগুলিতে এবং অন্যান্য খনিগুলিতে কার্য্য চালানো যায় তাহা হইলে শতকরা ১০% কয়লা সহজেই বাঁচিতে পারে।

কয়লার পর পেট্রোল হইতেছে উল্লেখযোগ্য ইন্ধন। একমাত্র আসাম এবং পাঞ্জাবেই তৈলখনি আছে। এই দুই স্থান হইতে বৎসরে ৮।৯ কোটি গ্যালন তৈল উৎপন্ন হয়। উৎপাদনের এই পরিমাণ নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর—

সমস্ত পৃথিবীর উৎপাদনের শতকরা মাত্র ০·১০%। ১৯৩৬ সালে বিদেশ হইতে আমাদিগকে ১৯ কোটি গ্যালন কেরোসিন, ১৩½ কোটি গ্যালন জ্বালানী তৈল, ৩½ কোটি গ্যালন lubricating তৈল, এবং ৫ কোটি গ্যালন motor spirit আমদানী করিতে হইয়াছিল। ইহাদের মোট মূল্য হইয়াছিল ১৩ কোটি টাকা। ভারতের অন্যান্য কোন স্থানে তৈল খনি পাওয়া যায় কিনা এই অনুসন্ধান মধ্যে মধ্যে করা হইয়াছে—কিন্তু নূতন তৈল খনি পাওয়া যায় নাই। ক্রমবর্দ্ধমান তৈলের চাহিদা মিটাইতে হইলে আমাদের কৃত্রিম তৈলের উপর নির্ভর করিতে হইবে।

পরিশেষে ভারতের খনিজশিল্পের সম্বন্ধে কতকগুলি সিদ্ধান্তে পৌছানো প্রয়োজন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের খনিগুলিকে ঠিকমত পরিচালনা করা হয় না। সুযোগ্য কর্ম্মকর্ত্তা, শিক্ষিত কারিগর, চিন্তাশীল ইঞ্জিনিয়র এবং পর্য্যাপ্ত মূলধন—এই সবেরই অভাব লক্ষিত হয় আমাদের দেশে। কিন্তু আজ যখন যুদ্ধোত্তর শিল্প-পরিকল্পনা লইয়া এত চিন্তা করা হইতেছে, তখন আমাদের খনিগুলিকে উন্নত করিয়া, যে স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের অধিকারী আমরা, তাহাকে করায়ত্ত না করার কোন কারণই থাকিতে পারে না।

পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, ম্যাংগানীজ, ক্রোমিয়ম, অভ্র, প্রভৃতি কতকগুলি অতি মূল্যবান্ সম্পদ আমরা কাঁচা অবস্থায় সস্তাদরে বিদেশে ছাড়িয়া দিই; এবং বিদেশের শিল্পকে আমাদের সম্পদের সাহায্যে লাভবান হইতে দিই। কোন দেশের পক্ষে ইহার চেয়ে লোকসান আর কিছু হইতে পারে না। এই বাৎসরিক ক্ষতিকে আমাদের বন্ধ করিতেই হইবে। আমাদের স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্যের সাহায্যে আমাদের নিজ শিল্পকে উন্নত করার কথা ভাবিতেই হইবে।

খনিজ শিল্পের সহিত যানবাহন-শিল্পের সংযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। বিভিন্ন খনিজ বিশেষ বিশেষ অঞ্চল হইতে পাওয়া যায়। তাই সমস্ত দেশের প্রয়োজনে তাহাকে উৎপত্তি স্থল হইতে লইয়া দেশময় ছড়াইয়া দিতে হয়। সমৃদ্ধ

যানবাহন ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। অনেক সময়ে যানবাহনের খরচ এত বেশী হয় যে, কয়লা বা কাঁচা লোহার মত সস্তা খনিজ প্রয়োজন হইলেও একস্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাওয়া যায় না। খনিজ দ্রব্য বহন করার জন্য উন্নত যানবাহন ব্যবস্থার প্রয়োজন আছে।

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন আমাদের সমগ্র খনিজ-সম্পদ সম্বন্ধে সবিশেষ জ্ঞান সঞ্চয় করা। ইহার জন্য একদিকে হাজার হাজার ভূবৈজ্ঞানিক, পর্য্যবেক্ষক এবং ভূতত্ত্ববিদ্ নিযুক্ত করিতে হইবে; অন্যদিকে গবেষণাগারে ভারতের মৃত্তিকার গুণাগুণ সম্বন্ধে, বিভিন্ন স্তর ও প্রস্তর সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক আলোচনার জন্য researchএর বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এই সকল কার্য্য করিবার জন্য যে একমাত্র সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে Geological Survey of India, তাহার বন্দোবস্ত প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অল্প।

আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বর্ত্তমানের অনুন্নত, অনগ্রসর অবস্থাতেই ভারতের খনিগুলিতে ৬ লক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত আছে, এবং যে সকল শিল্প-প্রতিষ্ঠান সোজাসুজি খনি-শিল্পের উপর নির্ভরশীল (লৌহ-শিল্প, সিমেণ্ট-শিল্প) সেইগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করিলে এই সিদ্ধান্ত অবধারিত যে, অন্যূন ২০ লক্ষ লোকের জীবন নির্ভর করে খনিগুলির উপর। ভবিষ্যতে যে প্রসার সহজেই সম্ভব তাহা করিলে কী বিপুল সংখ্যক লোকের জীবিকার সংস্থান হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। ইহা ছাড়াও খনি হইতেছে প্রধানতম মূল শিল্প, (Key industry) যাহার উপর সকল শিল্পের অগ্রগতি নির্ভর করে। অতএব সরকার এবং জনসাধারণ উভয়কেই বিশেষ দৃষ্টি এই দিকে দিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগটি হইতেছে রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বের যুগ কাজেই পরিকল্পনার দায়িত্ব রাষ্ট্রকেই গ্রহণ করিতে হইবে। দেশের অন্যান্য সকল প্রয়োজনের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, শ্রমিক-সমস্যার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, প্রয়োজনীয় মূলধনের বন্দোবস্ত করিয়া, আমদানী-রপ্তানীকে আরও সুসমঞ্জস করিয়া খনি-শিল্পকে সম্প্রসারিত এবং সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রবাদ

'ধনতন্ত্রবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, বর্ত্তমান পৃথিবীর অগ্রগতি আর ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া সম্ভব নহে। অপচয়, শোষণ, যুদ্ধ—প্রভৃতি সামাজিক সঙ্কটগুলি দুষ্ট ব্রণের মত সমাজকে বিষাক্ত করিয়া দিতেছে। সমস্ত উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তাহার সহিত সমাজ-ব্যবস্থা জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে, সময়ের সহিত সামঞ্জস্যহীন হইয়া গিয়াছে। ধনতন্ত্রবাদের অসংখ্য সমস্যার সমাধান আমরা পাইয়া থাকি সমাজতন্ত্রবাদের মধ্য দিয়া। ধনতন্ত্রের পরিবর্ত্তে সমাজতন্ত্রের সাহায্যে—সমতার ভিত্তিতে, সামাজিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে, বহু মানবের কল্যাণ সাধনার্থে নূতন সুস্থ, সবল, প্রাণবান্ উৎপাদন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে হইবে। এই সমাজতন্ত্রবাদের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও ইহার সম্ভাবনার বিচার আমাদের বর্ত্তমান প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।

সমাজতন্ত্রবাদ আলোচনা করার কতকগুলি অসুবিধা আছে। প্রথমতঃ, সমাজতন্ত্রবাদ বলিতে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝায়, আবার একটি সামাজিক আন্দোলনও বুঝায়। বর্ত্তমানে আমরা প্রধানতঃ তত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিব; কিন্তু আন্দোলনকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র তত্ত্ব আলোচনা সম্ভব নহে। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্র শুধু অর্থনৈতিক তত্ত্ব নহে, আবার শুধু রাজনৈতিক তত্ত্বও নহে; অর্থনীতি এবং রাজনীতির সংমিশ্রণে ইহা গঠিত। ইহার আলোচনা সমধিক কঠিন। তৃতীয়তঃ 'সমাজতন্ত্রবাদ' কথাটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ভিন্ন ভিন্ন লেখক ও দার্শনিক তাঁহাদের স্বীয় ধারণা অনুযায়ী সমাজতন্ত্রবাদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফলে দাঁড়াইয়াছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথাকথিত সমাজ-তান্ত্রিক লেখকেরা আমাদের যাহা পরিবেশন করেন, তাহা দুধও নহে, জলও নহে, দুধমেশানো জল, অথবা জলমেশানো দুধের মত অসার পদার্থ। "Soci-

alism is like a hat that has lost its shape, because every body wears it."

নানারূপ সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যেটি সর্ব্বাপেক্ষা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গঠিত, একমাত্র তাহাকেই প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ বলা হয়, আমরা তাহাই আলোচনা করিব। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের পিতা হইতেছেন জার্ম্মাণ দার্শনিক Karl Marx. তাঁহার পূর্ব্বে Owen, Fourier, প্রভৃতি আদর্শবাদী লেখক মানবতার দিক হইতে সমাজতন্ত্রবাদ প্রচার করিয়াছিলেন; মার্ক্স ই প্রথম এই সমস্ত আবেগ-বহুল আদর্শ এবং মনোভাবকে বিশ্লেষণ করিয়া বৈজ্ঞানিক রূপদান করিলেন। সুদীর্ঘকাল জগতের ইতিহাস গভীরভাবে অধ্যয়ন করিয়া মার্ক্স বলিলেন—পৃথিবীর সভ্যতা কতকগুলি বিভিন্ন সমাজ-ব্যবস্থার মধ্য দিয়া আসিয়া বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পৌঁছিয়াছে। প্রত্যেক সমাজ-ব্যবস্থার স্বরূপ এবং চরিত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই যুগের উৎপাদন ব্যবস্থার দ্বারা। কোন একটি বিশেষ ব্যবস্থায় যে সমস্ত অভাব, অসুবিধা দেখা যায়, সেইগুলি সঞ্চিত হইতে হইতে সমাজে সঙ্কটের সৃষ্টি করে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসুবিধাগুলি আর ধামাচাপা দেওয়া বা সংস্কার করা সম্ভব হয় না; বিপ্লব আসিয়া পড়ে। বিপ্লবের মধ্য দিয়া সমাজ পুরাতন ব্যবস্থাকে বর্জ্জন করিয়া নূতন ব্যবস্থা খুঁজিয়া লয়।

এইরূপে সভ্যতার আদিযুগ হইতে মানুষ একটির পর একটি উৎপাদন-ব্যবস্থা এবং তৎসহ সমাজ-ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বর্জ্জন করিয়াছে। আদিম সাম্যবাদ, ক্রীতদাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা পর পর সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এবং পর পর বর্জ্জিত হইয়াছে। ভূমিদাস প্রথার পরে আসিয়াছে সামন্ত প্রথা। সামন্ত প্রথায় জমি ছিল প্রধান উৎপাদন-যন্ত্র, এবং জমিদার ছিলেন উৎপাদনের মালিক। জমিতে যাহারা চাষ করিত, সেই সকল কৃষককে তাঁহারা বাধ্যতা-মূলক ভাবে খাটাইয়া শোষণ করিতেন। আর যেহেতু তাঁহারা ছিলেন উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ন্তা, সেই হেতু, সমাজের কর্তৃত্ব এবং রাষ্ট্র পরিচালনায়

ক্ষমতাও তাঁহাদের হাতে ছিল। কিন্তু সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত-তন্ত্রে অনেক গলদ, অসুবিধা দেখা দিতে লাগিল। প্রথম দিকে ছোটখাটো সংস্কার ও পরিবর্ত্তনের সাহায্যে এই অসুবিধাগুলি দূর করিবার চেষ্টা চলিতে লাগিল। কিন্তু এমন একটি সময় আসিয়া পড়িল, যখন ছোট-খাটো সংস্কারের সাহায্যে দৈনন্দিন অভাব অভিযোগগুলির সমাধান সম্ভব হইল না। তখন বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়া সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা বর্জ্জন করিয়া ধনতন্ত্রকে কায়েম করা হইল। বিখ্যাত ফরাসী বিপ্লব, অথবা ইংল্যাণ্ডে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহুদিন ধরিয়া যে বিপ্লব চলিয়াছিল, তাহাই ছিল, জরাজীর্ণ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে নব জাগ্রত ধনতন্ত্রের বিপ্লব। বর্ত্তমানে যে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা সমাজে রহিয়াছে, তাহা ঐ একই উপায়ে বর্জ্জিত হইবে; এবং ধনতন্ত্রের পর যে সমাজ ব্যবস্থা আসিবে, তাহার অর্থনৈতিক ভিত্তি হইবে সমাজতন্ত্র। এই সমাজতন্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া মার্ক্স দুইটি মূল তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন।

প্রথমটি হইল—পণ্যের উদ্‌বৃত্ত মূল্য। পুঁজিপতি শ্রমিককে অল্প বেতনে নিয়োগ করে, শ্রমিক শ্রমের সাহায্যে পণ্য উৎপাদন করে; সেই পণ্য বাজারে বিক্রয় করিয়া পুঁজিপতি মুনাফা করে। পণ্যের উৎপাদনের একমাত্র উৎস হইতেছে শ্রমিকের শ্রম। পুঁজিপতি যে যন্ত্রপাতি, কারখানা, প্রভৃতি মূলধন সরবরাহ করিয়া থাকেন, তাহাও পূর্ব্বকৃত শ্রমের ফল। অতএব শ্রমই হইতেছে পণ্য এবং মূল্যের একমাত্র সৃষ্টিকর্ত্তা। তাই একমাত্র শ্রমিকই শ্রমজাত সম্পদের অধিকারী। কিন্তু আসলে যাহা ঘটে, তাহা অন্যরূপ। পণ্যের উৎপাদনমূল্য এবং বিক্রয়-মূল্যের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য থাকে। শ্রমিককে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহা দ্বারাই উৎপাদন-মূল্য নির্দ্দিষ্ট হয়। বিক্রয়-মূল্য নির্ভর করে বাজারের অবস্থার উপর। উৎপাদন-মূল্যের সহিত বিক্রয়-মূল্যের যে পার্থক্য তাহাকে বাড়তি মূল্য বলে। এই বাড়তি মূল্যকে পুঁজিপতি অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে। সে একমাত্র তাহার নিয়োজিত মূলধনের উপর সুদ লইতে

পারে। তাহার উর্দ্ধে সে যাহা লয়, তাহা অনধিকার পূর্ব্বক শ্রমিকের অংশ লয়।

দ্বিতীয় তত্ত্বটি হইতেছে,—ঐতিহাসিক জড়বাদ। মার্ক্স মানব-সমাজের সমগ্র ইতিহাসকে বাস্তবতার মাপকাঠিতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যে সমস্ত ঘটনা পৃথিবীতে সংঘটিত হয়, তাহার মূল কারণ কোন ব্যক্তিগত মোহ বা উচ্চাশা নহে, রাজকীয় মর্য্যাদাবোধ বা রাজনৈতিক ক্ষমতার লোভ নহে,—সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার মূলে রহিয়াছে একমাত্র অর্থনৈতিক লাভালাভের তাগিদ। এই তত্ত্ব-অনুযায়ী Parisএর উপর Menelausএর প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা গ্রীস এবং ট্রয়ের মধ্যে যুদ্ধের কারণ নহে; মূল কারণ হইল, গ্রীকজাতি প্রাচ্যের সহিত নূতন বাণিজ্য পথ অনুসন্ধান করিতেছিল, এবং তাহার জন্যই ট্রয়ে আসিয়াছিল। ইতিহাস গড়িয়া উঠে অর্থনৈতিক চিন্তাধারা এবং কার্য্যাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে। ইতিহাসের প্রত্যেকটি যুগে উৎপাদন ব্যবস্থার সহিত সমাজ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্ত্তমান। উৎপাদন-ব্যবস্থাই নির্দ্ধারিত করিয়া দেয় কিরূপ সমাজ-ব্যবস্থা, রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, নিয়ম-প্রণালী সমাজে কার্য্যকরী হইবে। উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে সকল শক্তি কার্য্য করে, তাহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ সামাজিক ক্ষেত্রেও তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণীত করিয়া দেয়। অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী যাহারা তাহারা প্রতিটি বিশেষ যুগে সামাজিক বিধিব্যবস্থা, নিয়ম-প্রণালী নিজেদের অনুকূলে গড়িয়া তুলে, সমাজের এবং রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্বভার গ্রহণ করে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে শিল্পবিপ্লবের ফলে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থা পৃথিবীতে কায়েম হয়, এবং বর্ত্তমানের যে সমাজ-ব্যবস্থা, তাহা গঠিত হইয়াছে এই উৎপাদন-ব্যবস্থার অনুকূলে।

বর্ত্তমান সমাজে আমরা দেখি একদল পুঁজিপতি, এবং অসংখ্য শোষিত দরিদ্র শ্রমিক। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে ধনোৎপাদনের ক্ষেত্রে সহযোগিতা রহিয়াছে; কিন্তু ধনবণ্টনের ক্ষেত্রে তীব্র সংঘর্ষ। ধনপতি ন্যূনতম বেতনে শ্রমিককে খাটাইতে চায়; আর শ্রমিক যত বেশী সম্ভব পারিশ্রমিক ধনপতির নিকট আদায় করিবার

চেষ্টা করে। শোষক এবং শোষিতের মধ্যে এই যে শ্রেণী-সংগ্রাম, ইহা যে কেবল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যেই রহিয়াছে—তাহা নহে। সামন্ত তান্ত্রিক যুগে ভূস্বামী এবং ভূমিদাসের মধ্যেও শ্রেণী-সংগ্রাম ছিল; তৎপূর্ব্ব যুগেও ছিল। শ্রেণী-সংগ্রামের মধ্য দিয়াই সমাজ এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থায় রূপান্তর গ্রহণ করে। অসন্তুষ্ট শোষিত সমাজ নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য সংগ্রাম করিতে থাকে, শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে, এবং পরিশেষে সামাজিক বিপ্লবের মধ্য দিয়া নিজের স্বার্থের অনুকূলে নূতন উৎপাদন-ব্যবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া লয়।

বর্ত্তমানেও এই শ্রেণী-সংগ্রাম চলিতেছে। পুঁজিপতি শ্রমিকদিগকে শোষণ করিতেছে; শ্রমিক শোষণের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হইতেছে। পুঁজিপতির পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা বৃহৎ ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া অবশেষে শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হইতেছে। পুঁজির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে, কিন্তু পুঁজিপতির সংখ্যা কমিতেছে। শ্রমিকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে, শোষণ উগ্রতর হইতেছে, অসন্তোষ ধূমায়িত হইতেছে, সংঘবদ্ধ শ্রমিক অধিকতর শক্তিশালী হইতেছে। অবশেষে যে শ্রেণী-সংগ্রাম সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহাই আবার ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া সমাজতন্ত্র আনয়ন করিবে।

এই সমাজতন্ত্রের স্বরূপ কি হইবে? সমাজতন্ত্রে শোষণ থাকিবে না, উগ্র ধনবৈষম্য থাকিবে না, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও ব্যক্তিগত মুনাফা থাকিবে না। যে সকল শ্রমিক সমাজ-বিপ্লবের মধ্য দিয়া শোষণকে শেষ করিতে চাহিবে, তাহারা আবার শিল্পকে, কৃষিকে, ব্যবসা-বাণিজ্যকে কোন ব্যক্তির হাতে তুলিয়া দিবে না, ঐগুলি সাধারণের ব্যবহারের জন্য সাধারণের সম্পত্তি করিয়া রাখিবে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যবসাবাণিজ্য শিল্পকৃষি ব্যক্তিগত অধিকারে থাকে না, সমাজের অধিকারে থাকে; সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী ঐগুলি পরিচালিত হয়; এবং সামাজিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধনতন্ত্রের পরে আপনা হইতেই আসিবে। ইহাকে কেহই রোধ করিতে পারিবে না। মাধ্যাকর্ষণের শক্তির মত শ্রেণী-সংগ্রামের শক্তিকেও কেহ খর্ব্ব করিতে পারিবে না। কিন্তু স্বাভাবিকভাবে সংঘটিত হইতে গেলে সময় অনেক বেশী লাগে। সমস্ত শক্তিগুলি ধীরে ধীরে কার্য্য করে; অগ্রগতি হয় অত্যন্ত মন্থর গতিতে। ধনতান্ত্রিক শোষণে যাহারা উৎপীড়িত, তাহারা কিন্তু দীর্ঘসময় অপেক্ষা করিতে পারে না। সক্রিয়ভাবে বিপ্লবে অংশ গ্রহণ করা, বিপ্লব গড়িয়া তোলা, এবং স্বাভাবিক অগ্রগতি দ্রুততর করাই হইল মানুষের বিশেষতঃ শ্রমিক শ্রেণীর কর্ত্তব্য। অতএব যাহারা বিপ্লবী সমিতি গড়িয়া তোলে, সমাজতন্ত্রের সৈনিক যাহারা, তাহারা নূতন কিছু করে না, অভাবনীয় বা স্বভাব-বিরুদ্ধ কিছু করে না, তাহারা শুধু প্রকৃতিকে সাহায্য করে—যাহা অনিবার্য্য তাহাকে দ্রুততর করিয়া তুলে।

সমালোচকেরা অনেক সময়ে বলিয়াছেন, সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে। ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার একমাত্র ব্যক্তিগত। সমাজের বা রাষ্ট্রের ইহাতে কিছু করিবার নাই। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া রাষ্ট্র ব্যক্তিগত অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। এই হস্তক্ষেপে ব্যক্তির যোগ্যতা কমিয়া যায়; ব্যক্তির সহিত ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতার দ্বারাই প্রত্যেকের যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রতিযোগিতা না থাকিলে উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়। রাষ্ট্র ব্যবসা-বাণিজ্যের কর্ত্তৃত্ব করিলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়, ব্যক্তিগত যোগ্যতা নষ্ট হয়, সমাজের মান অবনত হয়। এই অভিযোগ কতখানি সত্য বিচার করিতে হইলে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্দেশ্য এবং দর্শন জানা প্রয়োজন।

সমাজতন্ত্রবাদ চায় বর্ত্তমানের চেয়ে উৎকৃষ্ট একটি সমাজ-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে—যে সমাজ-ব্যবস্থায় ব্যক্তি শোষণমুক্ত হইয়া সর্ব্বদিকে উন্নত হইবে, এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইবে। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হরণ করে—ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ইহার বিপরীতটাই ঠিক। সমাজতন্ত্রবাদ

সমাজের স্বার্থ এবং ব্যক্তির স্বার্থের মধ্যে সংঘর্ষকে স্বীকার করে না—সমাজের স্বাধীনতা এবং ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করিতে প্রয়াস পায়। বর্ত্তমানে, কতকগুলি লোকের ব্যবসা করিবার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে গিয়া সহস্র সহস্র লোককে তাহাদের শোষণের জাঁতাকলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। পুঁজিপতিদের তথাকথিত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে গিয়া, অসংখ্য লোকের বাঁচিয়া থাকার স্বাধীনতা হরণ করা হয়। সমাজতন্ত্রবাদ পুঁজিপতিদের শোষণ করিবার অধিকার নিশ্চয়ই কাড়িয়া লয়; কিন্তু সমগ্র সমাজের স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জন করার, শোষণমুক্ত জীবনধারণ করার স্বাধীনতা দান করে। শুধু তাহাই নহে; জনগণকে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটাইবার দুশ্চিন্তা হইতে মুক্তি দিয়া সমাজতন্ত্র মানুষের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ অনেক বৃদ্ধি করিয়া দেয়। বর্ত্তমান অবস্থায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন আলোচনা করার সময় এবং সুযোগ শতকরা ৫জন লোকে পায়—যাহারা অপরকে শোষণ করিয়া নিজেদের অবসর করিয়া লইয়াছে। ভবিষ্যতের সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় সম্পদ্ যখন প্রচুরতর হইবে, জীবন-ধারণ যখন আর গুরুতর সমস্যা থাকিবে না, বাঁচিয়া থাকার দুশ্চিন্তা যখন আর উগ্র থাকিবে না, তখন সমগ্র জনসাধারণ সংস্কৃতির উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইবে, সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি করিবে। সমাজ-তান্ত্রিক সভ্যতায় সংস্কৃতির প্রসার দ্রুততর হইবে।

সমাজতন্ত্রবাদের লক্ষ্য ব্যক্তিগত মুনাফা নহে, সামাজিক কল্যাণ। ইহার কর্ম্মপন্থা বাণিজ্যে অবাধ স্বাধীনতা নহে, রাষ্ট্রের সচেতন হস্তক্ষেপ ও সক্রিয় অংশ-গ্রহণ; শ্রমিক এবং শিল্পপতির মধ্যে প্রাত্যহিক সংঘর্ষ নহে, উভয়ের সহযোগিতায় সাধারণ স্বার্থে শিল্পের নীতি-নির্দ্ধারণ; উৎপাদনের বিভিন্ন শক্তিগুলির মধ্যে স্বাস্থ্যকর সহানুভূতি এবং পারস্পরিক সাহায্যবোধ। ধনতন্ত্রে উৎপাদনের ক্ষেত্র ভ্রাতৃবিরোধে বিভক্ত গৃহের মত, আর সমাজতন্ত্রে সমগ্র মানব সমাজ মহান্ আদর্শে ঐক্যবদ্ধ। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শোষণের স্পৃহা সমাজ হইতে লোপ পায়, দেশের মধ্যে শোষণ লুপ্ত হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে শোষণ-ব্যবস্থা

ভাঙ্গিয়া পড়ে। ধনতন্ত্রের পরিণাম যুদ্ধ এবং সাম্রাজ্যবাদ; সমাজতন্ত্রে শোষণ করিবার আর কেহ থাকে না, যুদ্ধ লোপ পায়; সমগ্র মানব-সমাজ পারস্পরিক সদিচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ থাকে। শ্রেণী-সংগ্রাম লুপ্ত হয় এবং সমগ্র মানব সমাজের সংগ্রাম আরম্ভ হয় প্রকৃতির বিরুদ্ধে—প্রকৃতির নিকট হইতে অধিকতর সম্পদ আহরণ করিবার জন্য, মানবের জীবনযাত্রার মান উন্নতির জন্য, সমাজের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য।

যে দেশে উৎপাদন-ব্যবস্থা কয়জন ধনপতির কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত, সেই দেশে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইলেও, রাষ্ট্র চালনার প্রকৃত ক্ষমতা জনসাধারণ লাভ করে না, কতিপয় ধনিকের হাতেই উহা থাকিয়া যায়। জনসাধারণের ভোট দিবার ক্ষমতাকে তাহারা ঠিকমতো নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করিতে পারে না। যে জনমত রাজনৈতিক ক্ষমতার সৃষ্টি করে, আইনসভা নির্ব্বাচন করে বা সামাজিক বিধিব্যবস্থা আইন-কানুন সৃষ্টি করে, সেই জনমতকে গড়িয়া তোলা হয় উৎপাদন-ব্যবস্থার যাঁহারা মালিক তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূলে। সংবাদপত্র, সিনেমা, রেডিও, স্কুল প্রভৃতির মধ্য হইতেই জনমত গড়িয়া উঠে। এই সবগুলিই ধনী শিল্পপতিদের দখলে এবং তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী পরিচালিত হয়। অতএব জনসাধারণ নিজেরা ভোট দেয় বটে, কিন্তু তাহারা অচেতনভাবে এমন এক জনমতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, যাহা ধনীদের স্বার্থে গঠিত। উৎপাদন-যন্ত্রের মালিকানা যদি জনসাধারণের হাতে থাকিত, তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থনৈতিক ভিত্তি সমগ্র সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইত, অপর দিকে জনমত দুই-একজনের স্বার্থে গঠিত না হইয়া সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে গঠিত হইত। এক কথায় বলিতে গেলে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শিল্পের মালিকেরা রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব করেন এবং রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা স্বীয় স্বার্থের অনুকূলে গড়িয়া তুলেন। সমাজতন্ত্রে সমগ্র জনসাধারণ শিল্পের মালিক; রাজনৈতিক গণতন্ত্রের সহিত অর্থনৈতিক গণতন্ত্র যখন যুক্ত হয় একমাত্র তখনই গণতন্ত্র পূর্ণাঙ্গ হয়, সার্থক হয়।

অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ব্যতীত রাজনৈতিক গণতন্ত্র অসার। তাই একমাত্র সমাজতান্ত্রিক দেশেই প্রকৃত গণতন্ত্র সম্ভব।

প্রবন্ধের শেষে সাম্যবাদী সমাজের দুই একটি সমস্যার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অনেকে বলিয়াছেন—সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা মুনাফা থাকিবে না, অতএব কার্য্যের প্রেরণা থাকিবে না। এই অসুবিধাটি আপাতঃ দৃষ্টিতে অত্যন্ত সত্য মনে হয়। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করিলে বুঝা যায়—ব্যক্তিগত লাভের মনোবৃত্তি ধনতান্ত্রিক সভ্যতারই সৃষ্ট ফল। এই বিশেষ পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছি বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ইহা ছাড়া বুঝি অন্য কিছু হইতে কার্য্যের প্রেরণা আসিতে পারে না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, বিপ্লব দ্বারা শুধু উৎপাদন ব্যবস্থাই যে পরিবর্ত্তিত হয় তাহা নহে, আমাদের সমস্ত চিন্তাধারারও আমূল পরিবর্ত্তন সম্ভব। বর্ত্তমানে অর্থ ও মুনাফাকে আমরা চরম কাম্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কিন্তু এমন এক সময়ের কল্পনা অলীক নহে, যখন সামাজিক সম্মানবোধ, সামাজিক মর্য্যাদাবোধ, সামাজিক কল্যাণবোধ আমাদের কার্য্যের প্রেরণা যোগাইবে। যখন আমরা, বৃহৎ মুনাফা পাইব—এই আশায় কোন দুষ্কর কার্য্যে ব্রতী হইব তাহা নহে; সমাজের হিতসাধন করিলে সমাজ আমাদের কার্য্যের প্রশংসা করিবে, আমাদিগকে মর্য্যাদা দিবে, এবং সর্ব্বোপরি আমার সমাজ সুন্দরতর হইবে—এই আশা আমাদের প্রেরণার উৎস হইবে। সমাজতন্ত্রে অলস ব্যক্তিরা প্রশ্রয় পাইবে, এই ধারণাও অত্যন্ত ভ্রান্ত। বরঞ্চ সমাজতন্ত্রে পিতার সম্পত্তির কল্যাণে অলস জীবনযাত্রা সম্ভব হইবে না, প্রত্যেক লোককে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ কার্য্য করিতে হইবে, এবং সমাজের উন্নতির জন্য স্বীয় শ্রম দান করিতে হইবে।

আরেকটি সমস্যা হইতেছে, কোন্ উপায়ে সমাজতন্ত্র আনিতে হইবে। বিপ্লব দ্বারা সমাজতন্ত্র আসিবে, না শান্তিপূর্ণভাবে শাসনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আসিবে? বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন মত পোষণ করেন; তবে বৈজ্ঞানিক

সমাজতন্ত্রীরা বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তার কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। বিপ্লব ব্যতীত পুঁজিপতিরা ক্ষমতা হস্তান্তর করিবে না, ইহাই তাঁহাদের অভিমত। তবে বিপ্লবের রূপ কী হইবে, বিপ্লব অহিংস হইবে কী সহিংস হইবে, বিপ্লবে রক্তপাত বেশী হইবে কি কম হইবে, বিপ্লবের পর সর্ব্বহারা একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হইবে না, নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইবে, তাহা নির্ভর করিবে বিশেষ স্থান, কাল এবং বাস্তব অবস্থার উপর। "The most successful revolution is bloodless." যে বিপ্লবের প্রস্তুতি অত্যন্ত বেশী, তাহাতে রক্তপাত খুব কম হইবে। আবার বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধোত্তর ইউরোপে নূতন গণতন্ত্রগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার মধ্য দিয়াই বিপ্লব সংঘটিত হইতে পারে। ঐতিহাসিক কারণে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে প্রোলেটারিয়েট্ একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল, আবার ঐতিহাসিক কারণেই যুগোশ্লাভিয়ায় নূতন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হইতেছে। যে ভাবেই আসুক কেন না, সমাজতন্ত্রের জয় অবশ্যম্ভাবী, তাই সচেতন মানব-সমাজের কর্ত্তব্য ইহার আগমনের পথ সুগম করিয়া দেওয়া।

ব্যাঙ্ক ও তাহার কার্য্য

ব্যাঙ্ক হইতেছে এমন একটি প্রতিষ্ঠান যাহাকে সংজ্ঞা দিয়া বোঝাইবার চেয়ে তাহার কার্য্যাবলী দিয়া বোঝানো সহজ। ব্যাঙ্কের কি কার্য্য? ব্যাঙ্ককে বলা হয় ঋণের কারবারী। ব্যাঙ্ক জনসাধারণের নিকট ঋণ গ্রহণ করে আর সেই অর্থ ঋণ দেয় ব্যবসায়ীগণকে। অতি প্রাচীন যুগ হইতে ব্যাঙ্কের কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন গ্রীস, রোম এবং ভারতে ঋণদান ও ঋণগ্রহণ ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। যে সকল ব্যক্তির দৈনন্দিন জীবনধারণের পর উদ্বৃত্ত অর্থ থাকিত, তাহারা চুরি ডাকাতিতে অর্থ নষ্ট হইয়া যাওয়ার ভয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ অন্য

কোন লোকের নিকট গচ্ছিত রাখিত। এই লোকটি তাহার নিকট গচ্ছিত অর্থ অপরকে ধার দিতে আরম্ভ করিল, এবং তাহার নিকট সুদ লইল। এইভাবে টাকা গচ্ছিত রাখা যখন লাভজনক হইল, তখন গচ্ছিতকারীকেও সুদ দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই হইল কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ইতিহাস। পরবর্ত্তীযুগে সমবায় ব্যাঙ্ক, বিনিময় ব্যাঙ্ক, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি গড়িয়া উঠিল। আমরা কিন্তু ব্যাঙ্কের কার্য্য মোটামুটি বুঝাইবার জন্য কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যাবলী আলোচনা করিব।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের প্রথম কার্য্য হইল জনসাধারণের নিকট যে সঞ্চিত অর্থ বিচ্ছিন্নভাবে পড়িয়া থাকে, সেই অর্থ সংগ্রহ করা, কেন্দ্রীভূত করা, কেন্দ্রীভূত অর্থ হইতে ব্যবসায়িগণকে ঋণ দেওয়া, শিল্পে পুঁজি নিয়োগ করা। জনসাধারণের নিকট বিচ্ছিন্নভাবে যে অল্পপরিমাণ অর্থ পড়িয়া থাকে, তাহা তাহারা কোন গঠনমূলক কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারে না। অথচ সেই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থসমষ্টি লইয়া ব্যাঙ্ক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নিয়োগ করে, ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, শেয়ার বাজারে, stock exchangeএ ব্যবহার করে।

ব্যাঙ্ক প্রধানতঃ চারি বিভিন্ন উপায়ে ঋণ দিয়া থাকে। (১) Money at call and short notice—অর্থাৎ অত্যন্ত অল্প মেয়াদের জন্য দৈনন্দিন লেনদেনের মধ্যে ব্যাঙ্ক অল্প সুদে ঋণ দিয়া থাকে। এই ঋণ প্রধানতঃ দেওয়া হয় শেয়ার মার্কেটের কারবারী, Bill-Broker অথবা অন্য কোন কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে—যাহাদের অর্থের প্রয়োজন অত্যন্ত জরুরী, আবার যাহারা দুই চারিদিনের মধ্যে ঋণ শোধ করিয়া দিতে পারে। (২) ইহার চেয়ে কিয়ৎ পরিমাণ দীর্ঘমেয়াদে—১ মাস বা ঐরূপ সময়ের জন্য, কাঁচা মাল ক্রয় করা বা পণ্য বাজারজাত করার জন্য ব্যাঙ্ক ব্যবসায়িগণকে অর্থ অগ্রিম দিয়া থাকে। (৩) বাণিজ্যপত্র ক্রয় করিয়া অর্থ ঋণ দেওয়ার প্রথাও বহু প্রচলিত। একজন শিল্পপতি যখন পণ্য-ব্যবসায়ীকে পণ্য বিক্রয় করেন, ক্রেতা তখনই তাহার মূল্য দিতে পারে না। পণ্য বিক্রয় করিয়া তবে সে মূল্য শোধ করিবে। শিল্পপতির ইতিমধ্যেই অর্থের

প্রয়োজন। সে ক্রেতাকে দিয়া একটি বাণিজ্যপত্রে দস্তখৎ করিয়া লয়, এবং পত্রটি বিক্রয় করিয়া দেয়। ব্যাঙ্ক এই পত্রটি ক্রয় করে এবং নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর ব্যবসায়ীর নিকট অর্থ আদায় করিয়া লয়। অন্তর্বর্ত্তীকালীন সময়ে শিল্পপতিকে অর্থ দেওয়ার জন্য কমিশন স্বরূপ সে কিছু লাভ করে। (৪) তাহা ব্যতীত, সরকারী কাগজ, municipal bonds, প্রভৃতিতে স্থায়ীভাবেও অনেক সময়ে ব্যাঙ্ক কিছু পুঁজি নিয়োগ করে।

এই সকল স্থায়ী Security হইতে ব্যাঙ্ক যাহা মুনাফা করে তাহার হার অত্যন্ত অল্প। যেখানেই পুঁজির নিরাপত্তা বেশী, সেখানেই মুনাফার হার কম। ব্যাঙ্ক তাহার মোট অর্থের কিছু পরিমাণ এই সকল নিরাপদ স্থানে নিয়োগ করে, কারণ ইহাতে ব্যাঙ্কের প্রতি জনসাধারণের আস্থা এবং সম্মান বৃদ্ধি পায় এবং ব্যাঙ্কও তাহার একটি নির্দ্দিষ্ট আয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে। এমন কি জরুরী অর্থের প্রয়োজন হইলে ব্যাঙ্ক এই সকল Security বিক্রয় করিয়া দিয়া প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করিয়া লইতে পারে।

অর্থ ঋণ দেওয়া ব্যতীত অন্যান্য প্রয়োজনীয় কার্য্যও ব্যাঙ্ক করিয়া থাকে। কোন ব্যক্তির পক্ষে নিজের নিকট প্রচুর অর্থ না রাখিয়া ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখাই বেশী নিরাপদ। অথচ যাবতীয় ব্যয় সে করিতে পারে চেকের সাহায্যে। চেকগুলি অর্থের মতই বিনিময়ের যন্ত্রহিসাবে ব্যবহৃত হয়। এইরূপে বিনা খরচায় প্রচুর medium of exchange ব্যাঙ্ক কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া থাকে। জনসাধারণের মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি গচ্ছিত রাখা, বৈদেশিক লেনদেন সরল করিয়া দেওয়া, খরিদ্দারগণকে টাকার বাজার, পণ্যের বাজার, প্রভৃতি সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া—ইত্যাদি কার্য্যও ব্যাঙ্কের সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের একটি কার্য্য অত্যন্ত চমকপ্রদ। তাহারা প্রচুর পরিমাণে বাস্তব ভিত্তিশূন্য কাল্পনিক অর্থ, কাল্পনিক credit সৃজন করে—যাহার

দ্বারা অর্থের যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন হয়, অথচ যাহাকে অর্থ বলা যায় না। গচ্ছিত অর্থের উপর যখন জনসাধারণ চেক কাটে, তখন তাহার বাস্তব ভিত্তি থাকে। কিন্তু চেকের পিছনে অধিকাংশ সময়ে এই বাস্তব ভিত্তি থাকে না। ধরা যাক্ একটি ব্যাঙ্কে বস্তুতঃ গচ্ছিত আছে ১০০০৲। ৯জন ব্যবসায়ী আসিয়া প্রত্যেকে এই ব্যাঙ্কের নিকট ১০০০৲ ঋণ চাহিল। ব্যাঙ্ক তাহাদের প্রত্যেককেই ঋণ দিতে স্বীকৃত হইল। কিন্তু নগদ টাকা তাহাদের না দিয়া নিজের হিসাবের খাতায় তাহাদের প্রত্যেকের নামে ১০০০৲ টাকা জমা করিয়া লইল; এবং বলিয়া দিল—আপনারা আপনাদের সুবিধামতো চেকের সাহায্যে টাকা তুলিতে পারেন। ব্যবসায়ীগণের সমস্ত অর্থ একসঙ্গে তুলিবার প্রয়োজন হয় না। ব্যবসায় চালানোর জন্য, কাঁচা মালের মূল্য, শ্রমিকের মাহিনা, প্রভৃতি সকল প্রকার চাহিদা মিটাইবার জন্য তাহারা ব্যাঙ্কের এই কাল্পনিক গচ্ছিতের উপর চেক কাটিতে আরম্ভ করিল। যে সকল পাওনাদারের নিকট এই চেকগুলি গিয়া পড়িল, তাহারা তাহাদের নিজেদের ব্যাঙ্কে এইগুলি গচ্ছিত দিল। ফলে, দিনের পর দিন, এই ব্যাঙ্কের নিকট অন্যান্য ব্যাঙ্কের টাকা পাওনা হইতে লাগিল। কিন্তু কেবলমাত্র এই ব্যাঙ্কই এইরূপ করিয়াছে—তাহা নহে, প্রত্যেক ব্যাঙ্কই কাল্পনিক গচ্ছিত সৃষ্টি করে। অতএব এই প্রথম ব্যাঙ্কটির নিকট অন্যান্য ব্যাঙ্কের যেমন অর্থ পাওনা হইবে, অন্যান্য ব্যাঙ্কের নিকটও ইহার পাওনা জমিবে। প্রতিদিন clearing houseএ বসিয়া বিভিন্ন ব্যাঙ্কের এই পারস্পরিক পাওনা, তাহাদের মধ্যে কাটাকুটি, হিসাব-নিকাশ হইয়া অল্পই অবশিষ্ট থাকে। এই অবশিষ্ট অল্পটুকু নগদ অর্থের সাহায্যে পরিশোধ করা হয়। এককথায়—প্রতিটি ব্যাঙ্ক লক্ষ লক্ষ টাকার কাল্পনিক গচ্ছিত সৃষ্টি করে, এই কাল্পনিক গচ্ছিতের উপর অসংখ্য চেক কাটা হয়; চেকগুলির সাহায্যে পরস্পরের অধিকাংশ ঋণ শোধ হইয়া যায়—অবশিষ্টটুকু অর্থের সাহায্যে পরিশোধ হয়। এইরূপে একটি ব্যাঙ্কের ১০০০৲ টাকার নগদ গচ্ছিত থাকিলে, সে কমপক্ষে ১০,০০০৲ টাকার ব্যবসা করিয়া থাকে।

কমার্শির্য়াল ব্যাঙ্কের কার্য্যের তিনটি মূলগত নীতি আছে। প্রথম, কোন ব্যবসায় চালানোর জন্য স্থায়ীভাবে যে মূলধন প্রয়োজন, তাহা যোগাইতে যাওয়া কমার্শির্য়াল ব্যাঙ্কের উচিত নহে। দ্বিতীয়, শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থায়ীভাবে পুঁজি নিয়োগ করা উচিত নহে। তৃতীয় কখনও একটি বা দুইটিমাত্র ব্যবসায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে অগ্রিম দেওয়া উচিত নহে। কমার্শির্য়াল ব্যাঙ্কে সকল অর্থই অল্প মেয়াদে গচ্ছিত। গচ্ছিতকারীরা যখন ইচ্ছা অর্থ উঠাইয়া লইতে পারেন। এই অবস্থায় অল্প মেয়াদে গচ্ছিত অর্থ লইয়া দীর্ঘ মেয়াদে ঋণ দান চূড়ান্ত অযৌক্তিক। কারখানা স্থাপনে বা গৃহ নির্ম্মাণে পুঁজি নিয়োগ করিলে, সেই অর্থ অল্পসময়ের মধ্যে তুলিয়া লওয়া সম্ভব নয়। অতএব স্থায়ী মূলধন যোগানো কমার্শির্য়াল ব্যাঙ্কের কখনই উচিত নহে। তাছাড়া, ব্যাঙ্কের কর্ত্তব্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিজের অর্থ ছড়াইয়া রাখা—যাহাতে একটি ব্যবসায় ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইলেও ব্যাঙ্ক এই লোকসান অন্যত্র সামলাইয়া লইতে পারে। একটি প্রতিষ্ঠানের বিপদ যেন ব্যাঙ্ককে বিপন্ন না করে। এক কথায় ব্যাঙ্কের সর্ব্বপ্রথম লক্ষ্য liquidity—অর্থাৎ পাওনাদার চাহিবামাত্র অর্থ শোধ করিবার ক্ষমতা। ব্যাঙ্ক যদি এই শক্তি দেখাইতে পারে, তবেই সে জনসাধারণের বিশ্বাস অর্জ্জন করিতে পারিবে। বিশ্বাস ব্যাঙ্কের কারবারে বৃহত্তম মূলধন। Liquidity রক্ষার জন্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে Reserve রাখার প্রয়োজন। Reserveএর পরিমাণ নির্ণয় করা অত্যন্ত অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। Reserve বেশী হইলে, অকারণ লোকসান, কারণ এই টাকা খাটাইয়া যে লাভ হইত, তাহা বন্ধ হইয়া যায়। Reserve কম হইলে পাওনাদারের চাহিদা মিটানো যায় না। অতএব "The Reserve must be sufficient, without being excessive." ঠিকমত 'Reserve' রক্ষা করা ব্যতীত Liquidity রক্ষার জন্য ব্যাঙ্ককে আরও কতকগুলি কৌশল অবলম্বন করিতে হয়। আমরা দেখিয়াছি ব্যাঙ্ক বিভিন্ন উপায়ে এবং বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ দিয়া থাকে। এই সকল বিভিন্ন

মেয়াদের ঋণগুলিকে এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন প্রতিদিনই ব্যাঙ্ক কিছু পরিমাণে পুরাণো ঋণের কিস্তি আদায় করিতে, এবং নূতন ঋণ দিতে পারে। Mony at Call, অস্থায়ী Advance, প্রভৃতির পরিমাণ এমনভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে, যেন প্রয়োজন বোধ করিলেই ব্যাঙ্ক তাহা উদ্ধার করিতে পারে এবং পাওনাদারের ঋণ শোধ করিতে পারে।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মুনাফা, ইহার জন্যই সে গচ্ছিত সংগ্রহ করে, সৃষ্টি করে, ঋণ দেয়, বাণিজ্যপত্র ক্রয় করে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের লক্ষ্য বৃহত্তর। ১৯১৪-১৮ মহাযুদ্ধের পর পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশে ব্যবসায় নষ্ট হওয়া, ব্যাঙ্ক উঠিয়া যাওয়া প্রাত্যহিক ঘটনা হইয়া দাঁড়াইল। দেশের অর্থনৈতিক জীবন unstable হইয়া উঠিল। এই অবস্থার প্রতীকারকল্পেই যেন প্রচুর শক্তি এবং ততোধিক সম্মান লইয়া কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আবির্ভূত হইল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া দেশের যাবতীয় মুদ্রানৈতিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক কেবল সকল ব্যাঙ্কের অভিভাবক নহে; টাকার বাজার, মুদ্রানীতি, এমন কী সরকারী অর্থনীতিরও পরিচালক।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সংগঠন বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকারের। কোনদেশে ইহা রাষ্ট্রের সম্পত্তি এবং রাষ্ট্রকর্তৃক পরিচালিত। কোন দেশে ইহা অংশীদারদের সম্পত্তি এবং তাহাদের দ্বারা পরিচালিত। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের পরিচালকবৃন্দ কোথাও সরকার-মনোনীত, কোথাও অংশীদার-নির্ব্বাচিত—কোথাও দুইটি প্রথাই মিশ্রিত। অবশ্য প্রত্যেক কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উপর সরকারী প্রভাব খুব বেশী পরিলক্ষিত হয়। আর তাহা স্বাভাবিকও বটে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনে যাহার প্রভাব এত বেশী, তাহার নীতি নির্দ্ধারণে সরকার যে কিছুটা অংশ গ্রহণ করিবে তাহা অন্যায়ও নহে, অস্বাভাবিকও নহে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মুনাফা নহে। দেশের টাকার বাজার, credit machinery এবং মূল্য নিরূপণের উপর অভিভাবকত্ব

করাই ইহার প্রধান কার্য্য—যাহাতে দেশে মূল্যস্তরের ক্ষতিকর হ্রাস-বৃদ্ধি না হয়, বৈদেশিক বিনিময়-হার স্থির থাকে, মুনাফা অযথা বৃদ্ধি না পায়, অথবা বেকার সমস্যা তীব্র আকার ধারণ না করে এবং বাণিজ্যের গতি সুস্থ সতেজ থাকে। এই সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অনেকগুলি কার্য্য করিতে হয়। মুদ্রানীতি নির্দ্ধারণ করা, নোট প্রকাশ করা, দেশে মোট অর্থের পরিমাণ নির্ণয় করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রথম কার্য্য। এই যে নোট বাহির করিয়া মুদ্রার পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করা, ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হইবে; অতিরিক্ত নোট এবং মুদ্রা বাহির করিলে, দেশে মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়; অত্যল্প মুদ্রা বাহির করিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি রুদ্ধ হয়। অতএব নোটের পরিমাণ ঠিক করা অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিচার সাপেক্ষ। ব্যবসা-বাণিজ্য সুশৃঙ্খলভাবে চলার জন্য ঠিক যে পরিমাণ মুদ্রার প্রয়োজন, তাহা হিসাব করিয়া ঠিক করা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য। দেশের সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত এবং অর্থনৈতিক কাঠামোর সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজন হইযা দাঁড়ায়। সমস্ত সাধারণ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্ক হিসাবে কার্য্যও ইহাকে করিতে হয়। জনসাধারণ যেমন সাধারণ ব্যাঙ্কে টাকা গচ্ছিত রাখে, সমস্ত সাধারণ ব্যাঙ্কও তেমন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে টাকা রাখে—এই উদ্দেশ্যে যে, প্রয়োজনের সময়ে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তাহাদের অনেক টাকা অগ্রিম দিতে পারিবে। একটি কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক নষ্ট হইলে, ক্ষতি শুধু ইহার নহে; সমস্ত দেশের ক্ষতি। Bank-failure অত্যন্ত সংক্রামক ব্যাধির মতো বিস্তৃতি লাভ করে। তাই কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক যখন টাকার চাহিদা মিটাইতে না পারিয়া বিপন্ন হয়, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক তখন তাহাকে অগ্রিম দিয়া রক্ষা করে। অপরদিকে, ঋণদান, পুঁজি নিয়োগ ব্যাপারে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ককে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক-প্রবর্ত্তিত আইন মানিয়া চলিতে হয়।

প্রতি দেশের সরকারকে শাসনতান্ত্রিক নানাবিধ কার্য্যের জন্য অর্থ ব্যয় করিতে হয়, একস্থান হইতে অন্যস্থানে অর্থ পাঠাইতে হয়, জনসাধারণের সহিত

অর্থের লেনদেন করিতে হয়। এই সকল ব্যাপারে সরকারের যাবতীয় ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত কার্য্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া হয়। যে দেশে স্বর্ণমান প্রচলিত, সেখানে তাহা রক্ষা করা, নির্দ্ধারিত মূল্যে স্বর্ণ ক্রয়-বিক্রয় করিয়া মুদ্রার সহিত স্বর্ণের, দেশীয় মুদ্রার সহিত বিদেশী মুদ্রার নির্দ্দিষ্ট সম্বন্ধ রক্ষা করা, ইত্যাদি কার্য্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। স্বর্ণমান যখন নাই, তখনও দেশীয় এবং বৈদেশিক মূল্যান্তরের পরিপ্রেক্ষিতে বিনিময়-হার নির্ণয় করা এবং চালু রাখা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ব্যতীত আর কেহ করিতে পারে না।

দেশের মধ্যে বাণিজ্য-চক্র রোধ করা, ইহার কুফলগুলির গুরুত্ব লাঘব করা—তাহাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের দায়িত্ব। বাণিজ্য-স্ফীতি বন্ধ করিবার জন্য অর্থ এবং creditএর পরিমাণ কমানো প্রয়োজন। সুদের হার বৃদ্ধি করিয়া এবং share marketএ security বিক্রয় করিয়া টাকার বাজার হইতে টাকা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক টানিয়া লয়। বাণিজ্য মন্দার সময়ে সুদের হার কমাইয়া দিয়া, security ক্রয় করিয়া টাকার বাজারে অনেক বেশী টাকা ছাড়িয়া দেওয়া হয়, বাজার মন্দা মন্দীভূত হয়।

কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের ব্যবসার যেমন কতকগুলি নীতি আছে, কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কেরও সেইরূপ কতকগুলি নীতি আছে। কিন্তু যেহেতু কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য হইতেছে দেশের সর্ব্বাঙ্গীণ অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সমৃদ্ধি, সেই হেতুই ইহার নীতিগুলি আজিও সঠিক নির্দ্ধারিত হয় নাই। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সকল কার্য্য এবং দেশের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান প্রায় একার্থবোধক শব্দ হইয়া গিয়াছে। ইতিহাসের সাক্ষ্য লইয়া বলিতে পারা যায়, কোন কোন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক আশাতীত সাফল্যলাভ করিয়াছে—কিন্তু তাহাতে ইহার দায়িত্ব কমে নাই। ভবিষ্যতে সকল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্যের সহিত জড়িত থাকিবে—অতএব সমস্ত সমস্যার সমাধানগুলি না খুঁজিয়া এককভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতি নির্দ্ধারিত করা যায় না। অর্থনৈতিক সকল সমস্যার সমাধান যে উপায়ে হইবে, তাহারই উপর নির্ভর করিবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক

পরিচালনায় কোন্ নীতি নির্দ্ধারিত হইবে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যদি টিকিয়া থাকে, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য একরূপ হইবে। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কার্য্য অন্যরূপ হইবে। ধনতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংগ্রাম যখন চলিতেছে, কোন্‌টির প্রতিষ্ঠা স্থায়ী হইবে, সেই সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান এবং বিশ্বাস যখন নাই, তখন কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের নীতিও নির্ভুলভাবে বা স্থায়ীভাবে বলা যায় না।

ভারতের যানবাহন

কোন একটি নূতন সহর বা নগরে যখন আমরা প্রবেশ করি তখনই সেই নগর বৃহৎ কি ক্ষুদ্র, ব্যবসায়প্রধান কি শিল্পপ্রধান, বাসের যোগ্য কি বাসের অযোগ্য এই সমস্ত প্রশ্নের কিছুটা উত্তর আমরা পাই সেই স্থানের পথঘাট দেখিয়া। যে কোন দেশের পক্ষেই ইহা সত্য। ভারতবর্ষে বা আরব দেশে যখন আমরা দেখি রেললাইন অনুন্নত, রাজপথ অপ্রচুর, জলপথ প্রয়োজনের তুলনায় অল্প—তখনই এই সিদ্ধান্তে আমরা আসিতে পারি—এই দুই দেশের অর্থনৈতিক জীবন দুরবস্থাপন্ন, শিল্প-বাণিজ্য প্রয়োজনের তুলনায় নাই, জনসাধারণ দারিদ্র্যের নিম্নস্তরে। অপর দিকে জার্ম্মাণী বা ইংলণ্ডে যখন আমরা দেখি, রাজপথ, রেলপথ, জলপথ, আকাশপথ সমৃদ্ধ, উন্নত এবং প্রচুর, তখন এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত নয় যে সেই স্থানের অর্থনৈতিক বনিয়াদ্ সুদৃঢ়, জনসাধারণের অবস্থা স্বচ্ছল, শাসন-পদ্ধতি সুষ্ঠু। যে কোন দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক, শাসনতান্ত্রিক, এমন কি সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি এবং উৎকর্ষের ব্যারোমিটার হইতেছে সেই দেশের যানবাহন।

ভারত হইতেছে একটি উপমহাদেশ। কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, করাচী

হইতে আসাম—দূরত্বে, প্রাকৃতিক বিভিন্নতায় ও আবহাওয়ার তারতম্যে মনে ভীতি এবং বিস্ময়ের উদ্রেক করে। আয়তনের এই বিশালত্বের সঙ্গে যোগ দিয়াছে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে ওলোট-পালোট, ভারতের ঐতিহাসিক কর্ম্মবিমুখতা, স্বল্প-প্রসারী জীবন—এবং এই সকল কারণে ভারতের যান-বাহনের ব্যবস্থা অত্যন্ত অনুন্নত ও অপ্রচুর। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতে কোন রেলপথ ছিল না, রাজপথের মধ্যে ছিল মোগল সম্রাটদের দু'একটি আন্তঃপ্রাদেশিক পথ (গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড) এবং গরুর গাড়ী যাইবার জন্য কতকগুলি স্বরচিত সঙ্কীর্ণ গলি। উত্তর ভারতের সিন্ধু গঙ্গা প্রভৃতি নদী স্বভাবতঃ নৌচালনার উপযোগী, কিন্তু মানুষের চেষ্টায় কোন জলপথ গড়িয়া উঠে নাই। উত্তর ভারতের এই অবস্থা—দক্ষিণ ভারতের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়। মালভূমির প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক এবং পার্ব্বত্য নদীর পরিবর্ত্তনশীল জলধারার জন্য কোন উল্লেখযোগ্য যানবাহনের ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। ভারতীয় জনসাধারণের ঐতিহাসিক দারিদ্র্য, পৌনঃপুনিক দুর্ভিক্ষ এবং ক্ষুদ্র গণ্ডীবদ্ধ জীবন—যানবাহনের এই স্বল্পতার ফল।

ভারতে বর্ত্তমানে যে যানবাহনের ব্যবস্থা আছে তাহা প্রধানতঃ গত ১০০ বৎসরের মধ্যেই প্রস্তুত হইয়াছে। আমরা আমাদের আলোচনার সুবিধার জন্য রেলপথ, রাজপথ, জলপথ, আকাশপথ—যানবাহনকে এই চারি ভাগে ভাগ করিয়া লইব।

বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাজপথ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। ডালহৌসীর সময় হইতে সরকার রাজপথ নির্ম্মাণে তৎপর হইয়াছেন। Public Works Department নামক বিশেষ সরকারী সংগঠনের সাহায্যে পথ নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতেছে। বর্ত্তমানে ভারতে সর্ব্বসমেত ৩ লক্ষ মাইল রাজপথ আছে—তন্মধ্যে ৮২ হাজার মাইল পাকা রাস্তা (metalled) এবং অবশিষ্ট কাঁচা রাস্তা। ৪টি দীর্ঘ আন্তঃপ্রাদেশিক পথ আছে—গ্র্যাণ্ডট্রাঙ্ক রোড (কলিকাতা হইতে পেশোয়ার), বম্বে-দিল্লী রোড, মাদ্রাজ-

বম্বে রোড এবং মাদ্রাজ-কলিকাতা রোড। পূর্ব্বের তুলনায় এই পরিমাণ পথ উল্লেখযোগ্য হইলেও, ভারতের প্রয়োজনের তুলনায় ইহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।

ভারতে যে আরও অনেক বেশী রাজপথ প্রয়োজন এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। বর্ত্তমানে ভারতে আভ্যন্তরীণ ব্যবসার পরিমাণ বিশাল। ভবিষ্যতে ইহা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই ব্যবসায়কে ঠিকমত পরিচালিত করিতে হইলে প্রতি গ্রাম হইতে সহরে এবং সহর হইতে বন্দরগুলিতে অনেক প্রশস্ত রাজপথের প্রয়োজন। গ্রামের শস্য বিক্রয় হয় না, আর সহরের লোক আহার পায় না,—এইরূপ দৃষ্টান্ত আজিও বিরল নয়। শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবে গ্রামবাসিগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হইতে পারে না—আর সহরের বাজারে সেইগুলি অবিক্রীত পড়িয়া থাকে। উপযুক্ত পথের অভাবে গ্রাম হইতে সহর বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্যই এই অসামঞ্জস্য। কৃষিজাত দ্রব্যের যথাযথ মূল্য কৃষকগণ পায় না পথের অভাবেই। আড়ৎদার, ঠিকাদার, মহাজন কৃষকগণকে শোষণ করিতে পারে—উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে কৃষকগণ নিজেরা সহরে আসিয়া বিক্রয় করিতে পারে না বলিয়া। কৃষির উন্নতির জন্য আরও রাজপথের প্রয়োজন; গ্রামবাসীর জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য আভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসায় প্রসারের জন্য, শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণের জন্য, ধনবৈষম্য কমাইবার জন্য, এমন কি শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্যও আরও রাজপথ প্রয়োজন।

অনেকের ধারণা রাজপথ নাকি রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই ধারণা অত্যন্ত ভ্রান্ত। রাজপথ রেলপথের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সম্পূরক বা feeder. রাজপথ প্রচুর না থাকিলে রেলপথ সমৃদ্ধ হইতে পারে না। গ্রামের অন্তঃপুর হইতে যাত্রী এবং দ্রব্যসম্ভার আনয়ন করার জন্যই রাজপথের প্রয়োজন—সেই যাত্রী এবং দ্রব্যসম্ভার রাজপথে বাহিত হইয়া আসিয়া রেলপথের সাহায্যে অন্যান্য দেশে চলিয়া যায়। রাজপথের উন্নতির জন্য ১৯২৭ সালে সরকার Road Development Board স্থাপন করেন। কিন্তু এই কাজে যে অর্থ

পরিকল্পনা ও চেষ্টার প্রয়োজন, তাহার তুলনায় সরকারী চেষ্টা হাস্যকর ভাবে অপ্রচুর।

ভারতে রেলপথ প্রথম প্রস্তুত হয় সামরিক প্রয়োজনে। সিপাহী বিদ্রোহের পর সরকার ভারতকে ঐক্যবদ্ধ কেন্দ্রীয় শাসনযন্ত্রের মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে সৈন্যাপসরণের জন্য সরকারের উদ্যোগে, উৎসাহে এবং সাহায্যে রেলপথ প্রথম নির্ম্মিত হয়। ইহার পরে অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে ব্যবসায়ী কোম্পানী মুনাকার জন্য নিজের উদ্যোগে রেলপথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বর্ত্তমানে ভারতে E. I. Ry, B. N. Ry., B. A. Ry., G. I. P. Ry., B. N. W. Ry., S. I. Ry., প্রভৃতি ১১টি প্রশস্ত লাইনের রেলপথ আছে। ইহা ব্যতীত সঙ্কীর্ণ লাইনের (metre gauge) অনেকগুলি রেলপথ আছে।

বিভিন্ন রেলপথগুলির সহিত সরকারের সম্পর্ক বিভিন্ন ধরণের: চারটি রেলপথের মালিক এবং কর্ম্মকর্ত্তা সরকারে নিজে, পাঁচটি রেলপথের মালিক সরকার, কিন্তু ইহাদের পরিচালনা করেন সরকারের তত্ত্বাবধানে থাকিয়া ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানগুলি। ইহার বিনিময়ে তাহারা সরকারের নিকট নির্দ্ধারিত হারে সুদ পাইয়া থাকেন। দুইটি বৃহৎ রেলপথ কোম্পানীর স্বত্বে এবং কর্ত্তৃত্বে পরিচালিত হয়। এই বিভিন্ন ধরণের কর্ত্তৃত্ব এবং পরিচালনার কারণ আমরা দেখিতে পাই ভারতীয় রেলপথের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে। প্রথমে Guarantee system' (১৮৪৪-৬৯); তারপর সরকার কর্ত্তৃক সক্রিয় সম্প্রসারণ এবং কর্ত্তৃত্ব (১৮৬৯-৭৯), পুনর্ব্বার Guarantee System (১৮৭৯-১৯০০); তারপর রেলপথের দ্রুত প্রসার এবং সমৃদ্ধি এবং রেলপথ হইতে মুনাফার আরম্ভ (১৯০০-১৯১৪), যুদ্ধের চাপে রেলপথের অবনতি (১৯১৪-২১) এবং সর্ব্বশেষে Acworth Committeeর নিয়োগ এবং সরকারী তত্ত্বাবধান। ১৯৩৭ সালে সর্ব্বসমেত ৪৩ হাজার মাইল রেলপথের মধ্যে ৩১ হাজার সরকারের স্বত্বাধিকারে, এবং অবশিষ্ট কোম্পানীর মালিকানায় ছিল। ইহাদের

মধ্যে ১৯ হাজার মাইল সরকারের নিজস্ব দায়িত্বে পরিচালিত এবং অবশিষ্ট কোম্পানী দ্বারা পরিচালিত। ১৯৩৭ সালের পর হইতে আরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে; বর্ত্তমানে সরকারী কর্ত্তৃত্বে এবং মালিকানায় রেলপথের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে।

রেলপথ সামরিক প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠিত হইলেও, ইহার বাণিজ্যিক মূল্য অসীম। শিল্প-সভ্যতা রেলপথ গড়িয়াছে, এবং রেলপথ শিল্প-সভ্যতা গড়িয়াছে—ইহা অন্য দেশের মত ভারতের ক্ষেত্রেও বর্ণে বর্ণে সত্য। বিচ্ছিন্ন স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম্য অর্থনীতিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া, সমস্ত দেশকে একটিমাত্র অর্থনৈতিক সূত্রে আবদ্ধ করা, একস্থান হইতে অন্যস্থানে মূল্যের তারতম্য দূর করা, প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে খাদ্যশস্য বহন করিয়া আনিয়া দুর্ভিক্ষ রোধ করা, প্রতি প্রদেশে ব্যবসা-কেন্দ্ররূপে কতকগুলি ঘনবসতিপূর্ণ সহর গড়িয়া তোলা, বিভিন্ন জেলা এবং প্রদেশগুলিকে নিকটবর্ত্তী করা, ভাবে ভাষায়, আচার ব্যবহারে, আদর্শে উদ্দীপনায় জনসাধারণের মধ্যে আত্মীয়তা সৃষ্টি করা, সর্ব্বোপরি ভারতে একত্বের ধারণা সৃষ্টি—রেলপথের যুগান্তকারী কীর্ত্তি।

ভারতে রেলপথের পরিচালনা অনেক সময়ে ভারতবাসীর ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। বিদেশী মালিকদের ভারতবিরোধী নীতির জন্য, ভারতীয় যুবক উপযুক্ত চাকুরী পায় নাই, ভারতীয় শিল্পোন্নতি এবং ব্যবসা ব্যাহত হইয়াছে; ভারতীয় যাত্রী—সাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা দুর্দ্দশাকে অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। অতএব ভারতীয়দের দীর্ঘকালের দাবী—রেলপথকে সরকারের পূর্ণ কর্ত্তৃত্বে আনয়ন করা হউক। ভারতীয়দের হস্তে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রথম কার্য্য হইবে রেলপথকে জনসাধারণের সম্পত্তিতে পরিণত করা। অর্থ নৈতিক প্রয়োজনীয়তার দিক হইতে ভারতে অনেক বেশী রেলপথ হওয়ার প্রয়োজন। ইহা ব্যতীত, গতিবেগ বৃদ্ধি, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সুবিধা প্রসার, প্রভৃতি অনেক উন্নতির

প্রয়োজন। ১৯৪৪ সালে রেলপথ হইতে ভারত সরকারের ৩৮ কোটি টাকা মুনাফা দাঁড়াইয়াছিল। রেলপথের মত জনসাধারণের অতি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানকে (Public utility Service) লাভের ব্যবসা না করিয়া যাত্রীদিগের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি এবং ভাড়া হ্রাসের দিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ভারতীয় জলপথকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—আভ্যন্তরীণ জলপথ এবং সামুদ্রিক জলপথ। ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের তুলনায় ভারতীয় নদীগুলি নৌচালনার পক্ষে খুব অনুকূল নহে। উত্তর ভারতে ব্রহ্মপুত্র, গঙ্গা, সিন্ধু এবং ইহাদের উপনদীগুলি নৌযানোপযোগী। দাক্ষিণাত্যের পার্ব্বত্য নদীগুলি এই বিষয়ে সম্পূর্ণ অনুপযোগী। নৌযান-উপযোগী জলপথ ভারতে ২৬০০০ মাইল আছে। রেলপথ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে আভ্যন্তরীণ জলপথের সাহায্যেই ভারতীয় ব্যবসা প্রধানভাবে পরিচালিত হইত। মৌর্য্য সাম্রাজ্য এবং মোগল সাম্রাজ্যের সময়ে গঙ্গা, সিন্ধুর বক্ষের উপর দিয়া বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য পোত যাতাযাত করিত এবং গঙ্গা ও সিন্ধুর দুই পার্শ্বে সমৃদ্ধিশালী নগর গড়িয়া উঠিয়াছিল। রেলপথের প্রতিযোগিতায় টিকিতে না পারিয়া এই সমস্ত জলপথগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছিল। বর্ত্তমানেও পূর্ব্ববঙ্গ উত্তর বিহার, মাদ্রাজের পূর্ব্ব উপকূল প্রভৃতি স্থানে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য জলপথ আছে। জলপথগুলি উন্নত করিবার চিন্তা (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিষ্ফল) মধ্যে মধ্যে সরকার বা বেসরকারী মহলে দেখা যায়। নদীপথ-গুলিকে উন্নত করিবার প্রয়োজন আছে। রেলপথের উপর অতিরিক্ত চাপ হ্রাস করিবার জন্য, সুদূর পল্লীগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এবং রেলপথের অনুপযোগী নদীবহুল স্থানগুলিকে যানবাহনের সুবিধা দিবার জন্য নদীপথের প্রসারের প্রয়োজন।

সামুদ্রিক জলপথ বিষয়ে ভারতের প্রাকৃতিক সুবিধা উল্লেখযোগ্য। "A Country like a pendant with a coast-line of 4,003 miles" প্রাচীন ভারতে এবং মোগল সাম্রাজ্যে এই দীর্ঘ উপকূলের কিয়ৎ পরিমাণ

সদ্‌ব্যবহার করা হইত। সেই সময়ে ভারতে নির্ম্মিত অর্ণবপোতগুলি "are greatly superior to the oaken walls of Old England" কিন্তু লৌহনির্ম্মিত জাহাজের ব্যবহার প্রচলিত হওয়ার পর ভারতীয় জাহাজগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা হ্রাস পায়। ১৯২৯ সালে ভারতের Seaborne tradeএর ৬৫০ কোটি টাকার মধ্যে মাত্র শতকরা ২ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলির দ্বারা বাহিত হইত। জাহাজ কোম্পানীগুলির বাৎসরিক ৫৭ কোটি টাকা আয়ের মধ্যে ভারতীয় অংশ কিছুই ছিল না বলিলেই হয়। ভারতের আন্তর্জাতিক ব্যবসা প্রধানতঃ বৃটিশ জাহাজগুলির দ্বারা বাহিত হয়। বৃটিশ কোম্পানীগুলি নানা উপায় অবলম্বন করিয়া তাহাদের এই প্রাধান্য বজায় রাখিয়াছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্যগণ মধ্যে মধ্যে এই অসামঞ্জস্য দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু সরকারী ঔদাসীন্যে ইহা সম্ভব হয় নাই।

আকাশপথ ভারতে অত্যন্ত সম্প্রতি খোলা হইয়াছে। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী এবং রাজকর্ম্মচারীদের গমনাগমনের জন্য এবং চিঠিপত্র লইয়া যাওয়ার জন্যই প্রথম আকাশপথ খোলা আরম্ভ হয়। সর্ব্বপ্রথম দিল্লী হইতে কলিকাতা, বম্বে, করাচী, প্রভৃতি আকাশ পথগুলি ব্যবহৃত হয়। এই যুদ্ধের তাগিদে আকাশপথ অনেকখানি বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রথমদিকে প্রধানতঃ সরকারী চেষ্টায় আকাশ পথগুলি আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু তারপর উদ্যোগী ব্যবসায়ীগণ বিশেষতঃ R. D. Tata দু' একটি আকাশপথ ব্যবসায় হিসাবে খুলিয়াছেন। বর্ত্তমানে Air Mail Serviceএর জন্য এবং জনসাধারণের গমনাগমনের জন্য ৬টি আকাশপথ আছে—দিল্লী-বম্বে, কলিকাতা-করাচী, পেশোয়ার-কলম্বো, কলিকাতা-বম্বে, কলম্বো-রাঁচী, করাচী-কলম্বো। বর্ত্তমানে ভারতে আকাশপথ যে পর্য্যায়ে আছে, তাহাতে অতিশয় ধনী ব্যক্তি ব্যতীত কেহ ইহার সুবিধা গ্রহণ করিতে পারে না। ইউরোপে কিন্তু মধ্যবিত্তরা পর্যন্ত দ্রুত গমনাগমনের জন্য ব্যোমযানের সুবিধা গ্রহণ করে। ব্যবসার জন্যও ভারতীয় আকাশপথ বিশেষ কোন কার্য্য করে না। কিন্তু

ব্যবসাক্ষেত্রে আকাশ পথের সম্ভাবনীয়তা অসীম। একটি সামান্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মৎস্যের অভাব আমাদের দেশে সর্ব্বত্র কিন্তু এরোপ্লেনের সাহায্যে সমুদ্র হইতে মৎস্য ধরিয়া ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাহা যে কেবলমাত্র একটি অত্যন্ত লাভের ব্যবসাই হইবে তাহা নহে আমাদের দেশে স্বাস্থ্যকর খাদ্যের অভাবের সমস্যার অনেকখানি লাঘব করিবে। আকাশপথের সাহায্যে দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ২০০০ মাইল বিশাল আয়তন সঙ্কুচিত হইয়া একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে।

সম্প্রতি যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কথা চারিদিকে শোনা যাইতেছে। কিন্তু যে স্তম্ভের উপর নির্ভর করিয়া শিল্পোন্নতির প্রাসাদ গড়িয়া উঠিবে, তাহা হইতেছে উন্নততর যানবাহন। ইহা ব্যতিরেকে কোন শিল্প পুনর্গঠন সম্ভব নয়। ভারতে আরও অনেক রাজপথ চাই; প্রচুর রেলপথ চাই; উন্নত জলপথ চাই, বহুলভাবে আকাশপথ চাই। ইহা ভারতের শিল্পোন্নতির প্রধান সহায় হইবে, এবং যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার উল্লেখযোগ্যরূপে সমাধান করিবে।

দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা

পদ্মানদী কীর্ত্তিনাশা বা রাক্ষসী নামে ইতিহাসে বিখ্যাত। ধ্বংসের মাপকাঠিতে দামোদর নদ পদ্মার পরেই উল্লেখযোগ্য। বিরাট সর্ব্বধ্বংসী বন্যা দামোদরে তিনবার হইয়া গিয়াছে—১৯১৩, ১৯১৯, ১৯৪৪ সালে। অসংখ্য নরনারীর জীবন নষ্ট করিয়া এই সকল বন্যা সরকার এবং জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এই সকল প্রবল বন্যা ব্যতীত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্যা প্রায় প্রতি বৎসরই দামোদরে দেখা দেয় এবং স্থানে স্থানে ক্ষয়ক্ষতিও তাহা দ্বারা

যথেষ্ট হয়—বর্দ্ধমান, হুগলী, হাওড়ার অধিবাসীরা এই কথা মর্ম্মে মর্ম্মে জানেন। কিন্তু বন্যার প্রতিকারের জন্য উল্লেখযোগ্য কিছু করা হয় নাই। শুধু তাই নয়—দামোদরের অববাহিকা ভারতের অন্যতম অতি প্রয়োজনীয় স্থলভাগ। ইহারই উপর ঝরিয়া, বোকারো, রাণীগঞ্জ, গিরিডি এবং রামগড়ের প্রধান কয়লাক্ষেত্রগুলি অবস্থিত। ইহারই ভিতর দিয়া বি. এন. আর্ লাইন, কর্ড লাইন, এইচ্. বি. কর্ড, লুপ লাইন, ই. আই. আর্. চলিয়া গিয়াছে এবং গ্র্যাণ্ড ট্রাংক রোড এবং উত্তর ভারতের সহিত ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র কলিকাতার সংযোগ রক্ষা করিতেছে।

প্রশ্ন হয়, এতখানি গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও এই বাৎসরিক বিপদের প্রতিকার কেন হয় না। মানুষের চেষ্টায় এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের সমাধান কি সম্ভব নয়, না সমাধান করার জন্য কোন সুসংবদ্ধ চেষ্টা হয় নাই? এই প্রশ্নের উত্তরই আমাদের আলোচ্য বিষয়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন, দামোদরের অববাহিকার উপরিভাগ কয়লাখনির এলাকায় অবস্থিত এবং কয়লাখনির মালিকেরা শ্বেতাঙ্গ বণিক। বৈজ্ঞানিকরা দেখাইয়াছেন যে, সমস্যার সমাধান করিতে হইলে দামোদরের অববাহিকার উপরিস্থিত অংশে কতকগুলি বাঁধ বাঁধিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কোন পরিকল্পনায় খনির মালিকগণকে রাজী করান সম্ভব হয় নাই এবং কেবল এই কারণেই এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ কার্য্যটি এতদিন অসম্পন্ন হইয়া আছে।

বারিপ্রবাহ বিশেষ করিয়া গতিশীল প্রবাহ মানুষের প্রতি প্রকৃতির আশীর্ব্বাদস্বরূপ। কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারিলে এই বারিপ্রবাহ হইতে মানুষ অসীম উপকার পাইতে পারে। দামোদরের মধ্য দিয়া বিশাল পরিমাণ বারি প্রতিনিয়ত সমুদ্রে পড়িতেছে; ইহা হইতে মানুষ কোন উপকার পাইতেছে না, উপরন্তু মধ্যে মধ্যে ইহা মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতেছে। আমেরিকা বা রাশিয়ায়, আমরা জানি, প্রাকৃতিক নদীগুলিকে বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সাহায্যে কত রকম প্রয়োজনীয় কার্য্যে নিয়োগ করা হইতেছে।

দামোদরেও এইরূপ একটি পরিকল্পনা স্থির করিয়া কার্য্যকরী করিবার চেষ্টা হইতেছে। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এই পরিকল্পনার কথা চিন্তা করা হইতেছে। ১৮৬৩ সালে Lt. Garhault দামোদর নদীতে বাঁধ বাঁধিবার পরিকল্পনা দেন। ১৯১৩ সালের ধ্বংসাত্মক বন্যার পর সরকার Mr. B. L. Subrawal, Mr. Adams Williams, এবং পরে Mr. Glassকে নিযুক্ত করেন, দামোদরের বন্যার বৈজ্ঞানিক সমাধান কি হইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করিবার জন্য। তাঁহারা দামোদরের উৎস এবং অববাহিকা বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। এই পরিকল্পনাটি আমেরিকার Tennesse Valley বাঁধগুলির অনুকরণে রচিত হইয়াছে। তাঁহাদের সেই পরিকল্পনাটিই ক্ষুদ্রাকারে আমাদের প্রবন্ধে দেওয়া হইল।

দামোদরের প্রকৃত সমস্যাটি অনুধাবন করিতে হইলে আমাদের মনে রাখিতে হইবে ইহা হইতেছে একটি পার্ব্বত্য নদ। গঙ্গা, যমুনা বা সিন্ধুর মত বৎসরের সর্ব্ব সময়ে ইহা সমান জলপূর্ণ থাকে না। বৎসরের মধ্যে সাত মাস ইহা শীর্ণকায় থাকে এবং এজন্য ইহা হইতে জলসেচন বা নৌচালনা বিষয়ে কোন উপকার পাওয়া যায় না। কিন্তু বর্ষার সময়ে ছোটনাগপুর পাহাড় অঞ্চলে প্রচুর বারিপাতের ফলে দামোদরের উপরিস্থিত অববাহিকায় অকস্মাৎ বিপুল পরিমাণ জল আসিয়া উপস্থিত হয়। এই পরিমাণ জল নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া লইয়া যাইবার মতো প্রশস্ত ও গভীর নদীগর্ভ দামোদরের নাই। বাহিরে যাইবার স্বাভাবিক পথ না পাইয়া ঐ জল বন্যা হইয়া যায়, পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম নগর ভাসাইয়া হাওড়া জেলার রূপনারায়ণ নদীতে গিয়া পতিত হয়। বর্ষার সময় আকস্মিক প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস সমস্ত বিপদের মূল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে বৎসরে দামোদরের মধ্য দিয়া মোট ২৪০ লক্ষ একর ফিট্ (এক acre ft. = ১০ লক্ষ cubic ft.) পরিমাণ জল বহিয়া যায়। ইহার সহিত নদীর ধারণ-শক্তির তুলনা করিয়া দেখা যায় বৎসরে গড়ে রাণীগঞ্জের নিকট ১৭০০০ সুক্লেকের প্রবাহ বজায় থাকে। কিন্তু এই প্রবাহ সমস্ত বৎসরে

সমান থাকে না। বর্ষার পাঁচমাসে গড় প্রবাহ হয় ৩০,০০০ সুজেক এবং অবশিষ্ট সাতমাসে গড় প্রবাহ থাকে ১৬০০ সুজেক। সমস্যার সমাধান করিতে হইলে এই পরিবর্ত্তনশীল বারিপ্রবাহকে রোধ করিতে হইবে; বর্ষার সময়ে অতিরিক্ত জল বাঁধ বাঁধিয়া রুখিতে হইবে; জলাধার প্রস্তুত করিয়া মজুত করিতে হইবে এবং সমস্ত বৎসর ধরিয়া একটি অপরিবর্ত্তনীয় গতিবেগ রক্ষা করিতে হইবে।

আকস্মিক জল-স্ফীতি দূর করিয়া অপরিবর্ত্তনীয় বারিপ্রবাহ রক্ষা করিতে পারিলে অনেকগুলি কার্য্য এক সঙ্গে হইবে; প্রথমত আকস্মিক জলবৃদ্ধির জন্য যে বন্যা তাহা বন্ধ হইবে। দ্বিতীয়তঃ—সমস্ত বৎসর সমান প্রবাহ রক্ষিত হওয়ার জন্য, নদীটি বহুলাংশে নৌচালনার উপযোগী হইবে। তৃতীয়তঃ, গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হইলে গ্রীষ্মকালে নদী শীর্ণকায় হইবে না এবং কৃষিকার্য্যের জন্য জলসেচনের সুবিধা হইবে। চতুর্থতঃ, এই পরিকল্পনার সাহায্যে ভারতের মধ্যে বিশালতম বিদ্যুৎ-উৎপাদন-কেন্দ্র নির্ম্মিত হইতে পারে। বর্ত্তমানে বিশাল বারিপ্রবাহ উচ্চ হইতে নীচে নামিয়া আসে, এতখানি শক্তির অপচয় হইয়া যায়, কিন্তু এই গতিবেগ কার্য্যে নিয়োগ করিয়া আমরা যে কি পরিমাণ শক্তি উৎপাদন করিতে পারি, তাহা কল্পনার অতীত। অববাহিকার উপর হইতে বারিপ্রবাহ নামিয়া আসিবার সময়ে যে পরিমাণ শক্তির অপচয় হয়, তাহা হিসাব করা দুষ্কর। অববাহিকার গড় উচ্চতা, বারিপ্রবাহের পরিমাণ এবং গতিবেগ এই তিনটি হইতে হিসাব করিয়া দেখা যায় অন্যূন দশ হাজার লক্ষ কিলোওয়াট শক্তি বাৎসরিক অপচয় হয়।

বারিপ্রবাহের গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের জন্যই হউক, বন্যা রোধ করার জন্যই জন্যই হউক আর শক্তি উৎপাদনের জন্যই হউক একমাত্র গঠনমূলক কার্য্য হইতেছে—নদীর অববাহিকার উপরিস্থিত অংশে কতকগুলি জলাধার (Reservoir) নির্ম্মাণ করিতে হইবে—বাঁধ বাঁধিয়া অতিরিক্ত জল সেই জলাধারে

মজুত করিতে হইবে। কোন্ কোন্ স্থান জলাধার নির্ম্মাণের উপযোগা Mr. Glass পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহাও বলিয়া দিয়াছিলেন। দামোদর নদীর অববাহিকায় পাঁচটি এবং বরাকর নদীর অববাহিকায় তিনটি জলাধার নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

এখন প্রশ্ন হয়, ১৯১৫-১৬ সালে যদি এই প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোনরূপ গঠনমূলক কার্য্য আজিও হয় নাই কেন? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জলাধারের জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানগুলি ছোটনাগপুরের কয়লাখনির এলাকা হইতে নিকটবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। বাঁধের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালে Indian Mining Association এই আপত্তি তুলিয়াছিলেন, যে অববাহিকার উপরিভাগে জল মজুত করা হইলে, পার্ব্বত্য ভূমির ছিদ্রের মধ্য দিয়া সেই জল নিম্নে কয়লা খনিতে গিয়া পড়িবে, এবং কয়লা খনন করার Pumping Cost বৃদ্ধি পাইবে। কয়লা-খনির স্বার্থের জন্য জনসাধারণের হিতকর পরিকল্পনাকে বলি দেওয়া হইল। কিন্তু পরে উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা হইল, এই আপত্তিও বিজ্ঞানসম্মত নয়। ভূতত্ত্ববিদ্গণ মতপ্রকাশ করিলেন যে, বাঁধের জল কয়লা খনিতে গিয়া পড়িতে পারে না। আপত্তির কারণ আর থাকিল না সত্য, কিন্তু আপত্তি থাকিল। প্রথম কথা কয়লা-খনির ব্যবসায়িগণ শ্বেতাঙ্গ বণিক, দ্বিতীয় কথা জনসাধারণের হিতসাধনে সরকার চিরকাল উদাসীন।

জলাধার নির্ম্মাণের কতকগুলি সমস্যা আমরা এইবার আলোচনা করিব। বাঁধ নির্ম্মাণে যে অর্থ ব্যয় হইবে, তাহা কোথা হইতে আসিবে? Mr. Glass হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন, পার্জ্জোরী, পালকিয়া এবং উশরি—এই তিনটি বাঁধ নির্ম্মাণ করিতে ন্যূনকল্পে ২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বর্ত্তমানে হিসাব করিয়া দেখা যায়, মোট ১৫ লক্ষ একর ফিট জল সঞ্চয় করিতে হইলে ব্যয় হইবে ৮।৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রতি একর ফিট পিছু ৬০ টাকা পড়িবে। আমেরিকার মিসিসিপিতে কেবলমাত্র বন্যারোধের জন্য যে বাঁধ, তাহাতে একর-

ফিট পিছু ৪০ টাকা লাগিয়াছিল। বন্যারোধ, জলসেচন ও শক্তি-উৎপাদন এই তিন উদ্দেশ্যে রচিত T. V. A.র বাঁধে একর ফিট পিছু ১০০ টাকা লাগিয়াছিল। ডাঃ মেঘনাদ সাহা এবং কে. রায় হিসাবে দেখাইয়াছেন, আমাদের উপরি-লিখিত পরিকল্পনায় ২৬ লক্ষ একর-ফিট জল সঞ্চয়ের জন্য জলাধার নির্মাণে ২৫-৩০ কোটি টাকা ব্যয় হইতে পারে। এই টাকা সরকার সচেষ্ট হইলে যোগাড় করিতে পারেন। যুদ্ধের সময়ে মানুষের ধ্বংসের জন্য যদি শত শত কোটি টাকা সহজলভ্য হইয়া থাকে, তবে মানুষের কল্যাণের জন্য এই টাকা না পাইবার কোন কারণ নাই।

আর একটি সমস্যা আছে। সকল নদীর মত দামোদর নদের জলেও বালি এবং মাটি আছে। এই জল জলাধারে সঞ্চিত হইয়া থাকিতে থাকিতে প্রচুর পলি পড়িবে, এইরূপে বালি এবং মাটী দ্বারা জলাধারের প্রবেশ-পথ রুদ্ধ হইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা অনেক ইঞ্জিনিয়ারকে উদ্বিগ্ন করিয়াছে। কিন্তু আমরা জানি আমেরিকায় Anti-Silting-up গবেষণার ফলে এই সমস্যার বহুলাংশে সমাধান হইয়াছে। আমরাও এই সকল অভিনব বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া কেবলমাত্র দামোদর নদের নহে, বাংলার সকল নদীর 'পলিপড়া'র সমস্যার সমাধান করিতে পারিব। কোন সমস্যাই সমাধানের অতীত নহে। প্রয়োজন হইতেছে আন্তরিক প্রচেষ্টার। এই প্রচেষ্টা আমাদের করিতেই হইবে, অন্যথা এক ভয়ঙ্কর সম্ভাবনা আছে। দামোদরের অববাহিকা বৎসরের পর বৎসর ক্রমে ক্রমে সরিয়া আসিতেছে। বাঁধ নির্ম্মাণ না করিলে ভবিষ্যতে দামোদরের বন্যা প্রচণ্ডভাবে কলিকাতার বক্ষের উপর দিয়া প্রবাহিত হইবে! উন্নত বিজ্ঞানের যুগে বন্যার আক্রমণে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল নগরী বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে!!

দামোদর নদের বাঁধ বাংলার পুনর্গঠনের প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত। একটি ভয়ঙ্কর বিপদ হইতে আত্মরক্ষা ব্যতীত আরও বহু উপকার ইহা হইতে পাওয়া যাইবে। এই পরিকল্পনা হইতে যে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন সহজেই সম্ভব

তাহার পরিমাণ হিসাব করা হইয়াছে। দামোদরের পাঁচটি বাঁধ হইতে ৬৮ কোটি কিলোওয়াট এবং বরাকরের তিনটি বাঁধ হইতে ৪৫·৩ কোটি কিলোওয়াট শক্তি উৎপন্ন হইবে। এই বিশাল বৈদ্যুতিক শক্তি ছোটনাগপুর অঞ্চলের রূপ পরিবর্ত্তন করিয়া দিবে। এই বৈদ্যুতিক শক্তি কি কি কার্য্য করিতে পারে? কয়লা-খনিগুলিতে বর্ত্তমানে কয়লার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন হয়। নূতন পরিকল্পনায় এই কয়লা রক্ষিত হইবে। ছোটনাগপুর অঞ্চলে এলুমিনিয়ম প্রস্তুতের উপাদান প্রচুর পরিমাণে আছে। বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে সেই স্থানে বিশাল এল্যুমিনিয়ম শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারে। কৃষির জন্য Calcium Nitrate এবং Synthetic Ammonia, এবং নিত্য ব্যবহারের জন্য Calcium Carbideএর প্রয়োজন ভারতে অত্যন্ত বেশী। এই সকল অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদন ঐ অঞ্চলে সম্ভব, যদি বৈদ্যুতিক শক্তি পর্য্যাপ্ত পরিমাণে এবং সুলভে পাওয়া যায়। কেবলমাত্র বৈদ্যুতিক শক্তি হইতেই বৎসরে ন্যূনকল্পে ২ কোটি টাকা আয় সহজেই সম্ভব।

ইহা ব্যতীত কৃষির উন্নতি, জলসেচন দ্বারা অধিক শস্য উৎপাদন, নৌযান হইতে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি, প্রভৃতির সম্ভাবনা অসীম। ইহা ব্যতীত বন্যারোধ এবং পরিস্থিতির সামগ্রিক উন্নতির জন্য যে পরোক্ষ সমৃদ্ধি হইবে তাহা বর্ণনার অতীত। এক কথায়, যে জলরাশি বৎসরের পর বৎসর শুধু মানুষের ক্ষতিসাধনই করিয়া আসিতেছে, মানুষেরই চেষ্টায় তাহা মানুষের অসীম কল্যাণে নিয়োজিত হইতে পারে। আমাদেরই চেষ্টায় তাহা হইবে। জনসাধারণকে এই দিকে মনোযোগী হইতে হইবে। "Nature, vested interests and thoughtless management made an once-prosperous valley a wilderness, but Nature, Man and Science can again make it a smiling garden."

ভারতীয় বস্ত্রশিল্প

সভ্য মানুষের প্রথম প্রয়োজন খাদ্য, দ্বিতীয় প্রয়োজন বস্ত্র। অতএব কৃষি-শিল্প এবং বস্ত্রশিল্প হইতেছে মানব জাতির প্রধানতম দুইটি উপজীবিকা। সামন্ততান্ত্রিক যুগে কৃষির প্রাধান্যই ছিল সমাজের বিশেষত্ব। সামন্ততান্ত্রিক যুগ হইতে যন্ত্রশিল্পের প্রথম বিকাশ হয় বস্ত্রশিল্পের মধ্য দিয়া। বস্ত্রশিল্পের জয় এবং সফলতার উপর নির্ভর করে অন্যান্য যন্ত্রশিল্পের সম্ভাবনীয়তা এবং উন্নতি। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে যন্ত্রসভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে এই সত্য প্রমাণিত হয়। আর ভারতের মত সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। ৭০।৮০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতে বস্ত্রশিল্পের সম্ভাবনীয়তা ছিল অসীম—ভারতের শিক্ষিত জনসাধারণ এই কথা বুঝিতে পারিয়াই এই শিল্পকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব বস্ত্রশিল্পের প্রসার এবং সমৃদ্ধির উপর অনুভূত হয় এবং ইহার ফলেই বস্ত্রশিল্প আজ ভারতে জাতীয় শিল্পরূপে পরিগণিত।

ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের বর্ত্তমান আলোচনা করিতে হইলে ইহার অতীত সম্বন্ধে একটু ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাংলার কুটীরজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্প যে জগৎজোড়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার ইতিহাস আমাদের জানা আছে। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, চন্দননগর, শান্তিপুর, প্রভৃতি এই শিল্পের কেন্দ্র ছিল। এই সূক্ষ্ম শিল্প ব্যতীত, সাধারণ লোকের দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য প্রতি গ্রামে বা 'পঞ্চগ্রামে'ই স্থানীয় চাহিদা মিটাইবার জন্য তাঁত এবং চরকার ব্যবস্থা ছিল। উপযুক্ত যানবাহনের অভাবে তখন শিল্প কোন বিশেষ স্থলে কেন্দ্রীভূত হইতে পারে নাই, পরন্তু দেশের সর্ব্বত্র বিস্তৃত ছিল। সামন্ততান্ত্রিক যুগে অনেক অসুবিধার মধ্যে বিকেন্দ্রীভূত শিল্প-ব্যবস্থা একটি মহান্ সুবিধার বিষয় ছিল। কিন্তু ইংরাজগণ এদেশে কেবলমাত্র দেশ জয় করেন নাই, ব্যবসাও জয়

করিয়াছেন। যান্ত্রিক তাঁত ব্যবহারের সাহায্যে ইংল্যাণ্ড যখন খুব অল্প মূল্যে সেই মাল ভারতীয় বাজারে আমদানী করিতে লাগিল, তখন সেই প্রতিযোগিতায় উচ্চমূল্যের ভারতীয় শিল্প দাঁড়াইতে পারিল না। ইংরাজগণ সাময়িক সুবিধার জন্য বাঙ্গলার তন্তুবায়দিগের অঙ্গুলি কর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু অঙ্গুলি কর্ত্তন না করিলেও স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতীয় কুটীর শিল্প উন্নততর যন্ত্রশিল্পের নিকট পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইত। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারত হইতে বস্ত্ররপ্তানীর ইতিহাস দেশীয় শিল্পের অধোগতির ইতিহাস।

	রপ্তানী	আমদানী
১৭৫৪	৮০ লক্ষ টাকা	৪৫ হাজার টাকা
১৮২৯	১ ,, ,,	৫২ লক্ষ টাকা

এই অবনতির পরে কুটীর শিল্প আবার উন্নতি লাভ করিয়াছে। জনসাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্দ্ধমান বাজারে (expanding market) জনসাধারণের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে; এবং কুটীরশিল্পজাত বস্ত্রোৎপাদনের পরিমাণ ক্রমশঃ বিশাল আকার ধারণ করিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে মোট উৎপন্ন বস্ত্রের মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ১৫০ কোটি গজ বস্ত্র কুটীর শিল্পজাত, সংখ্যায় অন্ততঃ ২০ লক্ষ হস্তচালিত তাঁত আছে; এবং অন্যূন ২ লক্ষ ৬০ হাজার লোক তাঁত হইতে জীবিকা অর্জ্জন করে। কারখানা শিল্পের প্রতিযোগী হিসাবে নহে, সম্পূরক হিসাবে বস্ত্রবয়নে কুটীর শিল্পের ভবিষ্যৎ যথেষ্ট উজ্জ্বল।

বস্ত্রবয়নে বৃহৎকায় কারখানা শিল্পের উপযোগী প্রাকৃতিক এবং পারিবেশিক সুযোগ ভারতে কতখানি আছে তাহা বিবেচ্য বিষয়। মধ্য প্রদেশে এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীতে তুলা উৎপাদনের উপযোগী black soil প্রচুর আছে; এবং সুষ্ঠু জলসেচনের ব্যবস্থা হইলে ইহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্ষুদ্র আঁশযুক্ত (short sharple) তুলা উৎপন্ন হইতে পারে এবং বর্ত্তমানে হয়। উচ্চ ধরণের বস্ত্র-

শিল্পের জন্য আরও একটি দ্রব্যের প্রয়োজন—উপযুক্ত আবহাওয়া। এই বিষয়ে ভারতে অসুবিধা আছে। বাংলার জলসিক্ত হাওয়া অথবা বম্বের শুষ্ক হাওয়া—কোনটি সূক্ষ্ম বস্ত্র উৎপাদনের অনুকূল নহে। এইজন্য artificial humidification এর প্রয়োজন হয়। কিন্তু তথাপি প্রাকৃতিক অভাব পরিপূর্ণ হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আমেরিকা বা মিশরের মত দীর্ঘ আঁশযুক্ত তুলা ভারতে উৎপন্ন হয় না। ভারতের তুলা short staple; উচ্চ মূল্যের বস্ত্র উৎপাদনের জন্য ভারতকে বিদেশ হইতে আনীত long staple তুলার উপর নির্ভর করিতে হয়।

কাঁচামাল ব্যতীত বস্ত্রশিল্পের জন্য প্রয়োজন—মূলধন, সহজপ্রাপ্য শ্রমিক, কারখানা চালাইবার শক্তি (Power) এবং সংগঠনদক্ষতা (organization). বস্ত্রশিল্পের প্রথম যুগে এই সকল সুবিধা একত্রে বম্বেতেই পাওয়া গিয়াছিল; এবং সেইজন্যই প্রথম কাপড় কল ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও, বম্বের নিকট অধিকাংশ কলগুলি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল। বম্বেতে প্রথম কাপড় কল-১৮৪৪ সালে এক পার্শী ধনপতির চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতীয় বিশেষ করিয়া পার্শী ধনপতিগণ থাকার জন্য তখন বম্বেতে মূলধন ও ঋণ পাইবার সুবিধা ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লা সুলভ মূল্যে জাহাজে করিয়া আনীত হইয়া কাপড় কল-গুলির শক্তির চাহিদা মিটাইত। পার্শী এবং মহারাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িগণের সহজ সংগঠনক্ষমতা বস্ত্রশিল্পের উন্নতির মূলে রহিয়াছে। এই সময়ে চীন দেশে ভারতীয় সূতার চাহিদা যথেষ্ট ছিল; এবং জাহাজযোগে বম্বে হইতে রপ্তানীর সুবিধাও ছিল। কিন্তু দীর্ঘকাল এই সকল সুবিধা বম্বের একচেটিয়া রহিল না। মূলধন, যানবাহন, সংগঠনক্ষমতা প্রতি প্রদেশেই উন্নত হইতে লাগিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে নাগপুর, মাদ্রাজ, আহমেদাবাদ, প্রভৃতি ভারতের অন্যান্য স্থানে কাপড় কল প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। বিক্রয়-কেন্দ্রের সান্নিধ্য, এবং বম্বে অপেক্ষা সুলভে শ্রমিকের সহজ-প্রাপ্যতা এই সকল প্রাদেশিক কেন্দ্রগুলিতে বস্ত্রশিল্পের বিস্তৃতি লাভের মূল কারণ। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে সারা দেশময়

বিভিন্ন সহরে কল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। কিছুদিন হইল বৃটিশ ভারতে ফ্যাক্টরী আইনের জন্য ভারতীয় করদ রাজ্যগুলিতেও অনেক কল গড়িয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে বস্ত্র উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র হইতেছে—বম্বে, আহ্‌মেদাবাদ, শোলাপুর, নাগপুর, মাদ্রাজ, কলিকাতা, ঢাকা। ১৯৩৬ সালে মোট কলের সংখ্যা ছিল ৩৭৯, মাকুর সংখ্যা ৯৮½ লক্ষ, তাঁতের সংখ্যা ২ লক্ষ, বস্ত্রশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ৪ লক্ষ ১৭ হাজার; উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণ ৩৫৭ কোটি গজ। ইহার পরও উৎপন্ন কাউণ্টের পরিমাণ এবং কলের সংখ্যা উভয়েই বৃদ্ধি পাইয়াছে; তবে তাহার অধিক হিসাব দুর্লভ। কিছুদিন হইতে কলগুলি সূক্ষ্ম কাউণ্টের বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে; এবং এই জন্য আমেরিকা হইতে (long staple) তুলা আমদানী করিতেছে। সূক্ষ্ম কাউণ্টের বস্ত্র পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপন্ন করিবার পথে বাধা হইতেছে নূতন যন্ত্র আমদানীর অসুবিধা এবং সুদক্ষ কারিগরের (expert technician) অভাব।

সংগঠনের দিক হইতে ল্যাঙ্কাশায়ারের নিকট আমাদের অনেক শিখিবার আছে। ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলির প্রত্যেকে বস্ত্রশিল্পে এক একটি দিকে বিশেষত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। কেহ কেবলমাত্র সূতা প্রস্তুত করে, কেহ সাধারণ বস্ত্র উৎপাদন করে, কেহ সূক্ষ্ম কাউণ্টের বস্ত্র উৎপন্ন করে, কেহ বা মাত্র ছাপার কার্য্য করে। ইহার ফলে প্রত্যেকের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। ভারতীয় কলগুলি এইরূপ কার্য্যভাগ করিয়া লয় না; অনেকগুলি কাজ এক সঙ্গে করিতে যাইয়া কেহই দক্ষতা অর্জ্জন করে না। ল্যাঙ্কাশায়ারের কলগুলি ভারতের কলগুলি অপেক্ষা আয়তনে বড়। একটি প্রতিনিধি স্থানীয় (Optimum) কলের আয়তন হওয়া উচিত ৬০,০০০ মাকু। কিন্তু ভারতীয় কলগুলির গড়ে আয়তন ২৬,০০০ মাকু। ইহা ব্যতীত ভারতীয় শিল্পকে আরও কতকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়। ভারতীয় শিল্পপতিগণ বিদেশে রপ্তানীর বা বহির্জ্জগতে ব্যবসায় বৃদ্ধি করার (developing markets abroad) জন্য সক্রিয় চেষ্টা করে নাই। বহির্ব্বাণিজ্যের জন্য মাত্র একটি বাজারের

উপর তাহাকে নির্ভর করিতে হইয়াছে—তাহা হইতেছে চীন দেশ। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পকে প্রতিদ্বন্দ্বী জাপানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে হইয়াছে। জাপানের ধনপতিগণ জাপানী নারী শ্রমিকদিগকে অত্যন্ত অল্পবেতনে কার্য্য করাইয়া লয়'; তাহার জন্য ভারতের উপর জাপানের অনেকখানি আপেক্ষিক সুবিধা আছে। সরকারের যথেচ্ছ মুদ্রানীতির পরিবর্ত্তন (যাহা সাম্রাজ্যের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া করা হয়), জাপানী শিল্পপতিগণের শোষণ করিবার নীতি, বিনিময়ের হার বৃদ্ধি করা, জাপানী মুদ্রার মূল্যহ্রাস (depreciation) ভারতের অসুবিধা বৃদ্ধি করিয়াছে। উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির অভাব, সুদক্ষকারিগর প্রস্তুত করার জন্য শিল্প-শিক্ষাগারের অভাব, সাংগঠনিক দুর্ব্বলতা এই সকল অসুবিধার সহিত যুক্ত হইয়াছে।

এই সকল দুর্ব্বলতা অত্যন্ত প্রকট হইয়া উঠিল বিশ্বব্যাপী বাজার মন্দার সময়ে (১৯৩০-৩৩)। জাপান আমাদের তুলা ক্রয় করিয়া তাহা হইতে প্রস্তুত মাল আমাদেরই বিক্রয় করিতে লাগিল। ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইল। রক্ষাকর (Protective duty) স্থাপন করার জন্য দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতে লাগিল। কেন্দ্রীয় সরকার অবৃটিশ দ্রব্যের উপর শতকরা ৫০% কর চাপাইয়াও জাপানী মাল বন্ধ করিতে পারিল না। অপর দিকে বৃটিশ দ্রব্যের উপর কর না বসানোর জন্য জনসাধারণ ইহাকে সাম্রাজ্যের বিশেষ ব্যবস্থা (Imperial Preference) ভাবিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িল। জগৎ-জোড়া বাজার মন্দার সঙ্কট কমিয়া আসিতে লাগিল। ভারত তাহার স্বীয় চেষ্টায়, রক্ষাকরের সাহায্যে এবং সরকারের নিকট অন্যান্য সুবিধা আদায় করিয়া বস্ত্র শিল্পে আবার উন্নতি করিতে লাগিল। উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল, এবং নূতন কলও প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল (১৯৩৪-৩৮)।

এমন সময়ে ইউরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল। যুদ্ধের ফলে চাহিদা এবং মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পাইল। খাকী, সেলুলার, পাট ও তুলার সংমিশ্রণে ক্যাম্বিস প্রভৃতি অনেক নূতন ধরণের বস্ত্রদ্রব্য প্রস্তুত হইতে লাগিল—ভারতীয়

বস্ত্রব্যবসায়ীদের মুনাফা বৃদ্ধি পাইল। নিম্নের সংখ্যাগুলি হইতে বস্ত্রশিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ বুঝা যাইবে।

বৎসর	কোটি গজ
১৯৩৮-৩৯	৪২৬
১৯৪২-৪৩	৪১১
১৯৪৩-৪৪	৪৮৫

দেখা যাইতেছে ১৯৪২ সালে উৎপাদন অত্যন্ত কম হইয়াছিল, এবং ১৯৪৩ সালে ইহা পুনর্ব্বার বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৯৪২ সালে উৎপাদন কম হইয়াছে, আমদানী ৬৪৭০ লক্ষ গজ হইতে ১৩০ লক্ষ গজ হইয়া গিয়াছে, বৃটিশ ভারত হইতে রপ্তানী বৃদ্ধি পাইয়াছে, সৈন্যবাহিনীর ব্যবহারের জন্য প্রচুর পরিমাণ বস্ত্র সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ ক্রয় করিয়াছে। ভারতীয় জনসাধারণের জন্য বস্ত্র অত্যন্ত কমিয়া গেল। এই সকল কারণে কাপড়ের মূল্য বৃদ্ধি পাইল। মজুতদারী ও চোরা কারবারের জন্য কাপড়ের অভাব দুর্ভিক্ষে পরিণত হইল। কল্পনাতীত মূল্যে নিত্য ব্যবহার্য্য বস্ত্র বিক্রীত হইতে লাগিল। এইরূপ অভাবনীয় মূল্য-বৃদ্ধির ফলে কলের মালিকদের মুনাফা ১৯৩৮ সালের তুলনায় ৫½ গুণ হইল, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী ২ বৎসরের দ্বিগুণ হইল।

বস্ত্রের দুর্ভিক্ষ ;মধ্যবিত্ত এবং কৃষক শ্রমিকের জীবনে কি অভাবনীয় দুর্দ্দশা আনিয়া দিয়াছে—তাহার বিবরণ দেওয়া বাহুল্য হইবে। বস্ত্রের অভাবে অসূর্য্যম্পশ্যা কুলবধূরা আত্মহত্যা করিয়াছে—এইরূপ ঘটনা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সে কথা যাউক্—আমাদের আলোচ্য বিষয় হইতেছে—ইহা হইতে আমাদের কী শিক্ষণীয় বিষয় আছে। আমাদের শিল্পপতিরা অনেক সময়ে ভীত হন যে, যুদ্ধোত্তর যুগে সামরিক চাহিদা বন্ধ হইয়া যাওয়ার পর ভারতের বস্ত্রশিল্প চাহিদা-হ্রাস অথবা বাজার-মন্দার আঘাত প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এই ভীতি অত্যন্ত অমূলক। ভারতের চাহিদা বর্ত্তমানে এত অধিক এবং জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়নের সাথে সাথে এত

বৃদ্ধি পাইবে যে, বর্ত্তমানের চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক কল মুনাফার সহিত ব্যবসা চালাইতে পারিবে। শুধু তাহাই নহে। আজিও মধ্য প্রাচ্যে ভারতীয় বস্ত্র রপ্তানী হইতেছে। যুদ্ধ থামিবার পর এই সকল মধ্য প্রাচ্যের দেশগুলিতে ভারতীয় বস্ত্রব্যবসার স্থায়ী বাজার পাওয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে। এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ভারতীয় শিল্পপতিদের শিল্পপ্রসারে এবং শিল্পোন্নতিতে ব্রতী হওয়া উচিত। ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের অসংখ্য দোষ এবং দুর্ব্বলতা আছে। এই সব দুর্ব্বলতা দূর করিয়া যুদ্ধোত্তর ভারতে শিল্প পুনর্গঠনের আদর্শ লইয়া যদি শিল্পপতিরা অগ্রসর হন, তাহা হইলে, কেবলমাত্র যে ইহা ভারতের বৃহত্তম জাতীয় শিল্পরূপে দাঁড়াইবে তাহা নহে, ভারতের যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যার অনেকখানি সমাধান করিবে, ভারতের ভূমির উপর হইতে অতিরিক্ত কৃষকের চাপ হ্রাস করিবে, এবং সমস্ত প্রাচ্যের বৃহত্তম বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র হইয়া মধ্য প্রাচ্য, সুদূর প্রাচ্য, চীন, ইন্দোনেসিয়ায় বস্ত্র সরবরাহের বৃহত্তম কেন্দ্র হইয়া উঠিতে পারিবে।

ভারতের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

বর্ত্তমান সভ্যতার মেরুদণ্ড লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প খ্রীষ্টপূর্ব্ব ইউরোপের উৎপাদন-ক্ষেত্রে তেমন গুরুত্ব লাভ করে নাই। এশিয়াতেও তাহার স্থান তখন ইহা অপেক্ষা উচ্চ ছিল না। কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র, স্তম্ভ, প্রভৃতি নির্ম্মাণের উদ্দেশ্যে লৌহের ব্যবহার ভারতবর্ষে অতি প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত। প্রাচীন ভারতের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ-কৌশলের দিক হইতে অদ্বিতীয়। বিখ্যাত দামাস্কাসের তরবারি হায়দ্রাবাদের ইস্পাত নির্ম্মিত বলিয়া কথিত। দিল্লীর প্রখ্যাত

কুতবস্তম্ভ—যাহার ওজন প্রায় ছয় টন, ৪১৫ খৃষ্টাব্দের বলিয়া বিশ্বাস। ভাবিয়া বিস্মিত হইতে হয়, কি করিয়া অত প্রাচীন কালে এত সুন্দর এবং এত বৃহৎ ইস্পাত স্তম্ভ প্রস্তুত হইল। ভারতের বিভিন্ন স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ হাপরের অবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের বিষ্ণুপুরী ইস্পাত নির্ম্মাণ-নিপুণতায় আজিও জগতের বিস্ময়।

প্রাচীন ভারতে লৌহ কারিগরদের শ্রেণীগত আখ্যা ছিল আগার্য্য ; এবং যে সকল জেলায় লৌহ প্রস্তুত হইত, তাহাদের বলা হইত লোহারা। এই নাম আজিও অনেকক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আদিম কর্ম্মকার শ্রেণী তাহাদের অস্থায়ী হাপরে ও মিশ্র লৌহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যন্ত্রপাতি লইয়া এখনও তাহাদের অস্তিত্ব বজায় রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। এমন কি যেখানে জগতের অন্যতম বৃহৎ অগ্নিশালা স্থাপিত হইয়াছে ও আধুনিকতম যন্ত্রপাতির সাহায্যে উৎপাদন চলিতেছে সেই জামসেদপুরেও এই সব প্রাচীন শিল্পকারেরা তাহাদের অল্পস্বল্প উৎপাদন বজায় রাখিয়াছে। কিন্তু স্বল্প মূল্যের ইউরোপীয় ইস্পাত আমদানীর ফলে ইহাদের অনেকেই ক্রমে কারিগরের স্থান হইতে সাধারণ শ্রমিকের পর্য্যায়ে নামিয়া আসিতেছে।

বৃহৎ শিল্প হিসাবে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প প্রতিষ্ঠার ইতিহাস সত্যই এক কাহিনী। বিখ্যাত ব্যবসায়ী জে. এন্. টাটার দূরদৃষ্টি ও প্রবর্ত্তক-সুলভ দক্ষতা এর জন্য অনেক খানি দায়ী। অবশ্য টাটাজীর পূর্ব্বেও কয়েক-জন যে এই দিকে চেষ্টা করেন নাই তাহা নহে। ১৮৩০ সালে মাদ্রাজে ইংরাজ সিভিলিয়ন্ মিঃ হিদ্ আধুনিক কায়দায় ইস্পাত নির্ম্মাণের প্রথম প্রয়াস করেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বরাকরের নিকট কাঁচা লৌহ (Pig Iron) প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানটি Bengal Iron Corporationsএ পরিণত হয়।

১৯০৭ সালে Tata Iron & Steel Company খোলা হয়। ১৯০৮ সালে কারখানা নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, ১৯১১ সালে প্রথম Pig Iron এবং ১৯১৩

সালে প্রথম ইস্পাত প্রস্তুত হইল। প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন-ক্ষমতা হইল বৎসরে ১ লক্ষ ৬০ হাজার টন লৌহ ও ১ লক্ষ টন ইস্পাত।

লৌহ ও ইস্পাতের মত বৃহৎ মূলশিল্প স্বভাবতঃই এমন স্থানে কেন্দ্রীভূত হইবে যে স্থানে একাধারে লৌহ-প্রস্তর ও কয়লা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এই দুইটি প্রধান উৎপাদক ব্যতীতও লাইমষ্টোন ও ডোলোমাইট হইল লৌহ গালাইবার পক্ষে অপরিহার্য্য। বিহার, উড়িষ্যা, মহীশূর ও গোয়ায় লৌহ-প্রস্তর সুলভ। কিন্তু সিংভূম অঞ্চলের লৌহই জগতের শ্রেষ্ঠ লৌহ। এস্থানে প্রায় ১০০ কোটী টন লৌহ আছে বলিয়া অনুমান। সিংভূম অঞ্চলে লৌহ-প্রস্তরে শতকরা প্রায় ৬০ ভাগ লৌহ আছে। টাটার ইস্পাত কোম্পানী এইস্থানে অবস্থিত। কয়লার দিক হইতেও ঐ অঞ্চলে সুবিধা বিশেষ। রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া, প্রভৃতি স্থানের খনির কয়লা এই স্থানে সহজে পৌছাইতে পারে। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ ভারতে মাত্র একটি ইস্পাতের কারখানা ছিল, তাহা Tata Iron & Steel coy. ইহার শ্রমিক-সংখ্যা তখন ২৫, ৭৭৬। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে হীরাপুর ও কুলটিতে Indian Iron & Steel coy. প্রতিষ্ঠিত হইল। বাংলায় আর একটি বৃহৎ ইস্পাতের প্রতিষ্ঠান আছে Steel Corporation of Bengal, ইহা বার্ণপুরে অবস্থিত। বাংলায় আরও কয়েকটি লৌহ ও ইস্পাতের কারখানা আছে; কিন্তু উপরোক্ত তিনটি ব্যতীত ভারতের আর সকল কারখানাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই rollingএর কার্য্য করিয়া থাকে। ১৯৩৯ সালে সারা ভারতে ১৮টি সব রকমের লৌহ কারখানা ছিল। মোট মজুর-সংখ্যা ৮৩৫৫৮; বাংলায় ছিল ছয়টি কারখানা, মজুর-সংখ্যা ১৬,৯১৪। এক টাটাতেই মজুর-সংখ্যা ২৮,৬৭৪।

ভারতীয় লৌহশিল্পের ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে দেশীয় বাজার ও চাহিদার উপর, বহির্ব্বাণিজ্যের উপর নহে। কিন্তু দেশীয় চাহিদার মধ্যে আসে বৃহৎ অংশ রেলওয়ে হইতে; রেলওয়ে তাহার ইস্পাতের প্রয়োজন আমদানী

হইতে মিটায়। বিদেশী একচেটিয়া কারবারীরা (Monopoly Capitalists) চায় ভারতের ইস্পাতশিল্পকে তাহাদের সূক্ষ্ম ইস্পাত কারখানার কাঁচামাল সরবরাহীরূপে। তাই দেখি ভারতীয় উৎপাদনের অধিকাংশ Pig Iron, Ferro-manganese ও Steel ingot। সহজেই বুঝা যায়, মূল শিল্প হিসাবে উচ্চ মূল্যের সূক্ষ্ম ইস্পাত নির্ম্মাণ ভারতে অসম্ভব করিয়া তুলিবার আয়োজন ব্যতীত ইহা আর কিছু নহে। নিম্নলিখিত সংখ্যাগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ মিলিবে। ১৯২৯ সালে ভারতে Pig Iron উৎপন্ন হইয়াছে ১,৩৭৬,০০০ টন এবং finished Steel ৪১২,০০০ টন। আমরা বিলাত ছাড়া অন্যত্র হইতে লৌহ-ইস্পাত আমদানী করিয়াছি ৯৭২, ৭০০ টন ও বিলাত হইতে ক্রয় করিয়াছি ৭১১,৭০০ টন। অর্থাৎ আমরা ১৯২৯-৩০ সালে দেশে যা ইস্পাত উৎপন্ন করিয়াছি আমদানী করিয়াছি তাহার চারগুণ। আমদানী ও রপ্তানীর প্রকৃতি বিশ্লেষণ করিলে অবস্থা আরও পরিষ্কার হইবে। আমরা রপ্তানী করি ore, ingot, পাইপ প্লেট, প্রভৃতি এবং আমদানী-কারি কলকব্জা, ইঞ্জিন, বয়লার, ইত্যাদি যন্ত্র-শিল্পের অংশসমূহ ও উচ্চধরণের ভাল ইস্পাত।

টাটা কোম্পানী স্থাপিত হইবার পরই ১৯১৪-১৮ এর মহাযুদ্ধ বাধে এবং উৎপাদনের হার খুব দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। ১৯১৭ সালে কারখানাটিকে আরও বৃহৎ করিবার পরিকল্পনা হইল। ১৯১৯ সালে তৃতীয় blast furnace খোলা হইল, এবং Pig Iron উৎপাদনের ক্ষমতা শতকরা ৮০ ভাগ বৃদ্ধি পাইল। খোলামুখ Steel furnace তিনটি বাড়িল, সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাত নির্ম্মাণের হার আগাইয়া গেল শতকরা ২৭ ভাগ। যুদ্ধ বন্ধ হইবার পর ভারতীয় ইস্পাত শিল্পকে এক তীব্র মন্দার মুখোমুখী দাঁড়াইতে হইল। যুদ্ধের সময় আমদানী কমিয়া গিয়াছিল, চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল; উৎপাদনের গতিবৃদ্ধি অপরিহার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু যুদ্ধ মিটার পর বাজারের অবস্থা যুদ্ধ-পূর্ব্ব স্থানে ফিরিয়া যাইতে চাহিল। ফলে

ইস্পাতের মূল্য হ্রাস পাইল; কিন্তু উৎপাদন—খরচ কমিল না। ভারতীয় ইস্পাতশিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড় করাইবার জন্য ১৯২৪ সালে সরকার বিদেশ হইতে আমদানী লৌহ ও ইস্পাতের উপর শুল্ক বসাইল। কিন্তু সমরোত্তর যুগে সারা জগতে ইস্পাতের বাজারে যে মন্দা দেখা দিল, তাহার ফলে রক্ষা-কর সত্ত্বেও ভারতীয় ইস্পাত-শিল্পের উন্নতি রুদ্ধ হইল। পুনরায় ১৯৩৫ সাল হইতে যুদ্ধের প্রয়োজনে ইস্পাত নির্ম্মাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

হাজার টনের হিসাব

	কাঁচা লৌহ (Pig Iron)		ইস্পাত (Iron & Steel)	
	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৮-৩৯	১৯৩৪-৩৫	১৯৩৮-৩৯
উৎপাদন	১,৩৪৩	১,৫৭৬	৬২৭	৯৩৫
রপ্তানী	৪১৭	৫৩৮	৫৯	৮৪
আমদানী			৫৯২	৪৩৪

ভারতবর্ষে বিভিন্ন রকমের পাকা ইস্পাত যে উৎপন্ন হইতে পারে তাহার প্রমাণ আমরা পাইলাম এইবারের যুদ্ধে। উপরের সংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যুদ্ধের দরুণ বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী ক্রমশঃ কঠিন হইতেছিল। ফলে ভারতীয় কারখানাতেই ঐ সকল কুলীন ইস্পাত নির্ম্মাণের আয়োজন চলিতে লাগিল। যুদ্ধের তাগিদে শুধু যে উৎপাদনের পরিমাণ বাড়িয়াছে তাহা নহে, গুণগত উন্নতিও সম্ভব হইয়াছে। একটি দৃষ্টান্ত বলা যাইতে পারে। যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটেন হইতে প্রধানতঃ আসিত কয়েকটি বিশেষ ধরণের ইস্পাত, যথা bullet-proof Steel, মেসিনের জন্য high-speed Steel, রেল লাইনের জন্য acid Steel, নানাপ্রকারের alloy Steel, প্রভৃতি। যুদ্ধের মধ্যে এই সকল দ্রব্যই ভারতবর্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব হইয়াছে।

১৯৩৯ সালে টাটা কোম্পানী বাদ দিলে, লৌহ-শিল্পে টাকা খাটিতেছে

মোট ৫ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা। এক টাটার paid-up Capital হইতেছে ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা। তুলনামূলকভাবে বলা যাইতে পারে কয়লা-খনিগুলিতে খাটিতেছে ৯ কোটি টাকা, পাটকলগুলিতে ২০ কোটি টাকা এবং চা-বাগান ও কোম্পানীগুলিতে ১২½ কোটি টাকা। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পে লাভের হারও যুদ্ধের সময়ে বৃদ্ধি পাইয়াছে। অত্যন্ত ক্রতলয়ে ১৯৪২ সালে তিনটি প্রধান কোম্পানীর লাভ হইয়াছে ৫৯২ লক্ষ টাকা। ১৯২৮ সালে সালের তুলনায় (লৌহ ও ইস্পাত শিল্পে) লাভের হার ১৯৪২ সালে হইয়াছে শতকরা ৩০৩ গুণ বেশী।

কোন শিল্পেরই বিশেষ করিয়া মুল শিল্পগুলির সম্বন্ধে বর্ণনা সম্পূর্ণ হইবে না, যদি না তাহার শ্রমিকদের সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার হয়। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অন্যান্য শিল্পের তুলনায় লৌহ, ইস্পাত ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানায় শ্রমিকদের মজুরীর হার কিছু বেশী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ভারতবর্ষে এই মজুরীর হার বেশী হওয়া দূরে থাকুক, বস্ত্র-শিল্পে শ্রমিকদের বেতনের তুলনায় ইহা শতকরা ১৫ ভাগ কম। গ্রেট ব্রিটেনে সকল শিল্পে শ্রমিকদের হার পড়ে ৮৭ শিলিং, সূতা ও বস্ত্রশিল্পে ৬১ শিলিং এবং ধাতু, ইঞ্জিনিয়ারিং ও জাহাজ-শিল্পে ১০০ শিলিং। ১৯৩৮ সালে টাটার কারখানায় বোনাস বাদ দিয়া গড় মজুরীর হার হইতেছে প্রায় ৩৯ টাকা, এবং বোনাস সমেত ৪৩ টাকা। টাটার শ্রমিকদের মধ্যে প্রায় ১২,০০০ অর্থাৎ শতকরা ৪০ জনের অধিক ২০ টাকা অপেক্ষা কম মজুরী পায়, অথচ বিহারের মধ্যে জামসেদপুরে জীবন ধারণের খরচ সব থেকে বেশী। ১৯২৮ হইতে ১৯৩৯ পর্য্যন্ত টাটা কোম্পানীতে নূতন মূলধন নিযুক্ত হয় নাই; শ্রমিক ও যন্ত্রপাতিতে rationalization করা হইয়াছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কোম্পানীর উৎপাদন ও লাভাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রচুর। অতএব এই উন্নতির মূলে আছে শ্রমিকদের প্রাণপাত পরিশ্রম, অনেকাংশে অবশ্য যাহারা শ্রমিকদের Co-ordinate করিয়াছে তাহারাও অংশীদার। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ১৯২৭ সাল হইতে

১৯৩৯ এর মধ্যে ম্যানেজিং এজেন্টের কমিশন বৃদ্ধি পাইয়াছে ৫০,০৯০ টাকা হইতে ৪১ লক্ষ টাকা, অথচ শ্রমিকদের মজুরী বাড়িয়াছে ২৭ টাকা হইতে ৪২ টাকা মাত্র। অর্থাৎ এই বার বৎসরে মজুরীর তুলনায় ম্যানেজিং এজেন্টের প্রাপ্য বৃদ্ধি পাইয়াছে প্রায় ৮০ গুণ।

ভারতীয় লৌহ ও ইস্পাত শিল্প এখন আত্মনির্ভরশীল এবং শক্তিশালী হইয়াছে; এই কারণে ১৯৪৭ সালের ১লা এপ্রিল হইতে ইহার উপর যে রক্ষাকর ছিল তাহা তুলিয়া দেওয়া হইল।

উপসংহারে ভবিষ্যতের সূচনা করা প্রয়োজন। যুদ্ধাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বেকার-সমস্যা পৃথিবীর সর্ব্বত্র সমস্ত ধনতান্ত্রিক দেশে প্রকটভাবে দেখা দিবে। ইহারই সাথে সাথে অনেকগুলি সমস্যা জড়াইয়া আছে। যুদ্ধের চাপে সকল দেশেই এবং ভারতেও শিল্পপ্রসার ব্যাহত হইয়াছে, যন্ত্রপাতির নির্ম্মাণ কমিয়া গিয়াছে। সকল দেশের মতই ভারতে শিল্প পুনর্গঠন করিতে হইবে। বাংলায় মন্বন্তর আমাদের দেখাইয়াছে যে, কৃষিকেও উন্নততর করিতে হইবে। এই সকল সম্ভব হইবে কি প্রকারে? লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প হইতেছে সব থেকে প্রয়োজনীয় মূল শিল্প (Key Industry)। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্প আগাইয়া না গেলে, অন্য কোন শিল্প উন্নতি করিতে পারে না। কলকব্জার জন্য, যন্ত্রপাতির জন্য, রেল লাইনের জন্য, মোটর নির্ম্মাণের জন্য, গৃহ নির্মাণের জন্য, কৃষির লাঙ্গল বা ট্রাক্টরের জন্য প্রয়োজন ইস্পাত। আমাদের সভ্যতার জন্য প্রয়োজন ইস্পাত, জীবন যাত্রার জন্য প্রয়োজন ইস্পাত। তাই যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনে প্রথম কার্য্যসূচী হইল আমাদের লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের যতদূর সম্ভব বিস্তৃতি ও গুণগত উন্নতি। প্রচুর খনিজ সম্পদ, কয়লা, শ্রমিক, মূলধন সমস্তই আমাদের আছে। প্রয়োজন সাহস এবং উদ্যমের। সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য সরকার ইস্পাত-শিল্পের উন্নতির পথে প্রতিপদে বাধা দিয়াছে, তাই এ কথা সত্য যে, রাজনৈতিক ক্ষমতা পূর্ণভাবে না আসিলে ইহার পূর্ণতম বিকাশ সম্ভব নহে। তবে তাহারও বিশেষ বিলম্ব নাই। অন্য কোন দেশ

ভারতকে যন্ত্রপাতি দিতে পারিবে না; নিজেদের ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্প-ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করার জন্য ইউরোপের সকল দেশগুলিই ব্যস্ত। এমন কি গ্রেট ব্রিটেনকেও তাহার বিধ্বস্ত কারখানাগুলি পুনর্গঠন করিতে হইবে। তাই ভারতে ইস্পাত শিল্পের প্রসার ইংল্যাণ্ডের জনসাধারণের সত্যকার স্বার্থের পরিপন্থী নহে। রেলওয়ে ইঞ্জিন, বয়লার, গৃহনির্ম্মাণের উপাদান, মোটর গাড়ী, ট্রাক্টর—ইহাদের ভবিষ্যৎ চাহিদা ভারতে অফুরন্ত; এবং ইহাদের উপর নির্ভর করিতেছে, ভারতীয় জনসাধারণের সুখ-সুবিধা। সত্য বটে অভাব আছে expert Technicianএর; বর্ত্তমানে সে অভাব মিটাইতে হইবে বিদেশ হইতে কারিগর আনাইয়া; আর স্থায়ী ব্যবস্থা হিসাবে বাঙ্গালোরে টাটা কোম্পানীর দানে যেরূপ গবেষণাগার আছে, সেইরূপ অসংখ্য Research Institute, Technical School এবং গবেষণাগার প্রয়োজন। উদ্যমের সাথে আগাইয়া গেলে কোন বাধাই থাকিবে না। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের সমৃদ্ধি ভারতে যুগান্তর আনিবে।

ভারতীয় বাজেট

কোন দেশের অর্থ নৈতিক অবস্থা যদি আমরা জানিতে চাই, তাহা হইলে যেমন তাহার শিল্প, কৃষি, ব্যাঙ্ক, প্রভৃতি সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান থাকা আবশ্যক, তেমনই আবশ্যক সেই দেশের সরকারের বাৎসরিক আয়-ব্যয়ের সহিত পরিচয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির জন্য অনেকগুলি কার্য্য রাষ্ট্রকে করিতে হয়। ইহার জন্য অর্থ-ব্যয় প্রয়োজন। এই অর্থ রাষ্ট্র কোথা হইতে পায়, কিরূপে অর্জ্জন করে, কোন্ কোন্ খাতে কত কত ব্যয় করে—এই সকল বাৎসরিক হিসাব-নিকাশ যাহাতে থাকে, তাহাকেই বলে সেই দেশের বাজেট। বাজেটের সহিত পরিচয় এই জন্য প্রয়োজন যে, অনেক দেশে রাষ্ট্র জনসাধারণের অর্থ নৈতিক জীবনে হস্তক্ষেপ করে। আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কি কি করিতেছে তাহার উপর বহুলাংশে নির্ভর করে সেই দেশের অধিবাসিগণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য।

বাজেট প্রস্তুতের প্রণালী জানা আবশ্যক। ভারত সরকারের Financial বৎসর গণনা করা হয় ১লা এপ্রিল হইতে পর বৎসর ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত। অতএব আগামী বৎসরের বাজেট প্রতি বৎসর ৩১শে মার্চ্চের মধ্যে সম্পন্ন করিয়া ফেলিতে হয়। প্রতি বৎসর আগষ্ট মাসে সরকারের বিভিন্ন বিভাগগুলিকে আগামী বৎসরে সেই বিভাগের কার্য্যের জন্য কত টাকা প্রয়োজন তাহার খসড়া তৈরী করিতে আদেশ দেওয়া হয়। পোষ্ট, টেলিগ্রাফ ও রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগগুলিকেও তাহাদের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রস্তুত করিতে বলা হয়। এই সকল খসড়া প্রত্যেকটি বিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষ দ্বারা সংশোধিত হইয়া Executive Council এর Finance member এর নিকট পৌঁছায়। তাঁহার অফিসে ইহাকে পরিবর্ত্তিত বা পরিবর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। তাহার পর এই সকলগুলিকে একত্র করিয়া Finance member দেখেন—আগামী বৎসরে রাষ্ট্রের মোট কত টাকা ব্যয় হইবে এবং এই টাকা কোন্ কোন উপায়ে সংগৃহীত হইবে—তাহাও চিন্তা করেন। পুরাতন করগুলিকে বৃদ্ধি করিতে হইবে কি কমাইতে হইবে, নূতন কর বসানো হইবে কিনা, পুরাতন কর উঠাইয়া দেওয়া সম্ভব কিনা, ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করিয়া তিনি প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ তুলিবার এক পরিকল্পনা করেন। কেন্দ্রীয় Assemblyর বাজেট অধিবেশন সুরু হইলে তিনি তাঁহার সমগ্র আয়-ব্যয়ের এই পরিকল্পনা উত্থাপন করেন। পরিষদে এই সম্বন্ধে সমালোচনা চলে, বিতর্ক হয়, পরিবর্ত্তন এবং ছাটাই প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মনে রাখা প্রয়োজন. বাজেট সংক্রান্ত ব্যাপারে পরিষদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং নগণ্য। আলোচনার পরে বাজেট ভোটে ফেলা হয়। নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি কর্ত্তৃক মঞ্জুর হোক আর নাই হোক, গবর্ণর জেনারেল "Certify" করিয়া বাজেট পাশ করিয়া দেন।

কোন দুইটি বৎসরের বাজেট সম্পূর্ণ সমপ্রকৃতির হয় না। কিন্তু তাহাদের মোটমাট বিশেষত্বগুলি লক্ষনীয়। অতএব যে কোন বৎসরের বাজেট লইয়া আলোচনা করা যাইতে পারে। আমরা ১৯৪৬-৪৭ এর বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা

করিয়া সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্বন্ধে ধারণা করিব। বর্ত্তমানে রাজস্বের সর্ব্বাপেক্ষা বড় উৎস হইতেছে আয়-কর। অতীতে আয়-কর হইতে এত রাজস্ব আসিত না। যুদ্ধের জন্য দেশের আয় অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে; আয়-করের হারও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অতিরিক্ত আয়-কর, অতিরিক্ত মুনফা-কর, Corporation কর, প্রভৃতি মিলিয়া গত বৎসরে এই খাতে ১৫৮ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। এই বৎসর হইতে অতিরিক্ত মুনফা-কর বন্ধ হইয়া গিয়াছে, দেশের আয়ও অর্থের অঙ্কে কমিয়া যাইবে—অতএব এই খাতে রাজস্ব ভবিষ্যতে কমিবে—এই আশঙ্কা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। অতীতে শুল্ক হইতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব পাওয়া যাইত। যে সকল বৈদেশিক পণ্য এই দেশের বাজারে বিক্রীত হয়, তাহাদের উপর যে কর বসানো হয়, তাহা হইতে এই রাজস্ব আসে। যুদ্ধের সময়ে জাহাজের অভাবে আন্তর্জ্জাতিক ব্যবসা কমিয়া গিয়াছিল। তাই শুল্ক হইতে রাজস্বও কমিয়া গিয়াছিল। গত বৎসরে এই খাতে ৬৫ কোটি টাকা রাজস্ব পাওয়া যাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল। পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ বিভাগে আয় হইবে ৩২-২৫ কোটি টাকা, ব্যয় হইবে ২২-২৫ কোটি। অতএব ইহা হইতে সরকার ১০ কোটি টাকা net পাইবে। রেলওয়ের নিজের ব্যয় বাদ দিয়া পূর্ব্ব বৎসরে ৩২ কোটি টাকা রেলওয়ে বাজেট হইতে সাধারণ ভাণ্ডারে আসিয়াছিল। গত বৎসর মাত্র ৭ কোটি টাকা রেলওয়ে হইতে আসিবার কথা, কারণ সামরিক কারণে গমনাগমন কমিয়া যাওয়ায় রেলের আয় অনেক কম হইবে, অথচ যুদ্ধের চাপে জরাজীর্ণ রেলওয়েকে পুনর্গঠিত করার জন্য ব্যয় প্রচুর হইবে।

লবণের উপরে যে কর ধার্য্য ছিল তাহা হইতে সাধারণ বৎসরে ৭।৮ কোটি টাকা পাওয়া যাইত। গত বৎসর তাহাই আসিয়াছিল। সুপারী, তামাক, মদ, দেশলাই, কেরোসিন, পেট্রোল, আফিম, গাঁজা, প্রভৃতির উপর Excise কর আছে। ইহা হইতে রাজস্ব সাধারণ বৎসরের মতই হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের রক্ষিত অরণ্য হইতে, বিভিন্ন খনি হইতে, সেচ বিভাগ হইতে, করদ রাজ্যগুলির

দান হইতে, Currency এবং Mint হইতে এবং আরও নানাবিধ কর হইতে ৩০৭ কোটি টাকা গত বৎসরের বাজেটের সম্ভাবিত আয়।

বাজেটের হিসাব মত আলোচ্য বৎসরে ব্যয় অনেক বেশী হইবার কথা। ব্যয় সর্ব্বাধিক হয় সামরিক বিভাগে। যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও demobilizationএর জন্য খরচ অনেক হইয়াছে। এই বৎসর সামরিক খরচ ২৪৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছিল, বেসামরিক খাতে ১১২ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। বেসামরিক কার্য্যগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি উল্লেখযোগ্য। শাসন-যন্ত্র পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ্, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ্, প্রভৃতি রাখিতে হইয়াছে। রাজস্ব সংগ্রহের বিভাগ, পুলিশ বিভাগ, আদালত, প্রভৃতি এবং পেন্সন্, ছুটীর ভাতা, প্রভৃতির জন্যও ব্যয় হইয়া থাকে। অনেক সময়ে বিভিন্ন প্রদেশের ঘাটতি পূরণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার হইতে প্রদেশকে সাহায্য করা হয়। শিক্ষার উন্নতির জন্য, বিজ্ঞানের প্রসারের জন্য, শিল্পের সমৃদ্ধি, কৃষির অগ্রগতির জন্য, সেচ ব্যবস্থা সুষ্ঠু করিবার জন্য, রাস্তা ঘাট নির্ম্মাণ এবং রক্ষা করিবার জন্য, সরকারী ঋণের উপর সুদ দিবার জন্য, অরণ্যগুলিকে রক্ষা করার জন্য, বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য, বন্দরগুলিকে ঠিক রাখার জন্য, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করিবার জন্য এবং আরও শত শত স্থায়ী এবং অস্থায়ী কারণে কেন্দ্রীয় সরকারকে অর্থ ব্যয় করিতে হয়। তাহা ছাড়া Britain-কে Home charges দেওয়ার জন্য, অবসর-প্রাপ্ত বিদেশী অফিসারদের পেন্সন প্রভৃতি দেওয়ার জন্য অর্থব্যয় হইয়া থাকে। সবশুদ্ধ মিলাইয়া মোট ব্যয় ৩৫৫ কোটি টাকা হইবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। কিন্তু মোট আয় হইবে ৩০৭ কোটি টাকা। অতএব ৪৮ কোটি টাকা ঘাটতি পড়িবে। অর্থাৎ সরকারী ঋণের পরিমাণ এই বৎসরে ৪৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইবে। স্মরণ রাখা যাইতে পারে যে ১৯৪৫-৪৬ সালে বাজেটে ঘাটতি পড়িয়াছিল ১৫৫ কোটি টাকা। ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট যখন উত্থাপিত হয়, তখন এই ছিল

তাহার সম্ভাবিত আয় এবং ব্যয়। কিন্তু আমরা দেখিয়াছি প্রতি বৎসরই সম্ভাবিত আয়-ব্যয় হইতে প্রকৃত আয়-ব্যয় কিছু কমবেশী হইয়া থাকে। ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ্চ অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকারের অর্থসচিব যখন তাঁহার নূতন বাজেট উত্থাপন করেন, তাহার সহিত ১৯৪৬-৪৭ সালের "Revised" বাজেটের একটি হিসাব দাখিল করেন। ইহাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য বৎসরে মোট রাজস্ব আদায় হইয়াছিল ৩৩৬ কোটি টাকা, ব্যয় হইয়াছিল ৩৮১ কোটি টাকা এবং ঘাটতি পড়িয়াছিল ৪৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ প্রকৃত আয় এবং ব্যয় উভয়েই প্রায় ৩০ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

ভারত সরকারের ব্যয় সম্বন্ধে অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা শ্রুত হয়। স্বাভাবিক শান্তির বৎসরেও সামরিক থাতে ব্যয় প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। কোন সভ্য দেশের পক্ষে ইহা গৌরবের কথা নহে যে, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতির জন্য যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তাহার বহুগুণ ব্যয় হয় বন্দুক, কামান আর সৈন্যদের জন্য। সমরবিভাগে অর্থ ব্যয়ের দোষ আরও গুরুতর এই জন্য যে, ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে এখনও প্রচুর অভারতীয়কে রাখা হইয়াছে। অভারতীয়রা ভারতীয় অপেক্ষা অনেক বেশী মহিনা এবং সুবিধা পায়। সামরিক ব্যয় এবং অসামরিক ব্যয়ের মধ্যে যে অশোভন সামঞ্জস্যহীনতা তাহা যুদ্ধোত্তর যুগেও দূরীভূত না করিতে পারিলে ভারতীয় জনমত ন্যায়-সঙ্গত কারণেই বিক্ষুব্ধ হইবে।

অসামরিক ব্যয়ের বিরুদ্ধেও অনেক কথা বলিবার আছে। ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়সাপেক্ষ। উচ্চ কর্ম্মচারীদের এখানে প্রয়োজনাতিরিক্ত বেতন এবং ভাতা দেওয়া হয়। উচ্চ কর্ম্মচারীদের এবং নিম্ন কর্ম্মচারীদের মধ্যে প্রভেদ অত্যন্ত প্রকট ভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। এই সমস্ত ত্রুটির সমাধান হইতেছে যত শীঘ্র সম্ভব শাসন-যন্ত্রের বিভাগগুলিকে সম্পূর্ণ ভারতীয়-করণ, এবং নূতন নিযুক্ত ভারতীয়গণকে অল্পতর বেতন দিবার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত করিয়া ব্যয় সংকোচ করা।

যদি আমরা অন্য যে কোন দেশের বাজেটের সহিত ভারতীয় বাজেটের তুলনা করি, আমরা নিশ্চিত ভাবে দেখিতে পাই যে, ভারতীয় বাজেটে আজিও দরিদ্রদিগকে অন্য দেশের অপেক্ষা বেশী কর ভার বহন করিতে হয়। ভারতীয় বাজেটের দুই দিকেই দোষ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে ধনীদিগের নিকট যথেষ্ট কর লওয়া হয় না, অপরদিকে দরিদ্রদিগের জন্য যথেষ্ট ব্যয় করা হয় না এবং শাসনব্যবস্থাকে top-heavy করিয়া রাখা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকারের নূতন বাজেটের উল্লেখ করা প্রয়োজন। ভারতীয় জনমতের আদালতে বাজেটের যে স্থায়ী দোষগুলির কথা বলা হইত, সেইগুলিকে স্খালন করিবার চেষ্টা হইয়াছে অন্তর্ব্বর্ত্তীকালীন সরকারের প্রথম বাজেটের মধ্য দিয়া। ইহার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলি লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আগামী বৎসর হইতে লবণ-কর উঠাইয়া দেওয়া হইল। লবণ-কর উঠাইয়া লওয়ার দাবী ভারতীয় জন-সাধারণ অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছিল। সেইজন্য লবণ-কর রদ করিয়া দেওয়া ভারতীয় জনমতকে সন্তুষ্ট করিতে সাহায্য করিবে। দ্বিতীয়তঃ, আয়-কর দিবার সর্ব্বনিম্ন আয়ের পরিমাণ দুই হাজার টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া আড়াই হাজার টাকা করা হইল। যুদ্ধ যুগের অতিরিক্ত মুনাফা-কর রদ করা হইল বটে, কিন্তু ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকার বেশী হইলে লাভের শতকরা ২৫ টাকা কর দিতে হইবে। কর্পোরেশন ট্যাক্সের পরিমাণ এক আনা হইতে বৃদ্ধি করিয়া দুই আনা করা হইল। যে পরিমাণ আয়ের উপর সুপার ট্যাক্স ধার্য্য করা হইবে, তাহাকে যথাক্রমে ৩ লক্ষ ও ৫ লক্ষ হইতে ১'২ লক্ষ এবং ১'৫ লক্ষ টাকা করা হইল।

আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র পরিবর্ত্তন এই বাজেটের মধ্যে হইয়াছে। সমগ্রভাবে মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁর বাজেট এইরূপ দাঁড়ায়। রাজস্ব বাবদ আয় ২৭৯ কোটি টাকা, দেশরক্ষা খাতে ব্যয় ১৮৮ কোটি টাকা, বেসামরিক

১৩৯ কোটি টাকা, এবং মোট সম্ভাবিত ঘাটতি ৪৮ কোটি টাকা। মনে রাখা প্রয়োজন, পে-কমিশনের সুপারিশ গ্রহণ করার ফলে ভারত সরকারের যে ৩০ কোটি টাকা অধিক ব্যয় হইবে, তাহা এই বাজেটে ধরা হয় নাই। অর্থাৎ পে-কমিশনের সুপারিশ যদি এই বৎসরেই কার্য্যকরী হয়, তবে বাজেটের ঘাটতি বৃদ্ধি পাইয়া অন্ততঃ ৭৮ কোটি টাকা হইয়া দাঁড়াইবে। নূতন বাজেট সম্বন্ধে ভারতীয় জনমতের প্রতিক্রিয়া ভালোই হইয়াছে। ইহার কিছু কিছু সমালোচনা শ্রুত হইয়াছে বটে, তবু একথা অনস্বীকার্য্য যে, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের নূতন বাজেট অতীতের সমস্ত বাজেট হইতে পৃথক, এবং জনমত দ্বারা অধিক প্রভাবান্বিত। অবশ্য এই বাজেটকে আরও প্রগতিশীল করা যাইত, আরও জনস্বার্থের অনুকূল করা যাইত এবং আরও ব্যাপক করা যাইত। যাহা করা হয় নাই, তাহার জন্য ক্ষোভের কারণ থাকিলেও, যাহা করা হইয়াছে, তাহা সঠিকভাবে জানিয়া রাখা প্রয়োজন।

ভারতের আয়তন, লোক-সংখ্যা, ইত্যাদির অনুপাতে অন্যান্য দেশের তুলনায় আয় এবং ব্যয় উভয়েই অত্যন্ত কম। ইহার কারণ ভারতের অসাধারণ দারিদ্র্য এবং শিথিল শাসন-ব্যবস্থা। শিল্পের প্রসার এবং কৃষির উন্নতি না হইলে এবং জনসাধারণের আয় বৃদ্ধি না হইলে সরকারের আয় কোথা হইতে আসিবে? বর্ত্তমানে ভারতের ক্ষুদ্রায়তন বাজেট ভারতের দারিদ্র্যের পরিচায়ক; ভবিষ্যতে ভারতের উন্নত আর্থিক অবস্থা বাজেটের স্ফীতির মধ্যেই লক্ষিত হইবে।

ভারতের শ্রমিক জাগরণ

পুঁজিতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় মালিকের কাছে শ্রমিকের শ্রম একটা পণ্য মাত্র। শ্রমিকের শ্রম যথাসম্ভব অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া তাহার শ্রমজাত পণ্য দ্রব্যগুলিকে যথাসম্ভব উচ্চমূল্যে বাজারে বিক্রয় করাই হইল বর্ত্তমান ধনতান্ত্রিক উৎপাদন-ব্যবস্থার রীতি। এইভাবে মালিকেরা শ্রমিক এবং ক্রেতা উভয়কেই শোষণ করিয়া চলে এবং শ্রমিক দুই দিক হইতে শোষিত হয়—একবার পণ্যের উৎপাদক হিসাবে অল্প মূল্যে অধিক পরিশ্রম করিয়া এবং আর একবার পণ্যের ক্রেতা হিসাবে অতিরিক্ত মূল্যে নিত্য ব্যবহার্য্য পণ্য ক্রয় করিয়া। পুঁজিপতির এই উভয়বিধ শোষণ-নীতির উপর ভিত্তি করিয়াই ক্রমশঃ গড়িয়া উঠে বিরাট কলকারখানা, খনি, বিদ্যুৎ সরবরাহের কেন্দ্র, রেলপথ—ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ইমারত। কিন্তু পুঁজিপতির মুনাফাই শুধু বৃদ্ধি পায় না—তাহার শোষণের বিরুদ্ধে বিত্তহীন বঞ্চিতের চিত্তক্ষোভ জমিতে থাকে এবং শ্রমিকের একতাবদ্ধ প্রতিবাদও বাড়িয়া চলে। এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়া শ্রমিকেরা রাজনৈতিক চেতনা লাভ করে ও আপনার ঐতিহাসিক কর্ত্তব্য সমাপন করিবার জন্য অগ্রসর হয়।

আত্ম-সচেতন সংঘশক্তিতে বিশ্বাসী ও নির্ভরশীল শ্রমিক আন্দোলন ভারতে দীর্ঘ দিনের নহে। পৃথিবীর একটি অন্যতম উপনিবেশ হিসাবে এখানে ধনতন্ত্রের অভ্যুদয় হইতেই অন্যান্য অগ্রসর দেশের তুলনায় অনেক বিলম্ব হয়। জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার পরই বৃটিশ সরকারের হস্ত হইতে শিল্পপ্রসারের সুযোগ-সুবিধা বলপূর্ব্বক আদায় করা হইয়াছে এবং আজিও এখানে ধনতন্ত্র মধ্যগগনে উঠিতে পারে নাই। অতএব শ্রেণী হিসাবে ভারতের শ্রমিকেরা রূপ. লইতে সুরু করিয়াছে এই প্রথম মহাযুদ্ধের পর হইতে—জাতীয় আন্দোলনের সন্তান এবং পরিপূরক হিসাবে।

ভারতের শ্রমিক জাগরণের সাংগঠনিক প্রকাশ হইতেছে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস। ইহা স্থাপিত হয় ১৯২০ সালে। তবে সংস্থা গড়িয়া উঠার অনেক পূর্ব্বেই শ্রমিক আন্দোলন দেখা দেয় বিচ্ছিন্ন, অসংবদ্ধভাবে। ১৮৫৫ সালে মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলায় যে সাঁওতাল বিদ্রোহ ও ১৮৫৩—'৬০ সালে নীলকরদের বিরুদ্ধে বাংলার চাষীদের যে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ—তাহা ঘটিয়াছিল ভারতে ধনিক প্রথায় শিল্পব্যবস্থা গড়িয়া উঠার অনেক পূর্ব্বে। তাহার পর, প্রথম যখন যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা হইল, তখন ইংলণ্ডের মত এখানেও মাদ্রাজ ও বোম্বাই সহরে শ্রমিকেরা কারখানায় আগুন ধরাইয়া দিতে ও কলকব্জা অচল করিতে গিয়াছিল। শত্রু কলকব্জা নহে—শত্রু হইল কলের মালিক শ্রেণী—এই কথা বুঝিতে তাহাদের সময় লাগিয়াছিল। বোধ হয় ভারতে প্রথম শ্রমিক ধর্ম্মঘট হয় ১৮২৭ সালে নাগপুর এম্প্রেস মিলে। তারপর ১৮৮২ হইতে ১৮৯০ সালের মধ্যে বোম্বাই মাদ্রাজ প্রদেশে ২৫টি ধর্ম্মঘটের সংবাদ পাওয়া যায়। ১৮৮৪ সালটি শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এ বৎসর স্বর্গীয় লোকাণ্ডের নেতৃত্বে বোম্বাইএর শ্রমিকেরা সপ্তাহে একদিন ছুটি ও দুর্ঘটনার বাবদ খেসারতএর দাবী আদায় করিতে পারিয়াছিল। ইহার পর বঙ্গ ও আহমদাবাদেও কতকগুলি বৃহৎ ধর্ম্মঘট সংগঠিত হয়। ১৯০৫—১০ সালে শ্রমিক জাগরণ আরও সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। ১৯০৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলের কারখানায় এক বিরাট ধর্ম্মঘট হয়। বোম্বাইএর ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের প্রতি সহানুভূতি জানাইয়া বিভিন্ন রেলওয়ে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে। ১৯০৮ সালে লোকমান্য তিলকের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট করে। এইটিই ভারতীয় শ্রমিকের রাজনৈতিক চেতনাবিকাশের প্রথম দৃষ্টান্ত।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর রুশ বিপ্লবের প্রভাব ভারতে আসিয়া পৌঁছাইয়াছিল। তখন জাতীয় আন্দোলনের প্রসার হইতেছিল অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকেরা সহস্রে সহস্রে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ

করিতেছিল। ঠিক এই সময়ে শ্রীমতী এ্যানী বেসান্টের সহযোগী বি. পি. ওয়াদিয়া 'মাদ্রাজ লেবার ইউনিয়ন' নামে প্রথম শ্রমিক সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে লালা লাজপত রায়ের সভাপতিত্বে বোম্বাই সহরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ভিত্তি স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান কোন বিজ্ঞান-সম্মত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপর ভিত্তি করিয়া স্থুরু হয় নাই। শ্রমিকের দুঃখ-দারিদ্র্য যে সমস্ত মহানুভব ব্যক্তির হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল অথবা যাঁহারা বুঝিতেন যে, শ্রমিকের সক্রিয় সহযোগিতা ব্যতীত জাতীয় আন্দোলন সাফল্য-মণ্ডিত হইবে না—সেই সমস্ত জাতীয় নেতারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করিয়াছিলেন। ১৯২১ সালের ৩৯৫টি ধর্ম্মঘটের মধ্যে ২৯৭টি কৃতকার্য্য হয়। ঐ সময়ে আসামের চা-শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তাহার পর ১৯২৫ পর্য্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক হইতে হইতে তিন মাসব্যাপী বোম্বাই-এর কাপড়-কল ধর্ম্মঘটে রূপ নেয়। Whitley কমিশনের মতে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে এই সকল ধর্ম্মঘটের কারণ ছিল—অল্প বেতন অথচ জনসাধারণের ব্যয় অত্যন্ত বেশী, কলকারখানার মালিক এবং পদস্থ কর্ম্মচারীদের শ্রমিকদের উপর দুর্ব্ব্যবহার, অত্যন্ত অধিক পরিশ্রম, বাসস্থানের শোচনীয় অবস্থা, ইত্যাদি। ১৯২৬ এবং ১৯২৭ সালে মূল্যস্তর খানিকটা কমিয়া যাওয়ায় এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসায় ধর্ম্মঘটের সংখ্যা অনেক কমিয়া যায়।

১৯২৭ সালে কানপুরে ট্রেড ইউনিয়নের যে অধিবেশন হয়, তাহাতে প্রথম দেখা দেয়, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে দুইটি সুস্পষ্ট দল কার্য্য করিতেছিল—একটি প্রকৃত শ্রমিক স্বার্থ লইয়া কাজ করিতেছিল, অপরটি শ্রমিকের মধ্যে মালিকের স্বার্থ পরিপুষ্ট করিতেছিল। এই অধিবেশনেই ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব প্রথম গ্রহণ করার গৌরব ভারতীয় শ্রমিকেরাই অর্জ্জন করে। ১৯২৬ সালে বাংলা, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে শ্রমিক কৃষকদল গঠিত হয়; এবং ১৯২৮ সালে প্রাদেশিক দলগুলিকে একত্র করিয়া নিখিল ভারত শ্রমিক কৃষকদল গঠিত হয়। দুই বৎসর অপেক্ষাকৃত

শান্ত অবস্থার পর ১৯২৮ সালে দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের বন্যা বহিয়া যায়। ই. আই. রেলওয়েতে, লিলুয়ার কারখানায়, বোম্বাইএর কাপড় কলে, টাটার লৌহ কারখানায় এবং বাংলার চটকলে ধর্ম্মঘট চলিয়াছিল—বাহিরের কোন সাহায্য না লইয়াই। শ্রমিকেরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের অভাব-অভিযোগ মিটাইবার জন্য সংগ্রামের পথে অগ্রসর হয়। বোম্বাইএর গিরিনীকামগর ইউনিয়ন ভারতের শ্রমিক আন্দোলনের দৃষ্টান্তস্বরূপ গড়িয়া উঠে। এই ইউনিয়নের সভ্যসংখ্যা এই সময়ে পঞ্চাশ হাজারে পৌঁছায়। ইহার পর জি. আই. পি. রেল-মজদুর সংঘ, বাংলার চটকল মজুর সংঘ উল্লেখযোগ্য। Whitley Commissionএর মতে এই সময়কার শ্রমিক ধর্ম্মঘটের প্রধান কারণ ছিল—দেশের মধ্যে সাম্যবাদী প্রভাবের বিস্তার এবং শ্রমিকদের ভিতর সাম্যবাদীদের কার্য্যকলাপ। ১৯২৯ সালে সরকার ট্রেড্‌স্‌ ডিস্‌পিউটস্‌ আইন চালু করে। ঐ বৎসরই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা ভারত ও ভারতের বাহিরেও বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এই মামলা দ্বারা সরকার চাহিয়াছিল শ্রমিক আন্দোলনের জঙ্গী নেতৃত্বকে দমননীতির দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া দিতে। কিন্তু দেশীয় এবং আন্তর্জ্জাতিক জনমতের চাপে তাহারা খুব বেশী ক্ষতি করিতে পারে নাই।

ইহার পর শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে কয়েকটি দুর্ব্বৎসর আসে। বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের শ্রমিক আন্দোলন হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে না পারিয়া দক্ষিণপন্থীরা ন্যাশনাল ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করে। ১৯৩১ সালে আবার ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের মধ্যে বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের এবং সাম্যবাদীদের মধ্যে মতান্তর তীব্র হওয়ায় ভাঙ্গন আরম্ভ হয় এবং সাম্যবাদীরা রেড ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করে। ১৯৩৪ সালে সাম্যবাদী দলের সঙ্গে এই দলও বেআইনী হইয়া যায়। ১৯৩৭ সালে তাহারা পুনরায় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে যোগদান করিতে পারে। ১৯৩৮ সালে আবার দক্ষিণ পন্থীদের সহিত সর্ত্তাধীন ঐক্য হয়। ইহার পর হইতে যত

শ্রমিক আন্দোলন দেখা গিয়াছে সবই এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে। ১৯৩৮ সালে বোম্বাই, মাদ্রাজ এবং অন্যান্য স্থানে সরকারের দমননীতির প্রতিবাদ ও দাবী-দাওয়ার ভিত্তিতে ধর্ম্মঘট হয় এবং একাধিক প্রদেশে জনপ্রিয় মন্ত্রিত্ব থাকা সত্ত্বেও শ্রমিকদের উপর অবাধ অত্যাচার চলিতে থাকে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরই শ্রমিক ধর্ম্মঘট অত্যন্ত বাড়িয়া যায়। যুদ্ধের জন্য পণ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং জীবনযাত্রা দুর্ব্বহ হইয়া উঠে। তাহা ছাড়া জনসাধারণের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবও এই সকল ধর্ম্মঘটের অন্যতম রাজনৈতিক কারণ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রূপান্তর পরিগ্রহ করার পর হইতে ১৯৪২, '৪৩, '৪৪ সালে ট্রেড ইউনিয়ন শ্রমিকের সুখসুবিধা, দাবীদাওয়া আদায়ের আন্দোলন বজায় রাখিয়া উৎপাদন বৃদ্ধি ও যুদ্ধ-জয়কে নিজেদের কার্য্য-তালিকাভুক্ত করিয়া লয়। এই ক্ষেত্রে আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক রাজনীতিতে ভারতীয় শ্রমিকরা যে চেতনা দেখায় তাহা অভূতপূর্ব্ব। যুদ্ধের সময়ে রাজ-নৈতিক প্রভৃতি কারণে ধর্ম্মঘট হইলেও উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে শ্রমিকেরা দৃষ্টি দিবার জন্য ধর্ম্মঘট খুব ব্যাপক বা খুব স্থায়ী হইতে পারে নাই। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে সহায়তা করিবার জন্য ১৯৪২ সালে আহমদাবাদ, টাটানগর, প্রভৃতি স্থানে কর্ত্তৃপক্ষ বেতন দিয়া দু'চার মাস শ্রমিককে ধর্ম্মঘট করাইয়াছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই শ্রমিকেরা কার্য্যে যোগদান করার পর, যুদ্ধের জন্য ব্যাপকভাবে দ্রব্য সরবরাহ করিয়া—জাতীয়তাবাদের জন্য অশ্রুবিসর্জ্জন এবং প্রচুর মুনাফা স্বীকার—উভয়বিধ কর্ত্তব্যই একসঙ্গে পালন করিয়াছিলেন।

যুদ্ধোত্তর যুগে শ্রমিক আন্দোলন এক নূতন পর্য্যায়ে প্রবেশ করে।

সাল	ধর্ম্মঘট সংখ্যা	শ্রমিক সংখ্যা
১৯৩৯	৪০৬	৪৯৯,১৮৯
১৯৪০	৩২২	৪৫২,৫৩৯
১৯৪৫	৮৪৮	৭৮২,১৯২
১৯৪৫ (জানুয়ারী সেপ্টেম্বর)	১৪৬৬	১৭৩৭,৪৬২

উপরের সংখ্যা হইতে বুঝা যায়, ১৯৪৫ সালের শেষের অংশে এবং ১৯৪৬ সালের প্রথম নয় মাসের মধ্যেই ধর্ম্মঘট কিরূপ ব্যাপক হইয়াছে। ব্যাপকতা ছাড়াও এই সময়ের শ্রমিক আন্দোলনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে সর্ব্বপ্রথম নিম্নমধ্যবিত্ত, মধ্যবিত্ত, কেরাণী, ব্যাঙ্ক কর্ম্মচারী, প্রভৃতিরা আসিয়া শ্রমিকের সহিত শ্রমিকের কায়দায় ধর্ম্মঘট করে। শ্রমিক এবং কেরাণী উভয়েরই সমস্যা এই সময়ে এক হইয়া দাঁড়ায়। দ্রব্যের মূল্য অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে, মাগ্‌গী ভাতা তদনুরূপ বাড়ে নাই, শ্রমিকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি মালিকের কোন দৃষ্টি নাই, শ্রমিক এবং কেরাণী সহস্রে সহস্রে ছাঁটাই হইতেছে, বেকার-সমস্যার দুশ্চিন্তা উভয়কেই উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিতেছে। তাহা ছাড়া, যুদ্ধ শেষ হইয়া গেলেও, আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাতে নাগরিক স্বাধীনতা হইতে শ্রমিকদিগকে বঞ্চিত করা হইতেছে, নিজেদের দাবী আদায়ের আন্দোলন করার অধিকার তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া হইতেছে। এই সমস্ত অভাব-অভিযোগের অবসানকল্পে শ্রমিক এবং কেরাণীরা ব্যাপক সংগ্রাম সুরু করিয়াছে। ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই তারিখে ডাক ধর্ম্মঘট ও তাহার সমর্থনে সমস্ত শ্রমিক এবং কেরাণীর ধর্ম্মঘট শ্রমিক জাগরণের ইতিহাসে নূতন অধ্যায় রচনা করিয়াছে। তাহার পর হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সেই নূতন জাগরণের প্রকাশ চতুর্দ্দিকে দেখা যাইতেছে। শ্রমিকের জাগরণ দ্রুতভাবে ব্যাপক এবং গভীর হইতেছে।

১৯৪০ সালের ১লা জানুয়ারী ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সর্ব্বসমেত ৪০১টি ইউনিয়ন সংযুক্ত ছিল, এবং মোট সভ্যসংখ্যা ছিল সাড়ে চার লক্ষ। ১৯৪২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী সংযুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ৬০৮ এবং সভ্যসংখ্যা সওয়া সাতলক্ষ। একথা সত্য যে, শ্রমিকেরা এখনও তাহাদের লক্ষ্য হইতে অনেক দূরে। ভারতের পঞ্চাশ লক্ষ শ্রমিকের মধ্যে মাত্র সওয়া সাত লক্ষকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে সংঘবদ্ধ করা হইয়াছে। সমস্ত শ্রমিককে তাহাদের প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ করিয়া নির্ভুল নেতৃত্বের পথে তাহাদের পরিচালনা করা এখনও বাকী আছে। এখনও পর্য্যন্ত শ্রমিক আন্দোলন অত্যন্ত ভাসা ভাসা

এবং মামুলী উপায়ে চলিতেছে। জাগ্রত ঐক্য এবং ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ভারতীয় শ্রমিকের অধিকাংশই আজ পর্য্যন্ত অর্জ্জন করিতে পারে নাই। তবে একথা সত্য তাহাদের অগ্রগতি হইতেছে।

এই অগ্রগতির পথে তাহাদের অনেক বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হইতে হইবে। বাধা আসিবে বাহির হইতে এবং ভিতর হইতে। অতএব শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে করিতে শ্রমিক আন্দোলনের বিরোধী শক্তি-গুলির কথা মনে রাখা প্রয়োজন। শ্রমিক আন্দোলনের ভিতর হইতে যে সমস্ত বাধা আসিবে—তাহা হইতেছে শ্রমিক সম্বন্ধে ক্ষতিকর মতবাদ। যে মতবাদ অনেকদিন ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে, বা যাহা বহুজনে কোন একটি বিশেষ সময়ে সমর্থন করে—তাহাই যে শ্রমিক আন্দোলন সম্বন্ধে শেষ কথা—তাহা ঠিক নয়। শ্রমিক রাজনীতির সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্রমিক আন্দোলন সম্যকভাবে পরিবর্দ্ধিত হইতে পারে না। বাহির হইতে যে বাধা আসিবে তাহা আসিবে প্রধানতঃ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণীর নিকট হইতে—ধনিক এবং বণিক শ্রেণীর নিকট হইতে। সাম্রাজ্যবাদের অনুগ্রহপুষ্ট ভারতীয় ধনিক শ্রেণী ভারতীয় শ্রমিকের উপর নির্ব্বিচারে শোষণ এবং অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছে। এমন কি অনেক সময়ে তাহারা বিভিন্ন জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠানের আশ্রয় লইয়াছে, সস্তা দেশপ্রেমের বুলি আবৃত্তি করিয়াছে—নিজেদের শোষণকে আবরণ দিবার জন্য। ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় মূলধন এবং বিদেশী মূলধনের যৌথ শোষণ আরও তীব্র হইবে, শ্রমিকের বিরুদ্ধে অভিযান প্রবলতর এবং নির্ম্মমতর হইবে। ভারতীয় শ্রমিককে এ বিষয়ে সজাগ থাকিতে হইবে।

বাংলায় সমবায় আন্দোলন

আজকাল আমরা নানারূপ সমবায় প্রতিষ্ঠানের কথা শুনিয়া থাকি। সমবায় ব্যাঙ্ক, সমবায় ঋণদান-সমিতি, সমবায় তন্তুবায় সমিতি, সমবায় দুগ্ধ-সরবরাহ-প্রতিষ্ঠান, প্রভৃতি আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার মধ্যে দেখিতে পাই। কিন্তু এই সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলির মূল কথা কী? সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হইতে ইহাদের পার্থক্য কী? সাধারণ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য হইল—মুনাফা, যত বেশী মুনাফা হইবে, ব্যবসায়ের সাফল্য তত বেশী। কিন্তু সমবায়ের উদ্দেশ্য মুনাফা নহে। সমবায়ের উদ্দেশ্য ব্যবসাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্ত্তে পারস্পরিক সাহায্য এবং নির্ভরশীলতা। একজন বিচ্ছিন্ন বিত্তবিহীন ব্যক্তি তাহার একক চেষ্টায় শক্তিশালী ধনী ব্যবসায়ীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকিতে পারে না। কিন্তু অনেকগুলি এইরূপ ব্যক্তি যদি সংঘবদ্ধ হয়, তাহাদের সম্মিলিত কর্ম্মক্ষমতা, সততা এবং চেষ্টাশীলতার সাহায্যে তাহারা যে কোন ধনিক প্রতিষ্ঠানের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে পারে। সমবায় প্রথার ইহাই হইল মূলকথা। ধনোৎপাদনে এবং ধনবণ্টনে যখন আমরা প্রতিযোগিতাকে পরিত্যাগ করিয়া পারস্পরিক সাহায্য এবং উন্নতিকে মূলমন্ত্র করিয়া লই, তখনই বলা যাইতে পারে, আমরা সমবায় প্রথা অবলম্বন করিয়াছি। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন এবং বিনিময়-ব্যবস্থার নির্ম্মম প্রতিযোগিতাকে পরিত্যাগ করিয়া আমরা যখন ব্যবসায়ের সহিত নীতিবোধের সামঞ্জস্যবিধান করি, তখনই সমবায় প্রথা সম্ভব। এই প্রথার তিনটি লক্ষণ মনে রাখিতে হইবে। প্রথম হইতেছে, অনেকগুলি একক ব্যক্তির স্বেচ্ছাকৃত সংঘবদ্ধতা। দ্বিতীয় হইতেছে, মুনাফার পরিবর্ত্তে নীতিবোধের এবং নৈতিক আদর্শের গুরুত্ব, এবং তৃতীয় হইতেছে সমবেত চেষ্টার শিক্ষামূলক প্রভাব।

পৃথিবীর সকল দেশে অর্থনৈতিক জীবনের বিভিন্নক্ষেত্রে কৃষিতে, শিল্পে,

ব্যবসায়ে, বাণিজ্যে, ঋণদান ব্যাপারে সমবায় প্রথা বহু প্রসার লাভ করিয়াছে। ভারতেও এই প্রথা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়াছে। অর্থনীতিবিদ্‌গণের অভিমত এই যে, ভারতের বিশেষ অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাঠামোয় সমবায় প্রথা বিশেষভাবে প্রযুজ্য এবং ফলপ্রসূ। জনসাধারণের এক বিশাল অংশ ক্ষুদ্র কৃষিকার্য্য এবং ক্ষুদ্রতর কুটির শিল্পের সাহায্যে জীবন ধারণ করে। ধনতান্ত্রিক শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে অনগ্রসর। সমবায় প্রথা বিশেষ করিয়া যাহাদের সাহায্যের জন্য সৃষ্ট, সেই দরিদ্র শ্রেণীর লোকই ভারতে সর্ব্বাধিক। শুধু তাহাই নহে। ভারতের যে নিজস্ব ভাবধারা এই জীবনযাত্রা প্রণালীতে আছে, যাহা বহুযুগের ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়া এখনও স্থানে স্থানে পরিলক্ষিত হয়—তাহার সহিত সমবায় প্রথার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। আমাদের জাতিভেদ, শ্রেণীভেদ, যৌথ পরিবার এবং পঞ্চায়েৎ ব্যবস্থার ভিতর সমবায় প্রথার মর্ম্মবাণী লক্ষ্যণীয়।

সমবায় প্রথার উপযোগীতা এবং প্রয়োজনীয়তা যত রকম থাকা সম্ভব, ভারতে সবরকমই অত্যন্ত বেশী পরিমাণে আছে। ঠিকভাবে পরিচালিত হইলে ইহার সাহায্যে ভারতের অবর্ণনীয় দুঃখ-দারিদ্রের অনেকখানি উপশম হইতে পারে। ভারতের কৃষক রক্তপিপাসু মহাজনের শোষণে জর্জ্জরিত হয়; সমবায় প্রথার সাহায্যে তাহারা অল্পহারে সুবিধামত ঋণগ্রহণ করার ব্যবস্থা করিতে পারে। ভারতের কুটীরশিল্পী ধনী middleman দ্বারা প্রতিপদে প্রতারিত হয়; সমবায় প্রথার সাহায্যেই তাহারা অল্প মূল্যে কাঁচামাল ক্রয় করিতে এবং প্রস্তুত পণ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। ভারতের শিল্পশ্রমিক সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদা তাহার নিজের সর্দ্দারের দ্বারা শোষিত হয়—সমবায় প্রথাই ইহার একমাত্র সমাধান। ভারতের মধ্যবিত্তকে বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অর্থ ঋণ করিতে হয়; এবং অতি উচ্চহারে তাহার প্রতিবেশী মহাজনের নিকট ঋণ করা ব্যতীত তাহার অন্য কোন উপায় নাই। সহরের এবং অফিসের

সমবায় ঋণদান-সমিতি এই অসুবিধা অনেক পরিমাণে দূর করিতেছে ও করিতে পারে।

এই সকল প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই বাংলায় সমবায় সমিতির পত্তন এবং অগ্রগতির মূল কারণ। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে, ভারতে এবং বাংলার সমবায় সমিতি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং উৎসাহে গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯০৪সালে প্রথম Co-operative Society Act পাশ হয়; অনেকগুলি পল্লী সমবায়সমিতি গঠিত হয়। তখন প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষকদিগের মধ্যে মিতব্যয়িতা, স্বাবলম্বন এবং সংবদ্ধ চেষ্টার বহুপ্রসার। শীঘ্রই এই আইনের অসুবিধাগুলি ধরা পড়িতে লাগিল। এই সকল সমিতির অধিকাংশ সভ্য দরিদ্র কৃষিজীবি হওয়ার জন্য মূলধনের অভাব অনুভূত হইতে লাগিল। ১৯১২ সালে আবার এক আইন পাশকরা হয়। এই আইনে অনেকগুলি পল্লী সমিতি লইয়া এক একটি কেন্দ্রীয় সমিতি গঠন করিবার ব্যবস্থা করা হয়। এই কেন্দ্রীয় সমিতির কার্য্য হইবে পল্লী সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করা, এবং তাহাদের দৈনন্দিন কার্য্য কলাপকে সুপরিচালিত করা। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সরকার-নিযুক্ত Maclagan কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার পরে সমস্ত সমবায়-আন্দোলনের সংগঠনের এবং কার্য্যপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ১৯১৮ সালে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯১৯ সাল হইতে সমবায় আন্দোলন প্রাদেশিক সরকারের হস্তান্তরিত বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

ইহার পর হইতে মোটের উপর আন্দোলন বিস্তৃতিলাভ করিতে থাকে, এবং সংখ্যায়, মূলধনে, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তারে গুরুত্ব অর্জ্জন করিতে থাকে। ১৯২৯-৩০ সালে সমস্ত জগদ্‌ব্যাপী যে বাজার-মন্দা এবং অর্থসংকট দেখা দিয়াছিল, তাহার আঘাত বাংলার সমবায় আন্দোলনের উপর বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। শতকরা ৮০ হইতে ৯০টি সমিতিতে overdue ঋণ প্রচুর পরিমাণ জমিয়া উঠে, অনেক সমিতি সম্পূর্ণ কার্য্য বন্ধ

করিয়া দেয়, অনেকগুলি অত্যন্ত অল্পহারে কার্য্য করিতে থাকে। সমবায় আন্দোলনের উপর জনসাধারণের আস্থা কমিয়া যায়। ১৯৩৪-৩৫ সাল পর্য্যন্ত প্রায় এইরূপ অচল অবস্থা বজায় থাকে। তাহার পর আবার অতি ধীরে ধীরে উন্নতি দেখা দেয়। সরকার এবং সমবায় আন্দোলনের সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক বেসরকারী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান এই আন্দোলনের সংস্কারসাধনে এবং উন্নতি বিধানে বদ্ধপরিকর হন। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বহু পর্য্যবেক্ষণের পর সমবায় আন্দোলন সম্বন্ধে তথ্যবহুল এবং শিক্ষাপূর্ণ দুইটি রিপোর্ট প্রকাশিত করেন। বাংলায় নূতন Co-operative Society Act পাশ করা হয়; সরকারী তত্ত্বাবধানে এবং বেসরকারী উদ্যমে আন্দোলনকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করা হয়। ইহার ফলও দেখা দেয়। অনেক পুরাণো জরাজীর্ণ সমিতিকে অবলুপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। অনেক অর্দ্ধমৃত সমিতিকে সজীব করিয়া তোলা হয়; এইভাবে ১৯৩০ সালের সঙ্কট কাটিয়া যায়।

সমবায় আন্দোলনের স্বরূপ এবং কার্য্যকারিতা উপলব্ধি করিতে হইলে কতকগুলি তথ্য জানা প্রয়োজন। কার্য্যকারিতার দিক হইতে সমবায় সমিতিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—সমবায় ঋণদান সমিতি, ক্রয়-বিক্রয় সমিতি, উৎপাদন সমিতি, দুগ্ধ সমিতি। ইহাদের মধ্যে বাংলায় ঋণদান সমিতিই সংখ্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক এবং গুরুত্বেও সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ১৯৩৬ সালে বাংলার ২৩০০০ সমিতির মধ্যে ১৯০০০ ঋণ-দান সমিতি এবং ৪০০০ অন্যান্য সমিতি ছিল। সর্ব্বসমেত মূলধন ছিল ১৯ কোটী টাকা এবং সভ্যসংখ্যা ছিল ৮ লক্ষ। সংগঠনের দিক হইতে সমিতিগুলিতে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—প্রাথমিক, মাধ্যমিক, প্রাদেশিক। ইহাদের মধ্যে প্রাথমিক সমিতিগুলির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কেন্দ্রীয় সমিতিগুলির সংখ্যা ছিল ৬৬৬, প্রাদেশিক সমিতি একটি। বাংলার সামগ্রিক উন্নতি বিধানের জন্য প্রথমতঃ ঋণ-দান সমিতির অগ্রগতির এবং দ্বিতীয়তঃ ক্রয়-বিক্রয় সমিতির এবং উৎপাদন সমিতির বহুল উপযোগিতা আছে।

বাংলার সমবায় আন্দোলন ১৯৩০-৪০ দশকে গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু এই সঙ্কটের কারণ কি? সমবায় প্রথা সম্বন্ধে সভ্যগণের অজ্ঞতা, স্বার্থান্বেষীদিগের সক্রিয় শক্রতা, জনসাধারণের ঔদাসীন্য, সরকারের উদ্যমের অভাব, দেশের অসাধারণ দারিদ্র্য—সবগুলিই উল্লেখযোগ্য কারণ। এখন আমাদের সম্মুখে প্রশ্ন—আমরা এই সকল দোষগুলিকে দূর করিয়া সমবায় আন্দোলনকে সুগঠিত করিয়া দেশের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করিতে পারিব কিনা? সমবায় আন্দোলনের প্রসার সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার আরম্ভ হইয়াছিল সত্য—কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক কল্যাণের সম্ভাবনা বিদ্যমান। দেশপ্রেমিক জনসাধারণের এই কার্য্যে যতদূর সম্ভব সহযোগিতা করা একান্ত প্রয়োজন। "If Co-operation fails, thereby fail the hopes of Bengal." এই কথা আমাদের সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। দেশের কাজের জন্য আমরা সর্ব্বদা স্বার্থত্যাগে প্রস্তুত। আমাদের সমস্ত চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ, উদ্দীপনা, স্বার্থত্যাগ, দেশপ্রেম লইয়া জনসাধারণের সেবার জন্য সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করিতে হইবে। আমাদের অসংখ্য দুঃখ দারিদ্র্যের ইহাই প্রধানতম সমাধান।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

অর্থ ঋণ লওয়ার ও অর্থ গচ্ছিত রাখার ইতিহাস অর্থের ইতিহাসের মতই প্রাচীন। এইরূপ ব্যক্তিগতভাবে ব্যাঙ্কের কার্য্য অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে। মনুর শ্লোকে ব্যাঙ্কের কার্য্য সম্বন্ধে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি Double Entry র মত আধুনিক প্রণালীর উল্লেখ ৩০০০ বৎসর পূর্ব্বের ভারতীয় গ্রন্থে আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইষ্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানী যে ব্যবসা করিত, তাহার জন্ম অর্থ ঋণ করা হইত প্রধানতঃ ব্যক্তিগত দায়িত্বে ধনী মহাজন বা শেঠের নিকট হইতে। ক্রমশঃ ভারতের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রয়োজন বাড়িতে লাগিল। এই সময় হইতে আধুনিক যুগের ব্যাঙ্ক কার্য্য স্থরু হইল, ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের পত্তন হইতে লাগিল। Presidency Bankই হইতেছে আধুনিক ভারতীয় ব্যাঙ্কের প্রথম সংস্করণ।

বর্ত্তমানে ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থাকে অনুধাবন করিতে হইলে ইহার বিভিন্ন অংশগুলিকে জানা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে ইহার মধ্যে পাঁচটি প্রধান অংশ দেখা যায়, (১) ব্যক্তিগত মহাজনী কারবার, (২) কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, (৩) বৈদেশিক বিনিময় ব্যাঙ্ক, (৪) রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এবং (৫) কো-অপারেটিভ্ ব্যাঙ্ক। ইহা ছাড়াও পোষ্ট্যাল সেভিংস্ ব্যাঙ্ক, ক্যাশ সার্টিফিকেট্ ব্যবস্থা, সরকারী কাগজ, প্রভৃতির মধ্য দিয়া উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ব্যাঙ্কের কার্য্য করা হয়। তবে প্রথম পাঁচটির বিষয় জানিলেই ভারতীয় ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার বিষয়ে মোটামুটি জ্ঞান হইবে।

প্রাচীন পন্থায় যে ব্যক্তিগত মহাজনী কারবার প্রচলিত আছে তাহার গুরুত্ব আমরা অনেক সময়ে সম্যক উপলব্ধি করি না। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য্য যে, মহাজন, শেঠ, শ্রফ্ (shroff), সাহুকর, প্রভৃতি না থাকিলে ভারতের কোটি কোটি কৃষক এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রয়োজনের সময়ে অর্থ ঋণ করিতে পারিত না। সাহুকর মহাজনেরা দেশের সর্ব্বত্র প্রতি গ্রামে, সহরের পল্লীতে পল্লীতে বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে—এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত দায়িত্বে এবং ঝুঁকিতে অর্থ ঋণ দিতেছে। সংগঠিত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানগুলি আজিও জনসংখ্যার অত্যন্ত ক্ষুদ্র অংশকেই সেবা করিতে পারে; জনসাধারণের সুবৃহৎ অংশ প্রয়োজনের সময়ে এই দেশীয় মহাজনের নিকট ঋণ লইয়া থাকে। অবশ্য এই সুবিধার জন্ম তাহাদের মূল্য দিতে হয় অত্যন্ত বেশী। দেশী মহাজন-গণের সুদের হার অত্যন্ত বেশী; তাহার উপর নিরক্ষর অধমর্ণদের

সহিত হিসাব-নিকাশে তাহারা নানারূপ অসাধু প্রণালী গ্রহণ করিয়া থাকে। এই অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও দেশীয় মহাজনী কারবার তুলিয়া দিবার প্রয়োজন বা সম্ভাবনীয়তা নাই। Debtors' Act, Money-lender's Act, License System, প্রভৃতির সাহায্যে তাহাদের সুদের হার কমাইবার চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাদের অসাধু প্রণালীকে সংযত করিতে হইবে। এই চেষ্টা বিভিন্ন প্রদেশে কিছু কিছু হইয়াছে, কিন্তু আরও ব্যাপকভাবে চেষ্টা প্রয়োজন।

বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থ সাহায্য করিবার জন্য Foreign Exchange Bankগুলির জন্ম হয়। এই ব্যাঙ্কগুলি বিদেশী Bill of Exchange ক্রয় করে, অথবা তাহার উপর টাকা ধার দেয়। যখন 'ক' কলিকাতা হইতে লণ্ডনে 'খ'কে ১০০০ মণ পাট বিক্রয় করে, বিক্রয় লব্ধ অর্থ সে তৎক্ষণাৎ পায় না। 'ক' 'খ'-এর নামে একটি Bill তৈয়ারি করে, 'খ' সহি করিয়া সেটি স্বীকার করিয়া লয়, এবং 'ক' সেই Bill কলিকাতার কোন Exchange ব্যাঙ্কের নিকট কিছু কমিশন দিয়া (Discount) বিক্রয় করে; ব্যাঙ্ক আবার বিলটি তিন মাস পরে 'খ'-এর নিকট হইতে টাকা আদায় করিয়া লয়। এই Exchange Bankগুলি সাধারণতঃ বিদেশীর দ্বারা পরিচালিত। ভারতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক কোনরূপ Exchangeএর কাজ করে না। এই ব্যবসা করিতে গেলে বিদেশে শাখা খুলিতে হয়; মূলধনের যথেষ্ট অভাব, বৈদেশিক টাকার বাজার হইতে ধার পাইবার কোন উপায় নাই, বৈদেশিক ব্যাঙ্কগুলির তীব্র প্রতিযোগিতা সর্ব্বদাই আছে, এবং সর্ব্বোপরি এই বিষয়ে কাজ-জানা ভারতীয় কর্ম্মচারীর অভাব অত্যন্ত বেশী;—এইসব কারণে ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলি এই Exchangeএর কাজ করিতে পারে না।

পূর্ব্বে ইংল্যাণ্ড আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যে প্রধানতম অংশ গ্রহণ করায় এবং লণ্ডন আর্থিক জগতের কেন্দ্র হওয়ায় প্রথম Exchange Bank-গুলি ইংরাজের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত। পরে অন্যান্য দেশের সহিতও আমাদের

সম্বন্ধ গড়িয়া উঠার সহিত, অন্যান্য দেশের ব্যাঙ্কগুলি এখানে তাহাদের শাখা খুলিতে আরম্ভ করে। ১৯৪৩ সালে ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত ১৬টি Exchange ব্যাঙ্ক ছিল, ইহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৬ কোটি ৪½ পাউণ্ড এবং রিজার্ভ ইত্যাদি ছিল ৪ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড।

পূর্ব্বে বলা লইয়াছে, ভারতের মধ্যে বাণিজ্যের ক্রমশঃ বৃদ্ধি হওয়ায় সংগঠিত ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন হইতে থাকে। Bank of Upper India নামক প্রথম ভারতীয় Joint Stock ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালে। এবং ইহার পর ১৮৬৫ সালে Allahabad Bank স্থাপিত হয়। ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে ভারতে বিশেষতঃ পাঞ্জাব এবং যুক্তপ্রদেশে অনেক নূতন ব্যাঙ্ক স্থাপিত হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কিং কার্য্যের অনভিজ্ঞতার জন্য, ফাট্‌কা খেলার দিকে দৃষ্টি দেওয়ার দরুণ ও হাতে কম নগদ পুঁজি (Cash Reserve) থাকার জন্য, এবং Subscribed এবং Authorised Capitalএর মধ্যে ঠিক সামঞ্জস্য না থাকায়, এই উন্নতির কয়েক বৎসরের মধ্যেই ব্যাঙ্ক ফেল হইতে আরম্ভ করে। শক্তিশালী ব্যাঙ্কিংএর অ, আ, ক, খ হইতেছে উপযুক্ত পরিমাণে Cash Reserve রক্ষা করা। ভারতবর্ষে ইহা না করার জন্য অত্যন্ত বেশী মূল্য দিতে হইয়াছে।

১৯৩৭ সালের শেষে এক লক্ষ টাকার উপর মূলধন ও পুঁজি আছে এমন ব্যাঙ্ক ছিল ১৫১টি, তাহাদের আদায়ীকৃত মূলধন ছিল ৭৭৩ লক্ষ টাকা, সঞ্চিত পুঁজি ছিল ৬২৭ লক্ষ টাকা এবং ডিপজিট ছিল ১০৮৬৬ লক্ষ টাকা। গত মহাসমরে ভারতে ব্যাঙ্কের সংখ্যা, মূলধন ও ডিপজিট চমকপ্রদভাবে বাড়িয়াছে। ১৯৩৯এর সেপ্টেম্বর হইতে ১৯৪৫এর ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ব্যাঙ্কের অফিসের সংখ্যা ১২৫২ হইতে ২৭৫৫ হইয়া দাঁড়ায়। আমাদের অনগ্রসর দেশে ব্যাঙ্কের অগ্রগতির এই ছবি অর্থনৈতিক অবস্থার একটি উৎসাহপূর্ণ ইঙ্গিত দেয়; কিন্তু টাকার স্বচ্ছলতাবশতঃ কতকগুলি বিপদ্‌জনক আভাস পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কিছুদিন পূর্ব্বে Shareএর মূল্য হ্রাস হওয়ার জন্য অনেকগুলি

ব্যাঙ্ক Liquidationএ গিয়াছে এবং কোন কোন ব্যাঙ্ককে বৃহত্তর ব্যাঙ্কের সহিত সম্মিলিত হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। Reserve Bankএর গবর্ণর স্যার দেশমুখ এই পরিস্থিতির একটু সুন্দর সারাংশ করিয়াছেন—যাহা এই স্থানে বলা প্রয়োজন। প্রথম, কোন কোন ব্যাঙ্ক, ব্যাঙ্ক নয় এরূপ প্রতিষ্ঠানের Share মূল্য বা আয়ের দিকে দৃষ্টি না রাখিয়াই ক্রয় করিতেছে। কেহ কেহ যে সমস্ত কোম্পানীতে তাহাদের ডিরেক্টরদের স্বার্থ আছে, সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিতেছে যাহার ফলে ব্যাঙ্ক এবং কোম্পানীর স্বার্থ বিপদজনকভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ ব্যাঙ্ক সহরের যে সমস্ত স্থানে ব্যাঙ্কের সুবিধা আছে সেই সমস্ত স্থানেই বিপুল সংখ্যায় শাখা খুলিয়া উচ্চহারে deposit লইবার চেষ্টা করিতেছে। ইহার ফলে এই ব্যাঙ্কগুলিকে ফাট্‌কা খেলার মত বিপদজনক ও লাভজনক কারবার করিতে হইতেছে। তৃতীয়তঃ, তাহাদের Balance Sheet এমনভাবে সাজাইয়া প্রচার করিতেছে যাহাতে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণের ভুল ধারণা সৃষ্ট হইয়াছে। শক্তিশালী এবং সংগঠিত ব্যাঙ্ক সংগঠনের পক্ষে এই সব অভ্যাস অত্যন্ত মারাত্মক; এবং ভারতীয় শিল্পোন্নতির ও সংগঠিত টাকার বাজার সৃষ্টি করার জন্য ব্যাঙ্ক-জগতকে এই প্রকার অভ্যাস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে হইবে। তাহা না হইলে আসন্ন ব্যবসা-সঙ্কটের কালো ছায়া ফেল-করা ব্যাঙ্কের মধ্য দিয়া দেশে চরম দুর্দ্দিন ডাকিয়া আনিবে।

ভারতীয় টাকার বাজার এক্ষণে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও অসংগঠিত। উহার ফলে প্রথমতঃ সুদের হার খুব চড়া; দ্বিতীয়তঃ, কোন কেন্দ্রীয় ঋণের পরিমাণ বা মূল্যান্তর নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। এই অবস্থার অবসান করিয়া ও টাকার বাজার সুসংগঠিত করিবার জন্যই ১৯৩৫ সালে Reserve Bank স্থাপিত হয়। ইহার মূল উদ্দেশ্য ছিল দুইটি—দেশের ব্যবসার জন্য উপযুক্ত মুদ্রা সৃষ্টি করা এবং ভারতীয় মুদ্রা অর্থাৎ টাকার জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মূল্য ঠিক রাখা। এই

দ্বিবিধ উদ্দেশ্য সফল করিবার জন্য Reserve Bank এর হস্তে, ব্যাঙ্ক কি হারে টাকা ধার দিবে তাহা নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। Bank rate কমাইয়া দিয়া বা বাড়াইয়া দিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যবসা-জগৎ এবং মূল্যান্তরকে প্রভাবান্বিত করিবে।

Bank rate ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলি অস্ত্র কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের হাতে আছে—যথা—ধার রেশন করিয়া দেওয়া, নৈতিক উপদেশ দেওয়া, খোলা বাজারে Govt. Security ক্রয়-বিক্রয় করা, কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের Cash Reserve কমাইয়া বা বাড়াইয়া দেওয়া। ভারতের বাজারে নানারূপ অসুবিধা এবং জটিলতা থাকার জন্য সেই সমস্ত অস্ত্রও বিশেষ কার্য্যকরী হয় না। টাকার বাজার নিয়ন্ত্রণ করা ছাড়া অন্য যে সমস্ত গৌণ কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে, সেই সমস্ত কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মোটামুটি সাফল্যের সাথে করিয়া আসিতেছে। Note Issue করা, গভর্ণমেণ্টের নানারূপ ব্যাঙ্কের কার্য্য করা, জনসাধারণকে এবং গভর্ণমেণ্টকে একস্থান হইতে অন্যস্থানে টাকা পাঠাইবার সুযোগ দেওয়া, এবং কৃষিঋণ এবং সমবায় সমিতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া—এই সমস্ত কাজ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক করিয়া চলিতেছে।

১৯৪৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কে যে Banking Bill উপস্থাপিত হয়, তাহাতে শক্তিশালী ব্যাঙ্কগঠনের জন্য পরিকল্পনা অনুসারে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে কয়েকটি নূতন ক্ষমতা দেওয়া হয়। Schedule-ভুক্ত কোন বিদেশী ব্যাঙ্কের দেশে যদি ভারতীয় ব্যাঙ্ক অনুরূপ সুবিধা না পায়,—তাহা হইলে সেই ব্যাঙ্কগুলিকে এবং অ-শীডিয়ুলভুক্ত সমস্ত ব্যাঙ্ককে ভারতে ব্যবসা করিতে গেলে পাঁচ বৎসরের মধ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট লাইসেন্স লইতে হইবে। কোন ব্যাঙ্কের পক্ষ হইতে কোন শাখা খুলিতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে অনুমতি পত্র লইতে হইবে। তৃতীয়তঃ, ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে মিলিত হইতে গেলে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট অনুমতি পত্র আবশ্যক। এই তিনটি ক্ষমতার দ্বারা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ব্যাঙ্ক-জগতের ক্রমবিকাশকে উন্নতির পথে চালিত

করিতে পারে। অতএব বর্ত্তমানে ভারতীয় টাকার বাজার সঙ্কীর্ণ এবং অ-সংগঠিত হইলেও, যুদ্ধ-পরবর্ত্তী যুগে শিল্পোন্নতির সহিত এবং দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির সহিত ব্যাঙ্ক-জগতের উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী এবং ইহার মধ্য দিয়াই টাকার বাজার ক্রমশঃ সংগঠিত হইয়া উঠিবে, এই আশা আমরা করিতে পারি।

ভারতের স্বাস্থ্য

সভ্যতার মাপকাঠি যদি হয় শিক্ষা, তবে সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি বলা যায় স্বাস্থ্যকে। এই দিক হইতে বিচার করিয়া ভারতবর্ষকে সভ্যতার খুব উচ্চ ধাপে বসানো যায় না। শিক্ষার ব্যাপারে যেমন আমরা দেখিয়াছি এখানে মাত্র শতকরা ১১জন শিক্ষিত, খাদ্যের ব্যাপারে যেমন দেখিয়াছি ভারত তাহার নিজের খাদ্য উৎপাদনে অক্ষম, শিল্পের ব্যাপারে যেমন দেখিয়াছি প্রচুর সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও অত্যন্ত অনগ্রসর আমাদের দেশ, স্বাস্থ্যের ব্যাপারেও আমাদের অবস্থা অনুরূপই। সহজ-প্রতিরোধ্য অসুখগুলিও এখানে অত্যন্ত ব্যাপক, মারাত্মক অসুখগুলি দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে, শিশু মৃত্যুর হার ভয়াবহ, এবং জীবনের গড় দৈর্ঘ্য মাত্র ২৭ বৎসর। কোন দেশের স্বাস্থ্যের অবস্থা নির্ভর করে সেখানকার জীবনযাত্রার মানের উপর, শিক্ষার বিস্তারের উপর এবং জনস্বাস্থ্য বিভাগের যোগ্যতার উপর। ভারতে জীবনযাত্রামান অত্যন্ত নিম্ন, শিক্ষার প্রসার স্বল্প, আর জনস্বাস্থ্য বিভাগ অকিঞ্চিৎকর। তাই এখানে স্বাস্থ্যের অবস্থা যে শোচনীয় তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কারণ নাই।

কতকগুলি ক্ষুদ্র সংখ্যা হইতে ভারতের স্বাস্থ্যের মান বোঝা যাইবে।

ইংল্যাণ্ডে জন্মের হার হাজার-করা ১৭, অষ্ট্রেলিয়ায় ১৭'৪, ভারতে ৩৪'৫। মৃত্যুর হার ইংল্যাণ্ডে হাজার-করা ১২'২, অষ্ট্রেলিয়ায় ৭'৪, ভারতে ২২'৪। জীবনের গড় দৈর্ঘ্য ইংল্যাণ্ডে ৫০ বৎসর, অষ্ট্রেলিয়ায় ৬৩ বৎসর, ভারতে ২৭ বৎসর। শিশু-মৃত্যুর হার ইংল্যাণ্ডে ৫৮, অষ্ট্রেলিয়ায় ৩৮, ভারতে ১৬২। ইহা ছাড়াও টাইফয়েড, যক্ষ্মা, প্রভৃতি কঠিন ব্যাধিগুলি যখন সভ্যদেশ হইতে প্রায় বিতাড়িত হইতেছে, ঠিক তখনই আমাদের দেশের উদার আশ্রয়ে তাহারা স্থায়ী বসতি করিতেছে। বসন্ত, কলেরা, প্রভৃতি প্রতিরোধ্য অসুখগুলি যখন অন্যান্য দেশে প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আমাদের দেশে তখন দেখিতে পাই, প্রতি বৎসর সহস্র নয়, লক্ষ মানুষ এই সমস্ত ব্যাধিতে মরিতেছে। ম্যালেরিয়ার মত সামান্য অসুখকেও দূর করিবার মত সামর্থ্য আমাদের নাই। যক্ষ্মা হইতে মৃত্যুর হার হাজার-করা New York সহরে ৪৭, Londonএ ৮৭, কলিকাতায় ২৭০। টাইফয়েড হইতে মৃত্যুর হার Newyorkএ ০২, Londonএ ০'৪, কলিকাতায় ৯০। কলেরায় মৃত্যুর হার Newyorkএ ০, Londonএ ০, কলিকাতায় ৫০। অথচ একথা সত্য যে, যক্ষ্মা বা টাইফয়েড আমাদের দেশ অপেক্ষা ঐ সকল দেশে বেশী হইত, এবং বসন্ত, কলেরা, প্রভৃতি অসুখগুলি সহজেই প্রতিরোধ করা যায়।

এই ভয়াবহ অবস্থা আসিল কিরূপে? এই জিজ্ঞাসা যে কোন দেশ-প্রেমিকের মনে অহরহঃ জাগরিত হয়। শরীরকে সুস্থ রাখার জন্য প্রথম প্রয়োজন পর্য্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য, দ্বিতীয়—ভালো স্বাস্থ্যকর গৃহ, তৃতীয়—স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জনসাধারণের উপযুক্ত শিক্ষা এবং চেতনা। ভারতে ইহার কোনটি আছে? পুষ্টিকর খাদ্যের কথা দূরে থাকুক, কোন খাদ্যই আমাদের দেশবাসীর একটি বিশাল অংশ নিয়মিত পায় না। এখানে শতকরা ৫০ জন লোক চির-জীবন ধরিয়া hungerlineএর নিকটেই বাস করে। আর অবশিষ্ট যে ৫০জন, তাহারা পরিমাণে পর্য্যাপ্ত খাদ্য সংগ্রহ করিতে পারিলেও, গুণগতভাবে তাহাদের খাদ্যের উপযোগিতা খুবই কম। দুধ, ডিম, মাছ, মাংস, ফল, প্রভৃতি

স্বাস্থ্যকর খাদ্য আমাদের মধ্যবিত্তরাই সংগ্রহ করিতে পারে না,—নিম্ন মধ্যবিত্ত, কৃষক, শ্রমিকের কথা দূরে থাকুক। দেশের মোট খাদ্যের শতকরা ৮০।৯০ ভাগ সংগৃহীত হয় চাউল, গম, জোয়ার, বাজরা, প্রভৃতি সস্তা শস্য হইতে। পূর্ব্ব ভারতের প্রধান খাদ্য চাউল, চাউলে প্রধানতঃ আছে কার্ব্বোহাইড্রেট, Protein sugar, fat চাউলে নাই, তাই চাউল খাইয়া জীবনধারণ সম্ভব হইলেও স্বাস্থ্য-লাভ সম্ভব নহে। উত্তর ভারতের প্রধান খাদ্য গম। গম অপেক্ষাকৃত পুষ্টিকর, সেইজন্য উত্তর ভারতের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভালো। দক্ষিণ ভারতে বাজরা, জোয়ার, প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বাস্থ্যপ্রদ শক্তি বিশেষ নাই। তাই দক্ষিণ ভারতের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য ভালো নয়। ভারতে গরুর সংখ্যা পৃথিবীর অন্য সকল দেশ অপেক্ষা বেশী। কিন্তু মনোযোগের অভাবে সংখ্যার অনুপাতে দুধ হয় অল্প। দুগ্ধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য অধিকাংশ লোকই পায় না। ভারতের জনসাধারণের এক বিশাল অংশ মাছ-মাংস খায় না—যাহারা খায় তাহারাও অধিকাংশ সময়ে পায় না। নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণীতে মাছের চাষের প্রচুর সুবিধা থাকিলেও, বৈজ্ঞানিক উপায়ে মাছের চাষ বা ডেয়ারীতে অন্যান্য পশুর চাষ আমাদের দেশে সুরু হয় নাই। পুষ্টিকর ফল অত্যন্ত অল্প উৎপন্ন হয়—আর যেটুকু উৎপন্ন হয় তাহা হয় বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়, নতুবা জনসাধারণের এক অতি ক্ষুদ্র বিত্তবান্ অংশের ব্যবহারের জন্য চলিয়া যায়।

খাদ্য ব্যতীত স্বাস্থ্যের জন্য আবশ্যক স্বাস্থ্যকর গৃহ। দরিদ্র দেশে ইহার অভাবও অত্যন্ত প্রকট। বম্বে, আমেদাবাদ, শোলাপুর, নাগপুর, মাদ্রাজ, কানপুর, কলিকাতা, প্রভৃতি যে কয়টি শিল্পাঞ্চল আছে, সর্ব্বত্রই শ্রমিকের বাসগৃহের অবস্থা পীড়াদায়ক। অত্যন্ত স্বল্পপরিসর, স্যাঁৎস্যেঁতে, আলো-হাওয়া শূন্য, নোংরা, অস্বাস্থ্যকর গৃহে আমাদের শ্রমিকেরা বাস করে। আমাদের পল্লীগ্রামগুলিতে শ্রমিকবস্তীর এই সমস্যাগুলি না থাকিলেও, শীত বর্ষা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ হইতে রক্ষা পাইবার মত উপযুক্ত বাসগৃহ কোন

কৃষকেরই নাই। আমাদের জনসাধারণ মাথাপিছু গড়ে বৎসরে ১৫ হাত বস্ত্র ব্যবহার করে। ইহার দ্বারা লজ্জা-নিবারণ সম্ভব, শরীর রক্ষা সম্ভব নয়। খাদ্য নাই, বস্ত্র নাই, আশ্রয় নাই—রোগ হইবার পূর্ব্বে রোগকে প্রতিরোধ করিবার কোন উপকরণই আমাদের নাই।

শুধু তাই নয়। জনসাধারণের মধ্যে রোগ সম্বন্ধে শিক্ষা বা চেতনারও একান্ত অভাব। স্বাস্থ্যশিক্ষা সাধারণ শিক্ষারই এক অপরিহার্য্য অংশ। কিন্তু সাধারণ শিক্ষাই যেখানে অত্যন্ত অল্প এবং সঙ্কীর্ণ সেখানে স্বাস্থ্য-শিক্ষার বহু প্রসার হইতে পারে না। রোগকে আমরা ভয় করি, রোগ হইতে দূরে থাকিতেই আমরা চাই। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কৃতির যে স্তরে আমাদের জনসাধারণ পড়িয়া আছে, তাহাতে রোগকে প্রতিরোধ করিবার মত বুদ্ধি বা শক্তি তাহাদের নাই। মধ্যে মধ্যে ম্যাজিক ল্যাণ্টার্ণ, পোষ্টার, প্রভৃতির সাহায্যে সরকারের পক্ষ হইতে যে স্বাস্থ্য-শিক্ষা দেওয়ার প্রচেষ্টা হইয়া থাকে, তাহা বস্তুতঃ স্বাস্থ্য শিক্ষার Caricature হইয়া দাঁড়ায়। স্কুলসমূহে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহার ফল খানিকটা আছে; কিন্তু পণ্ডিতদের মতে স্কুলের Hygiene শিক্ষাও অত্যন্ত ত্রুটিপূর্ণ। যে উপায়ে শিক্ষাদান করিলে শিশুর মনে স্বাস্থ্যরক্ষার সম্বন্ধে মূল কথাগুলি স্থায়ীভাবে প্রবেশ করে, সেই উপায় অবলম্বন করা হয় না। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্য-চেতনা বইএর সূত্র এবং রোগের নাম মুখস্থ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিয়া যায়।

বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী জনসাধারণের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় দায়িত্ব প্রধানতঃ প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত, গৌণতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের এবং কতকগুলি বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের যুক্তদায়িত্বে। কেন্দ্রে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মকর্ত্তা হইতেছেন ভারতীয় মেডিক্যাল সার্ভিসের ডিরেক্টর জেনারেল। তিনি শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং ভূমি বিভাগের অধীনে কার্য্য করেন। Director Generalএর অধীনে কার্য্য করেন Public Health

Commission এবং তাঁহার কর্ম্মচারীবৃন্দ। Central Advisory Board of Healthএর পরিচালনা, নানাবিধ তথ্য-সংগ্রহ এবং তথ্য-পরিবেশন, আন্তর্জ্জাতিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কার্য্য, Malaria Institute, All India Institute of Hygiene and Public Health এবং Medical Research Departmentএর কার্য্য তাঁহারই পরিচালনাধীনে হইয়া থাকে।

স্বাস্থ্য ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে সকল কায্য করিয়া থাকেন তাহা প্রধানতঃ উপদেশমূলক এবং শিক্ষাবিষয়ক। প্রাদেশিক সরকারের কায্যগুলি আরও নির্দ্দিষ্ট এবং ব্যাপক। প্রাদেশিক জনস্বাস্থ্য-বিভাগগুলি গ্রামের স্বাস্থ্য রক্ষণাবেক্ষণ করেন, এবং সহর এলাকার স্বাস্থ্যরক্ষার কায্য দেখাশুনা করেন। কলিকাতা, মাদ্রাজ, বম্বে, প্রভৃতি বৃহৎ নগর এবং বন্দরগুলিতে কর্পোরেশন-গুলিই স্বাস্থ্য বিষয়ে সর্ব্বময় কর্ত্তা। অন্যান্য সহরগুলিতে মিউনিসিপ্যালিটির দ্বারা এই কার্য্যগুলি করানো হয়। মিউনিসিপ্যালিটি এবং কর্পোরেশন উভয়েরই ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকার দ্বারা সীমাবদ্ধ। জনস্বাস্থ্য বিভাগের সংগঠন বিভিন্ন প্রদেশে প্রায় একই প্রকারের। আমরা শুধু বাংলার জনস্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্যকলাপ অনুধাবন.করিব। ইহার দ্বারাই অন্যান্য প্রদেশের ধারণা করা যাইবে।

বাংলা দেশের প্রতি জেলায় একজন করিয়া জেলা Health officer আছেন। প্রতি জেলাকে গড়ে ৮০ বর্গমাইলের এক একটি অঞ্চলে ভাগ করা হইয়াছে। গড়ে এক একটি অঞ্চলে প্রায় ৮০,০০০ লোকের বসতি। এইরূপ একটি অঞ্চলের জন্য একজন Sanitary Inspector, একজন Health Assistant, একজন ঔষধবাহক এবং কতকগুলি টীকা দিবার লোক নিযুক্ত আছে। প্রদেশের সমস্ত স্বাস্থ্যবিষয়ক কার্য্য একজন জনপ্রিয় মন্ত্রীর উপর ন্যস্ত। এই পল্লীসংগঠন ব্যতীত বাংলায় (এবং অন্যান্য প্রদেশে) Surgeon Generalএর অধীনে একটি চিকিৎসা বিভাগ আছে। প্রতি জেলায় অন্ততঃ একজন Civil Surgeon দ্বারা পরিচালিত একটি জেলা হাসপাতাল রহিয়াছে।

অধিকাংশ মহকুমা সহরে Assistant Surgeon-পরিচালিত হাসপাতাল রহিয়াছে। বাংলায় সর্ব্বসমেত ২৫৭টি হাসপাতালে ৬১৮৯টি রোগীর Bed আছে। তাহা ছাড়া ৬০০ জন Medical officer এবং Sub-assistant Surgeon দ্বারা পরিচালিত ১২১৪টি ডিস্পেন্সারী রহিয়াছে। হাসপাতালে এবং ডিস্পেন্সরীগুলি অনেক ক্ষেত্রেই কোন না কোন বিত্তশালী নাগরিকের অর্থে এবং চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং তাহার পর সরকার, জেলাবোর্ড, এবং ইউনিয়ন বোর্ড প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হইতেছে। জেলার জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসা বিভাগের ব্যয়ের প্রায় শতকরা ৬০ ভাগ প্রাদেশিক সরকার বহন করেন।

সহরের স্বাস্থ্য-বিভাগ সম্বন্ধে Central Advisory Boardএর একটি কথা উল্লেখ করা দরকার। "Nearly half the districts, and three quarters of the municipalities in British India are without qualified medical officers." ১১৮টি মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে ২টি প্রথম শ্রেণীর, এবং ১১৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। ১১৬টি দ্বিতীয় শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটির মধ্যে মাত্র ২৭টিতে সর্ব্বক্ষণের জন্য নিযুক্ত medical officer আছেন। ২৮টিতে কোন Sanitary Inspector পর্য্যন্ত নাই, এমন কি ১১টিতে কোন টীকা দিবার লোক পর্য্যন্ত নাই। দুইটি প্রথম শ্রেণীর মিউনিসিপ্যালিটিতে মাত্র একজন করিয়া Medical officer আছেন। একমাত্র কর্পোরেশনগুলিতে জনস্বাস্থ্যবিভাগ এবং চিকিৎসা-বিভাগ কিছু উন্নত হইয়াছে বলা যায়। মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনগুলিতে জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখা, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখা, খাদ্যে ভেজাল নিবারণ করা, প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য সামাজিকভাবে করা হইয়া থাকে। ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসার কোন সুষ্ঠু বন্দোবস্ত আজিও কিছু করা যায় নাই। কতকগুলি মিউনিসিপ্যালিটিতে বসন্ত ও কলেরার টিকা দেওয়া, প্রসূতি-আগার পরিচালনা করা, ম্যালেরিয়া নিবারণ করা, প্রভৃতি কার্য্য হইয়া থাকে। বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য, শিল্পাঞ্চলের স্বাস্থ্য, প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয় না।

যৌনব্যাধির নিবারণ এবং চিকিৎসার জন্য কোন মনোযোগ ইতিপূর্ব্বে দেওয়া হয় নাই। তবে যৌনব্যাধির প্রকোপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কিছুদিন যাবৎ এই দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন এবং প্রধান সহরগুলিতে মোটামুটি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

কর্পোরেশনগুলিতে অর্থব্যয় খুব যে অল্প হয়, তাহা নহে। কিন্তু কর্পোরেশনের Health Boardগুলি গঠনমূলক কার্য্য অপেক্ষা রাজনৈতিক দলভারী করার দিকে অধিক দৃষ্টি দেন। ফলে অর্থব্যয় সত্ত্বেও, কার্য্যের মধ্যে অনেক ত্রুটিবিচ্যুতি ও অপূর্ণতা থাকিয়া যায়।

দেশের স্বাস্থ্য অব্যাহত রাখার জন্য জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক স্বাস্থ্য-শিক্ষার প্রয়োজন। আবার রোগ হইবার পর চিকিৎসার জন্য চিকিৎসা-বিদ্যায় পারদর্শী ডাক্তার প্রয়োজন। অন্যান্য যে কোন দেশের তুলনায় ভারতে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য-শিক্ষার সুযোগ কম। বর্ত্তমান ভারতে ১৯টি Medical College এবং ১৯টি Medical School আছে। কলেজগুলিতে বৎসরে ১২০০ জন ছাত্রকে Graduate কোর্সে ভর্ত্তি করা হয়, এবং স্কুলগুলি হইতে সহস্রাধিক Undergraduate ডাক্তার প্রতি বৎসর বহির্গত হন। এই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে, দুই সহস্র লোক পিছু একজন ডাক্তার আবশ্যক এবং একজন ডাক্তার ২৫ বৎসর চিকিৎসা করিতে পারেন ধরিয়া, প্রতি বৎসর Graduate এবং Undergraduate ৮০০০ ডাক্তার বাহির হওয়া প্রয়োজন। বর্ত্তমানে প্রতি বৎসর ২০০০ ডাক্তার বাহির হন।

ভারতের জনস্বাস্থ্য বিভাগের কার্য্যাবলীর সঙ্গে বিদেশের তুলনা করিলে এই স্থানের দুরবস্থা ঠিক বুঝা যাইবে। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে ৬৫০০ চিকিৎসা-কেন্দ্র, ডিস্পেন্সরী, হাসপাতাল আছে। এই সকল চিকিৎসা-কেন্দ্রে ৭৩০০০ বেড আছে এবং সর্ব্বসমেত ৩½ কোটি লোক এই সমস্ত কেন্দ্র হইতে চিকিৎসা পাইয়া থাকে। অতএব ৪০ কোটি লোকের অধিকাংশের জন্যই বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা যায় নাই। তাহাদের হাকিমী, কবিরাজী বা

চাঁদসীর কৃপায় পড়িয়া থাকিতে হয়। ভারতবর্ষে প্রতি ৪০০০ লোক পিছু একটি করিয়া বেড আছে, আমেরিকায় প্রতি ১০০০ লোক পিছু ১০½টি বেড আছে। ভারতে ডাক্তার আছে ৪৭,৪০০, এবং ইহাদের মাত্র দুই-তৃতীয়াংশ লাইসেন্স প্রাপ্ত। বিলাতে ১০০০ জন লোক পিছু একজনের বেশী ডাক্তার, ভারতে ৬৩০০ লোক পিছু একজন ডাক্তার আছেন। গ্রেট বৃটেনে ৬১ হাজার ডাক্তার, আর ১ লক্ষ ১০ হাজার নার্স আছে; ভারতে ৪৭ হাজার ডাক্তার আর মাত্র ৭০০০ নার্স আছে। অর্থাৎ বিলাতে প্রতি ৩০০ জন লোক পিছু ১জন নার্স, ভারতে প্রতি ৪৩০০ জন লোকপিছু একজন নার্স। শতাব্দী-সঞ্চিত কুসংস্কার এবং সামাজিক বিধিনিষেধ এই অনগ্রসরতার জন্য দায়ী। সাধারণভাবে শুশ্রূষার জন্য ভারতে অন্ততঃ ৪ লক্ষ নার্স প্রয়োজন। এইদিকে দৃষ্টি দিলে ভারতের নারীকে একটি মহৎ কার্য্য দেওয়া যাইতে পারে—এবং তাহার সহিত নিঃসহায় নারীদের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

এতক্ষণ আমরা বর্ত্তমান পরিস্থিতি কী তাহাই দেখিয়াছি, এক্ষণে, আমরা দেখিব দেশের স্বাস্থ্যের মান-উন্নতির জন্য ন্যূনকল্পে কী করা প্রয়োজন। ইউরোপ, আমেরিকা, প্রভৃতি দেশসমূহে যাহা করা হইয়াছে, সেই মাপকাঠিতে আমরা আমাদের প্রয়োজন বিচার করিব না। ইউরোপ আমেরিকার মত ব্যবস্থা এখানে এখনই সম্ভব নহে।

ভারতের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটাইতে ১০০টি Medical School এবং ২৫টি College আবশ্যক। প্রতি প্রদেশে এই সকল স্কুল বিস্তৃত-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। কলেজগুলিতে উচ্চশিক্ষা, বিশেষ রোগ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা দেওয়া, Surgeryর নব আবিষ্কৃত প্রণালীগুলি শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রতি কর্পোরেশনে এবং বৃহৎ হাসপাতালগুলিতে সংশ্লিষ্ট গবেষণাগার, টীকা প্রস্তুতের কারখানা, ইত্যাদি স্থাপন করিতে হইবে। প্রতি প্রদেশে ম্যালেরিয়া-নিবারণী প্রতিষ্ঠান, খাদ্য-

বিষয়ক গবেষণাগার, Water Works Laboratory প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। সমস্ত প্রাইমারী এবং উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে ব্যাপকভাবে এবং সরল ভাবে স্বাস্থ্যশিক্ষা দিবার পন্থা উদ্ভাবন করিতে হইবে। বালকদিগকে বাস্তব অভিজ্ঞতার দ্বারা গৃহ পরিষ্কার রাখা, রোগ নিবারণ করা, সংক্রামক ব্যাধির প্রতিরোধ করার শিক্ষা দিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, সহরে সহরে, কারখানায় কারখানায় সংক্রামক ব্যাধি সম্বন্ধে নানাবিধ সহজবোধ্য তথ্য চিত্তাকর্ষক-ভাবে প্রচার করিতে হইবে। জনসাধারণের প্রকৃত আস্থাভাজন লোক এবং প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে তাহাদের কুসংস্কার এবং অস্বাস্থ্যকর অভ্যাস দূর করিতে হইবে।

শিল্প অঞ্চলগুলিতে ব্যাপকভাবে স্বাস্থ্যকর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইবে। সংক্রামক ব্যাধি প্রতিরোধের জন্য বস্তীর উন্নয়ন করিতে হইবে, প্রতিষেধক ঔষধের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বর্ত্তমানে কারখানার সহিত সংশিষ্ট যে হাসপাতালগুলি আছে, তাহাদের কার্য্য হইতেছে ছোটখাটো অসুখে ঔষধ দেওয়া, এবং শ্রমিক রোগীকে ছুটীর সার্টিফিকেট দেওয়া। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া প্রতি কারখানা অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক বেডযুক্ত হাসপাতাল স্থাপন করিতে হইবে। তাহার সহিত মাতৃসদন, শিশুসদন, প্রভৃতিও আবশ্যক। কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ খুব সহজেই এই কাজে অর্থ দিতে পারেন। সরকারের পক্ষ হইতে নিয়মিত শ্রমিক অঞ্চলের স্বাস্থ্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন এবং এই সকল পরীক্ষকদের কারখানা কর্ত্তৃপক্ষের প্রভাবমুক্ত করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষে বর্ত্তমানে সর্ব্বপ্রধান সমস্যা হইতেছে অসংখ্য গ্রামবাসীকে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার সুযোগ দান করা। তাই প্রতি মহকুমায় হাসপাতাল, প্রতি থানায় বা ইউনিয়নে ডিস্‌পেন্সারী স্থাপন করিতে হইবে, সাধারণ ঔষধগুলি সকল গ্রামবাসী যাহাতে সহজে পায় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে, মহকুমার এবং জেলার হাসপাতালগুলিতে পর্য্যাপ্ত বেডের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, বিশেষ রোগের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে।

Sanatorium বা স্বাস্থ্যাগার সম্বন্ধেও সরকারের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যাধি অত্যন্ত মারাত্মক এবং অত্যন্ত সংক্রামক, সেই সকল ব্যাধিগ্রস্ত লোকের জন্য পৃথক্ স্বাস্থ্যাবাস প্রয়োজন। প্রতি বৎসর স্বাস্থ্য রিপোর্ট হইতে দেখা যায় যে, আমাদের সহরগুলিতে এবং শিল্প অঞ্চলে অত্যন্ত দ্রুত যক্ষ্মার প্রসার হইতেছে। যদি রোগ হইবামাত্র রোগীকে জনসাধারণ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায়; তবে রোগের বিস্তার দ্রুত হইতে পারে না। কিন্তু সেইরূপ কোন ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত লোকেরা জনসাধারণের মধ্যে অবাধে চলাফেরা করিতেছে, এবং চতুর্দ্দিকে ব্যাধি সংক্রমিত করিতেছে। দেশে কতকগুলি যক্ষ্মাগার, কুষ্ঠাশ্রম আছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তাহা বিরাট সমুদ্রে বারিবিন্দুর মত। বর্ত্তমানে রোগীকে পৃথক করিয়া আশ্রমে আনিবার মত কোন আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নাই। এইজন্য কী অপূরণীয় ক্ষতি যে প্রতিদিন হইতেছে, তাহা ভাবিলে বিহ্বল হইয়া যাইতে হয় এবং ভবিষ্যৎ ভারতবাসীর নিকট আমরা চরম অপরাধে অপরাধী হইয়া যাই।

ভারতের সুদীর্ঘ উপকূল জুড়িয়া এবং উত্তর ভারতের পার্ব্বত্য অঞ্চলে অনেক স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর স্থান আছে। একটু চেষ্টা এবং ব্যয় করিলে এইগুলিকে আদর্শ স্বাস্থ্যাগারে রূপান্তরিত করা যায়। সংক্রামক এবং মারাত্মক ব্যাধিগুলির জন্য এইরূপ স্বাস্থ্যাগার প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কার্য্যে অসংখ্য জনহিতব্রতী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের (Redcross, রামকৃষ্ণ মিশন, প্রভৃতি) সাহায্য লইতে হইবে। এই সমস্ত পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার সাথে দেশের খাদ্য এবং বস্ত্রের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে, ঔষধের কারখানার বিস্তার করিতে হইবে এবং সমগ্রভাবে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করিতে হইবে। একটু ব্যাপক পরিকল্পনা এবং সরকার ও জনসাধারণের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত ইহা সম্ভব নহে।

ভারত-বিভাগের অর্থনৈতিক ফলাফল

বৃটিশ সরকারের পক্ষ হইতে ৩রা জুনের ঘোষণার সাহায্যে জানানো হইয়াছে যে, তাঁহারা ভারতবর্ষকে হিন্দুপ্রধান অঞ্চল এবং মুসলিমপ্রধান অঞ্চলে ভাগ করিয়া এই দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই বিভক্ত দেশে তাঁহারা প্রত্যেককে স্বাধীনতা দিবেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই বাণপ্রস্থ অবলম্বনের তাৎপর্য্য কি, এই নীতির অন্তরালে কি কি শক্তি কাজ করিতেছে তাহা জানা প্রয়োজন। ভারতের বৃহত্তম সংখ্যালঘু সম্প্রদায় প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের প্রভাবে দেশবিভাগ দাবী করিয়াছিল—ভারতের বৃহত্তম জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু সমস্যার কোন বৈজ্ঞানিক সমাধান না করিতে পারিয়া প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের হাতেই সংখ্যালঘুদের ছাড়িয়া দিয়াছিল—আর মুমূর্ষু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এই অবস্থার সুযোগ লইয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর করিয়াও ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদের মধ্য দিয়া তাহাদের সামরিক এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার চেষ্টা করিতেছে, এবং বিভক্ত দেশের দুর্ব্বল অংশগুলিতে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখিবার এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করিবার সংকল্প করিতেছে।

ভারত-বিভাগের সামরিক ফলাফল বর্ত্তমানে আমাদের আলোচ্য নহে। ইহার অর্থনৈতিক দিকটাই আমরা বিচার করিব। সীমান্ত প্রদেশে গণভোট লওয়া হইবে। সেখানে জাতীয় আন্দোলন বলবান্ হইলেও, যেহেতু জাতীয় নেতৃত্ব ধর্ম্মের ভিত্তিতেই দেশবিভাগ মানিয়া লইয়াছেন, সেই কারণে আমরা ধরিয়া লইতেছি যে, সীমান্তও হিন্দুস্তানের বাহিরে চলিয়া যাইবে। ইহা ধরিয়া লইয়াই হিন্দুস্তান ও পাকিস্থানের সঠিক অর্থনৈতিক চিত্র আমাদের জানা প্রয়োজন। শিল্পপতি বিড়লা এই বিষয়ের উপর একটি হিসাব বাহির করিয়াছেন, আমরা তাহার উপর ভিত্তি করিয়াই আলোচনা করিব।

প্রস্তাবিত পাকিস্থানের লোকসংখ্যা হইবে ৭½ কোটি, এবং হিন্দুস্থানের ২২½

কোটি। বসতির ঘনত্ব দুই রাষ্ট্রেই প্রায় সমান। পূর্ব্ববঙ্গে বসতি খুব ঘন, বর্গমাইলে ৭৫০।৮০০, সিন্ধুতে বসতি সবচেয়ে পাতলা—বর্গমাইলে ৯৪। হিন্দুস্থানের মধ্যেও পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, দিল্লী, প্রভৃতি স্থানে অত্যন্ত ঘনবসতি, আর মধ্যপ্রদেশে খুব পাতলা। পাঞ্জাব, সীমান্ত, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ, বোম্বাই, প্রভৃতি স্থানে ঘনত্ব মাঝামাঝি—২৮০,২৮৫,৫২১,৫১৯ এই রকম।

ভূমি—(পাকিস্তানের) পূর্ব্ববাংলা, পশ্চিম পাঞ্জাব এবং (হিন্দুস্থানের) পশ্চিম বাংলা, উত্তর বিহার, যুক্তপ্রদেশ, প্রভৃতি স্থানে বেশ উর্ব্বরা। আবার পাকিস্তানের সীমান্ত, সিন্ধু এবং পাঞ্জাবের কোন কোন স্থানে এবং হিন্দুস্থানের মধ্যপ্রদেশ, বোম্বাই ও মান্দ্রাজের স্থানে স্থানে অত্যন্ত পাথুরে এবং উৎপাদিকা-শক্তিশূন্য ভূমি রহিয়াছে।

ভারতে মানুষের প্রধান উপজীবিকা কৃষি। পূর্ব্ববঙ্গ প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি প্রচুর হওয়ার জন্য এবং পাঞ্জাবে সেচব্যবস্থা থাকার জন্য কৃষির অবস্থা এইসব স্থানে বেশ ভালো। হিন্দুস্থানের মধ্যে পশ্চিম বাংলা, বিহার, প্রভৃতি স্থানে অনুরূপ কারণে কৃষিজাত সম্পদ প্রচুর হয়। পূর্ব্ববঙ্গে ধান, পাট প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়—পশ্চিমবঙ্গে এই দুইটা শস্য উৎপন্ন হইলেও জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় কম। পূর্ব্ববঙ্গ মৎস্যবহুল; পশ্চিমবঙ্গে মৎস্য প্রয়োজনের তুলনায় কম। পশ্চিম পাঞ্জাব প্রচুর গম উৎপন্ন করে, কিন্তু সিন্ধুর কৃষিসম্পদ অত্যন্ত কম। যুক্তপ্রদেশ, পূর্ব্ব পাঞ্জাব প্রচুর গম, চাল, ডাল উৎপন্ন করে, কিন্তু মধ্যপ্রদেশ ও বোম্বাইএর কতকগুলি স্থানে কৃষির অবস্থা বেশ খারাপ। শ্রীযুক্ত বিড়লার হিসাবমতো দুই রাষ্ট্রের কৃষি সম্পদ নিম্নলিখিত রূপ।

	কাঁচা পাট	চাবাগান	চাউল	গম	চিনি	চিনা বাদাম
হিন্দুস্থান	১০ লক্ষ একর	৬১/২ লক্ষ একর	১১/৪ কোটি টন	৪১ লক্ষ টন	২৬ লক্ষ টন	২৩লক্ষ টন
পাকিস্তান	১৪ লক্ষ একর	৯৬১/২ হাজার একর	৫৪লক্ষ টন	২৭লক্ষ টন	৫ লক্ষ টন	নগণ্য

সর্ব্বসমেত দেখা যাইতেছে উভয় রাষ্ট্রেই সাধারণভাবে খাদ্য পাওয়া যাইবে। গম পাকিস্তানে অনুপাতে বেশী, চিনি, ডাল, চিনাবাদাম অনেক কম। পাকিস্তানকে ইহার জন্য অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে।

খনিজের দিক হইতে পাকিস্তান রাষ্ট্র হইবে অত্যন্ত দরিদ্র। পূর্ব্ববঙ্গের জলাভূমিতে কোন খনিজ পাওয়া যায় না। পশ্চিম পাঞ্জাবে পেট্রোল পাওয়া যায়। কিন্তু পেট্রোলের উৎপাদন অত্যন্ত অপ্রচুর। পশ্চিম পাঞ্জাব এবং সীমান্তে দ্বিতীয় শ্রেণীর কয়লা কিছু পাওয়া গেলেও, পাকিস্তানের প্রয়োজনের পক্ষে নিতান্ত অল্প। আর সিন্ধুতে উল্লেখযোগ্য খনিজ কিছু নাই। এদিকে হিন্দুস্থানের পশ্চিম বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, মধ্য-প্রদেশ, মাদ্রাজ, প্রভৃতি অনেক স্থানেই উৎকৃষ্ট কয়লা, লৌহ, অভ্র, ম্যাংগানীজ, তামা, রাসায়নিক সামগ্রী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যাইতে পারে। খনিজ বিষয়ে ভারত বেশ সমৃদ্ধ এবং ইহার সুবৃহৎ অংশই হিন্দুস্থানে। হিসাবমতো হিন্দুস্থান পাকিস্তানে নিম্নলিখিত রূপ খনিজ পাওয়া যায়।

কয়লা হিন্দুস্তানে আড়াই কোটি টন, পাকিস্থানে ২ লক্ষ টন; তাম্র, লৌহ, প্রস্তর, লৌহ, ম্যাংগানীজ, অভ্র হিন্দুস্থানে মোটামুটি প্রয়োজন অনুরূপ পাওয়া যায় কিন্তু পাকিস্থানে এইগুলি একেবারেই নাই।

অতএব দেখা যাইতেছে যে ভবিষ্যতে হিন্দুস্থানের সহযোগিতা ভিন্ন পাকিস্তান তাহার অতিপ্রয়োজনীয় খনিজ কোথা হইতে পাইবে—তাহা চিন্তার অতীত। সেচ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়, সুষ্ঠু পরিকল্পনার সাহায্যে শিল্পোৎপাদন প্রসারিত করা যায়—কিন্তু প্রকৃতি প্রতিকূল হইলে মানুষের কোন চেষ্টাতেই খনিজ সম্পদ নূতন করিয়া সৃষ্টি করা যায় না।

যানবাহন-ব্যবস্থা দুই রাষ্ট্রের কোথাও সমৃদ্ধ নয়। তবে যাহা আছে—তাহা দুই রাষ্ট্রেই আনুপাতিক হারে আছে। কাঁচা রাস্তা সর্ব্বত্র অল্প পরিমাণ এবং অনুন্নত অবস্থায় রহিয়াছে। পাকা রাস্তা পাকিস্তানে কম এবং হিন্দুস্থানে বেশী। রেললাইন হিন্দুস্থানে থাকিবে ২৬ হাজার মাইল,

আর তাহাতে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ ৬২৫ কোটি টাকা; পাকিস্তানে ১৪½ হাজার মাইল, মূলধন ২৩২ কোটি টাকা। রেললাইন অনুপাতে পাকিস্তানে বেশী, রাস্তা হিন্দুস্থানে বেশী।

হিন্দুস্থান-পাকিস্তানের তারতম্য সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রভাবে ফুটিয়া উঠে শিল্পের ব্যাপারে। ভারতের যন্ত্রশিল্পের কেন্দ্র হইতেছে প্রধানতঃ বোম্বাই, মাদ্রাজ, নাগপুর, কলিকাতা, কানপুর, জামসেদপুর, প্রভৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রথম চারিটি বস্ত্রশিল্পের কেন্দ্র। বাংলাতে যে বস্ত্রশিল্প আছে তাহারও অধিকাংশ পশ্চিম বাংলায়। বস্ত্রশিল্প হইতেছে ভারতের বৃহত্তম জাতীয় শিল্প —আর কাপড়ের কল হিন্দুস্থানে ৩৮০টি আর পাকিস্তান এলাকায় মাত্র ৯টি। অতএব পাকিস্তানের হিন্দুমুসলমান অধিবাসীকে বস্ত্র সরবরাহের জন্য হিন্দুস্থানের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইবে। কাঁচা পাট উৎপন্ন হইবে প্রধানতঃ পাকিস্তানে, কিন্তু ভারতের ১০৮টি পাট কলের মধ্যে প্রত্যেকটিই হিন্দুস্থানে। অতএব এই দিক হইতে দুই পক্ষেরই অসুবিধা হইবে অত্যন্ত বেশী। পাকিস্তানকে কাঁচা পাট বিক্রয় করিতেই হইবে, কারণ পাটই হইতেছে তাহার একমাত্র অর্থকরী কৃষিজ। আর হিন্দুস্থানকে বিক্রয় করা ছাড়া তাহার উপায় নাই। হিন্দুস্থানের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও বিহার প্রভৃতি অঞ্চলে পাট উৎপন্ন হইতে পারে, হিন্দুস্থানের এই সমস্ত অংশে পাট-চাষের প্রসার ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পাটের উৎকর্ষসাধন—এই দিকে ইতিমধ্যেই অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

চিনির জন্য যে অসুবিধা তাহা আমাদের মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক প্রত্যেকেই মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছে। কিন্তু চিনির অধিকাংশ কল যুক্তপ্রদেশে এবং বিহারে। হিন্দুস্থানে ১৫৬টি, এবং পাকিস্তানে ১০টি চিনির কল আছে। চা-অনুরক্ত পাকিস্তান-সমর্থকদের এই সংবাদটি আগে জানা থাকিলে বোধ হয় এই সমর্থকদের সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইত। লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের কেন্দ্র হইতেছে ছোট নাগপুর, পশ্চিম বাংলা, প্রভৃতি। হিন্দুস্থানে ১৮টি লৌহ ও

ইস্পাত কারখানা থাকিবে—পাকিস্তানে একটিও থাকিবে না। গ্যাস কারখানা হিন্দুস্থানে ৭৭টি, পাকিস্থানে ২টি; কাগজ কল হিন্দুস্থানে ১৬টি, পাকিস্তানে নাই; সিমেণ্ট কারখানা হিন্দুস্থানে ১৬টি, পাকিস্তানে নাই। অর্থাৎ সমস্ত শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য পাকিস্তানকে মারাত্মকভাবে হিন্দুস্থানের উপর নির্ভর করিতে হইবে। অথচ পাকিস্থান-হিন্দুস্থানের ভাগাভাগি হইতেছে অপরিমেয় ঘৃণা এবং বিদ্বেষের মধ্য দিয়া। তাহার অর্থ হইতেছে যদি কোন অংশকে অপরের উপর নির্ভর করিতে হয়, তাহা হইলে অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে। আর তাহা না হইলে বিদেশী মূলধন ও বৈদেশিক সরকারের উপর নির্ভর করিতে হইবে। এইখানে বিপদ আরও গুরুতর।

কলকারখানা, খনি, ব্যবসা-বাণিজ্য, এবং ব্যাঙ্ক বেশী থাকার জন্যই হিন্দুস্থানে মোট লগ্নী মূলধনের পরিমাণ পাকিস্তানের তুলনায় অনেক বেশী। আর একই কারণে বাৎসরিক আয়ের পরিমাণও হিন্দুস্থানে বেশী। হিন্দুস্থানে লগ্নী টাকার পরিমাণ ২০½ কোটি টাকা, আর পাকিস্থানে ৪ কোটি টাকা। আয় যথাক্রমে ১৭৩ কোটি টাকা এবং ২৭ কোটি টাকা। হিন্দুস্থান-পাকিস্থানের প্রাদেশিক এবং কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের একটি আনুমানিক হিসাব দেওয়া হইল।

	আয়	ব্যয়	
হিন্দুস্থান প্রদেশ	১৪,৩৩৮	১৪,২২৭	১১১ উৎবৃত্ত
কেন্দ্র	২২,৭২১		
পাকিস্থান প্রদেশ	৪,৪৮৯	৫৯৪৭	৪৬৮ } (ঘাটতি)
কেন্দ্র	৮২৯৫	১১৬০২	৩৩৩৪ } (ঘাটতি)

কিন্তু এই হিসাব বর্ত্তমানের প্রদেশ এবং কেন্দ্রের রাজস্ব অনুযায়ী করা হইয়াছে এবং সেইজন্য অত্যন্ত অস্থায়ী। বিভক্ত দেশে নূতন শাসনতন্ত্র প্রচলিত হইলে রাজস্ব প্রভৃতি ব্যাপারে আমূল পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। আজ যেখানে বাজেটের

ঘাটতি, তখন সেখানে (নূতন কর বসানোর ফলে) ঘাটতি নাও থাকিতে পারে অথবা (সরকার সুদূরপ্রসারী গঠনমূলক কাজ আরম্ভ করিলে) ঘাটতির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যাইতে পারে; তবে মোটের উপর বলা যায়, পাকিস্তান এলাকা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হওয়ায় বাজেটের ঘাটতি সেখানে বেশী হইবে, এবং দ্রুত উন্নতি না করিতে পারিলে এই ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান উভয়কেই ব্যাপক গঠনমূলক পরিকল্পনা লইতে হইবে, এবং বাজেটের ঘাটতির সম্মুখীন হইতে হইবে। দেশে এবং বিদেশে ঋণ করিয়া এবং নূতন কর বসাইয়া এই ঘাটতি পূরণ করা হইবে। তবে পাকিস্তানের ঘাটতি বেশী হইবে, এবং দেশে ঋণ করিবার সুযোগ তাহার কম হইবে, তাই তাহাকে প্রধানতঃ বিদেশে ঋণ করিতে হইবে।

এই সূত্রে একটি কথা না বলিয়া প্রবন্ধ শেষ করা যায় না। সাম্রাজ্যে অরুচি ধরিয়াছে বলিয়া বৃটিশ সরকার দেশ ছাড়িতেছে না; অবস্থার চাপে পড়িয়া ছাড়িতেছে। তাই সে শেষ পর্যান্ত চেষ্টা করিবে দেশের দুর্ব্বল স্থানগুলিতে টিকিয়া থাকিতে। পাকিস্তান অঞ্চলগুলি অর্থনৈতিক দিক দিয়া অত্যন্ত দুর্ব্বল হইবে। খনিজ, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক—সব সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য। তাই সেইসব দেশে অতি শীঘ্র অভাব, অনটন, সংকট দেখা দিতে বাধ্য। বৃটেন এবং আমেরিকা এইসব সুযোগে সেই দেশে প্রচুর মূলধন-নিয়োগ করিবে এবং অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদের মধ্য দিয়া অর্থাৎ সোনার শিকলে বাঁধিয়া নিজেদের শোষণের ক্ষেত্র বজায় রাখিবে। এই শক্তিই সমগ্র ভারতে সঙ্কট সৃষ্টি করিবে, এবং পৃথিবীতে প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র হিসাবে কার্য্য করিবে। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিকে যে সমস্ত দেশ অনগ্রসর সেইসব দেশেই প্রতিক্রিয়া এবং নূতন ধরণের সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠা হইবে। ইরাক্, ইরান্, প্যালেষ্টাইন, প্রভৃতি স্থানে আইনতঃ কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃটিশের বা আমেরিকার নাই। তবুও সেইসব স্থানে তাহাদের ক্ষমতা অসীম। মিশরের কায়রো হইতে পাঞ্জাবের লাহোর পর্য্যন্ত একটি দীর্ঘ শৃঙ্খল তাহারা প্রস্তুত

করিতে চেষ্টা করিবে এবং সমগ্র পৃথিবীর প্রগতির পথে বৃহত্তম বাধা সৃষ্টি করিবে। অবশ্য সীমান্ত যদি কোনদিন স্বাধীন পাঠানভূমি প্রস্তুত করিতে পারে বা পাকিস্তানে বামপন্থী সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলন যদি শক্তিশালী হয়, তবে সাম্রাজ্যবাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এতদিন দেশবিভাগের ধ্বনি রাজনীতিক্ষেত্রে একটি মুখরোচক স্লোগান হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। আজ বাস্তব অবস্থার সম্মুখে দাঁড়াইয়া (বাস্তবতার আসল ভিত্তি অর্থনৈতিক) সেই উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেক কমিয়া যাইবার কথা, এবং ইতিমধ্যেই অনেক কমিয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে এইরূপ ঘটা অস্বাভাবিক নহে যে, অবস্থার চাপে এবং প্রয়োজনের তাগিদে উভয় রাষ্ট্রই পরস্পরের প্রতি সদিচ্ছা পোষণ করিবে এবং চুক্তি এবং বন্ধনের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে এক স্বেচ্ছামূলক যৌথরাষ্ট্রে পরিণত হইবে। তাহা নির্ভর করিবে—বৃটিশ সরকার ইতিমধ্যে উভয় রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে কতখানি প্রভাবান্বিত করিবে, এবং জনসাধারণ কতখানি মোহমুক্ত হইয়া প্রগতিশীল আন্দোলন গড়িয়া তুলিতে পারিবে তাহার উপর। সমগ্র ভারতবাসীর বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের জনসাধারণের এই বিষয়ে গুরু কর্তব্য রহিয়াছে।

গণতন্ত্র এবং রাজনৈতিক দল

পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত রহিয়াছে—গণতন্ত্রে গণ অর্থাৎ জনসাধারণ শাসন-যন্ত্রের পরিচালক। দেশে যদি কোন আইন পাশ হয়, অথবা রাজনৈতিক বা অর্থ নৈতিক কোন কার্য্যসূচী গ্রহণ করা হয়—তাহা হইবে অধিকাংশ লোকের মতামত লইয়া। কোন প্রশ্নের উপরই সব লোক একমত হয় না—সেইজন্য অধিকাংশ যাহা বলে তাহাই

মানিয়া লওয়া হয়। এই সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘুদের মতবাদকে সংগঠিত করিয়া রূপ দেয় এক একটি রাজনৈতিক দল।

যখন কোন মূল রাজনৈতিক প্রশ্ন বা কার্য্যসূচী লইয়া মতভেদ থাকে, দেশের নেতৃস্থানীয় লোকেরা ভিন্ন ভিন্ন আদর্শের জন্য প্রচার কার্য্য করেন—দেশের জনসাধারণের একাংশ একটি আদর্শের সমর্থক হইয়া এক নেতার দলে সমবেত হন, অপর একটি অংশ অন্য আদর্শের সমর্থন করিয়া অন্য দলে মিলিত হন। যে দলের পশ্চাতে জনগণের অধিকাংশের সমর্থন থাকে সেই দলই শাসন-যন্ত্র পরিচালনা করে। বর্ত্তমানে প্রাচীন City State আর নাই, "প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র" সম্ভব নহে; বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে গণতন্ত্রকে কার্য্যকরী করিবার উপায় হইতেছে এই দলব্যবস্থা। পার্লামেণ্টে কোন দল না থাকার অর্থ ৬১৫ জন সভ্য প্রত্যেকে একটি মতবাদ লইয়া এক একটি দল। তাহাতে কোন কার্য্য অগ্রসর হইবে না। দলই মানুষকে শিখাইয়াছে ক্ষুদ্র মতভেদ সত্ত্বেও মূলগত প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ মত অবলম্বন করিতে।

দল কি করে? বিভিন্ন দল স্বীয় আদর্শ অনুযায়ী শাসন-ব্যবস্থা পরিচালনা করিতে চেষ্টা করে, এবং সরকারী যন্ত্রের মধ্যদিয়া নিজের কার্য্যসূচী প্রচলিত করিতে চায়। এই কাজ করার জন্য তাহাকে সরকারের মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। তাই, নির্ব্বাচনের সময়ে প্রত্যেক দল স্বীয় প্রতিনিধি দাঁড় করায়, এবং আইন-পরিষদে আসন লাভ করার চেষ্টা করে। যে দল অধিক সংখ্যক আসন লাভ করে, সেই দলই দেশের সর্ব্বোচ্চ কার্য্যকরী যন্ত্র পরিচালনা করে—অর্থাৎ মন্ত্রিসভা গঠন করে; এবং এই মন্ত্রিসভার মধ্যদিয়া অধিক সংখ্যক প্রতিনিধির সমর্থনে দলীয় মত এবং আদর্শ অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কার্য্যক্রম আরম্ভ করে।

তাহা হইলে, দলের প্রধান কার্য্য হইল নির্ব্বাচনে জয়লাভ করা। কিন্তু এই জয়লাভ এমনি হয় না—যে দলের মতবাদ অধিকাংশ জনসাধারণ গ্রহণ করে, সেই দলই জয়লাভ করে। মতবাদ জনসাধারণকে দিয়া গ্রহণ করানোর

জন্য প্রয়োজন—প্রচার। অনবরত প্রচারের মধ্যদিয়া নিজের দলগত আদর্শকে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক দল গ্রামে সহরে, পল্লীতে, বস্তীতে শাখাসংগঠন গড়িয়া তোলে এবং তাহাদের সাহায্যে জনসাধারণকে নিজের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। তাহা ছাড়া, সংবাদপত্র, পুস্তিকা, বিজ্ঞাপন, বক্তৃতা, প্রভৃতির সাহায্যে দলীয় মতবাদকে দেশবাসীর সহজ-গ্রাহ্য করিয়া প্রচার করা হয়। এইভাবে রাজনৈতিক দলগুলি জনমত সৃষ্টি করে এবং গঠন করে। আবার জনমতও দল সৃষ্টি করে। জনমতের অভিব্যক্তি হয় দলের মধ্য দিয়া, আর দল জনমত গঠিত করিয়া সরকারকে প্রভাবিত করে এবং দেশের নানাবিধ সমস্যায় উদাসীন বা নিরপেক্ষ জনসাধারণকে প্রচারের মধ্য দিয়া উদ্দীপিত করিয়া তোলে। বিভিন্ন দল বিভিন্ন আদর্শের জনসাধারণকে স্বীয় মত অভিব্যক্তির সুযোগ দেয়। দলই জনসাধারণকে বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয়ে শিক্ষিত করে। সর্বোপরি, দল-ব্যবস্থা দেশের মঙ্গলের জন্য সঠিক কর্মপন্থা নির্দ্ধারণে সাহায্য করে। একটি দল এক কর্মপন্থা প্রচার করে, অন্যান্য দল অন্যান্য কর্মপন্থা প্রচার করে। জনসাধারণ এই সকলের মধ্যে মনোমত মতটি বাছিয়া লইবার সুযোগ পায়—প্রত্যেক দলের ভালোমন্দ বিচার করিয়া শিক্ষিত হয় এবং দেশের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট কর্মপন্থা প্রচলনে সচেষ্ট হয়। "Truth comes from conflict"—বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ হইতে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়—এই সন্ধানে দলের দান অতুলনীয়।

এই প্রসঙ্গে কতকগুলি কথা বলা প্রয়োজন। আমরা দেখিয়াছি, আইন-পরিষদে যে দলের সংখ্যাধিক্য, তাহারাই শাসন করে, তাহাদের সব প্রস্তাব ভোটের জোরে পাশ হইয়া যায়; আর সংখ্যালঘুদলের সমস্ত প্রস্তাবই বাতিল হইয়া যায়। তবে সংখ্যালঘু দলের কী প্রয়োজন? "While the majority rules the minority checks"—এইখানে সংখ্যালঘু দলের সার্থকতা। সংখ্যাগুরু দল প্রতি মুহূর্ত্তে অনুভব করিবে, যদি তাহারা কোন ভুল, অন্যায়, বা জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করে, তাহা হইলে সংখ্যালঘু দল তাহার সুযোগে জনগণের মধ্যে

প্রচার চালাইবে, জনসমর্থন সংগ্রহ করিয়া ভবিষ্যতে সংখ্যাগুরু দলে পরিণত হইতে চেষ্টা করিবে। আইন-পরিষদের ভিতরে এবং বাহিরে বিরোধী দলের অবিরল সমালোচনার মধ্যেই সরকারকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ম্মপন্থা অনুসরণ করিতে হয়। সমালোচনা না থাকিলে, বিরোধী কণ্ঠের প্রতিবাদ না থাকিলে তাহাদের প্রতিপদে ভুল এবং জনস্বার্থ-বিরোধী কাজ করিবার সম্ভাবনা থাকে। এই খানেই গণতন্ত্রে একাধিক দলের প্রয়োজনীয়তা এবং এইখানেই স্বৈরতন্ত্রের দুর্ব্বলতা। অনেক সময়ে সরকার পক্ষীয় দল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে, স্বীকার করিয়া বা স্বীকার না করিয়া বিরোধী দলের কর্ম্মপন্থা হইতে নিজেদের কর্ম্মপন্থা বাছিয়া লয়—এইরূপে সংখ্যালঘু হইয়াও কার্য্যকরী প্রভাব বিস্তার করা যায়।

গণতন্ত্রে সহনশীলতা সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজন। কোন দল ক্ষুদ্র বা দুর্ব্বল বলিয়া তাহার মতবাদকে উপেক্ষা বা তাহাকে নির্য্যাতন করা ক্ষতিকর। আজিকার ক্ষুদ্র দল প্রচারের মধ্য দিয়া ভবিষ্যতে সংখ্যাগুরু দলে পরিণত হইতে পারে। তাহা ছাড়া প্রত্যেক মতবাদ হইতে কিছু শিখিবার আছে। ভবিষ্যতে সেই দল সংখ্যাগুরু হউক আর নাই হউক, তাহার কর্ম্মপন্থার কিছু অংশ সরকারী কর্ম্ম পন্থায় স্থান পাইতে পারে। তাই ক্ষুদ্র দলকে উপেক্ষা বা নির্য্যাতন করিলে সেই দলের ক্ষতির চেয়ে দেশের ক্ষতি বেশী হয়, তাই সমালোচনার কণ্ঠরোধ সকল সময়েই গণতন্ত্রের আদর্শের বিরোধী।

জনমত সংগঠনের যে দায়িত্ব দলের আছে সেই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রত্যেককেই তার ভাবধারা প্রচারের পূর্ণসুযোগ দিতে হইবে। শিক্ষিত মহলেও একটি ভ্রান্ত ধারণা অনেক সময়ে দেখা যায় যে—দেশে অনেকগুলি দল হইয়া গিয়াছে, দলগুলির সংখ্যা কমিয়া একটি দল না হইলে কোন কাজ হইতে পারে না। উত্তরে এই কথা বলা যায়, মতভেদ যদি থাকে তবে দল থাকিবেই আর মতভেদের কারণ দূর না হইলে, মতভেদই বা দূর হইবে কি প্রকারে? একমত অনেক সময়ে জড়ত্বের লক্ষণ, চিন্তাশক্তির অভাবের লক্ষণ। মানুষ যখন স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখে, তখনই বিভিন্ন লোক বিভিন্ন মত পোষণ

করে। নহিলে একজন বড় নেতা যাহা বলিতেছেন—তাহাই সকলে অন্ধভাবে মানিয়া লয়। তবে একথা সত্য, দল অবাঞ্ছনীয় না হইলেও, দলাদলি একান্ত অবাঞ্ছনীয়। প্রত্যেক দলের উচিত দলীয় স্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ বড় করিয়া দেখা; তাই একাধিক দল যখন অস্থায়ীভাবেও একই কর্ম্মপন্থায় বিশ্বাসী, তখন সেই বিশেষ কাজটি মিলিত কর্ম্মপন্থার ভিত্তিতে মিলিতভাবে করা উচিত। দেশকে যদি আমরা দলের উপরে স্থান দিই, তবে নিজ দলের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিয়াও অন্য দলের সহিত মিলিতভাবে কাজ করা সম্ভব।

সময়ে সময়ে রাজনৈতিক দলগুলির অনেকগুলি দোষ দেখা যায়। তবে এইগুলি দল-ব্যবস্থার দোষ নহে, দল-ব্যবস্থাকে অপব্যবহার করার দোষ। "my party—right or wrong"—এই মনোভাব অত্যন্ত নিন্দনীয়, কিন্তু উহা বহুলভাবে দেখা যায়। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করার দিকে দলের একটি ঝোঁক আছে; তবে ব্যক্তিরা যদি সচেতন ও সক্রিয় হয়, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না—নষ্ট হয় ব্যক্তিগত অহংকার। রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলার জন্য অনেক দক্ষ স্বাধীনচেতা লোক ইহার মধ্যে আসিতে পারেন না। অতএব অনেক ভালো লোকের সেবা হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হয়। উত্তরে বলা যায়—দলব্যবস্থার ইহা দোষ নয়। ঐ সব লোকদের বুঝিবার ভুল। একজন খুব বুদ্ধিমান লোক বেশী কর্ত্তৃত্ব করিবে—সেই যুগ এখন আর নাই। সার্ব্বজনীন কল্যাণবুদ্ধি আজ সবচেয়ে বড় শক্তি। অনেকের সাথে মিলিত হইতে গেলে যে শৃঙ্খলা অনিবার্য্যভাবে প্রয়োজন, সেই শৃঙ্খলা যিনি মানিতে পারেন না—তিনি যত শিক্ষিত হউন না কেন তিনি স্বৈরতান্ত্রিক যুগের লোক। দেশের প্রতি ভালোবাসা, দেশবাসীর বুদ্ধির উপর আস্থার চেয়ে নিজের দাম্ভিকতা তাঁহার বেশী। দলগত রাজনীতির সবচেয়ে বড় দোষ বা বিপদ্ হইতেছে—অনেক সময়ে দল অত্যন্ত সংকীর্ণ স্বার্থে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করিয়া ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায়, দলের ভিতর একটি অন্তর্দল (inner party) থাকে এবং তাহা ধনিকদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়। দলের জন্য

অর্থের প্রয়োজন এবং "he who pays the piper, calls the tune." সাধারণতঃ যাহারা অর্থ দেয়, তাহারা দলযন্ত্রকে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগাইতে চেষ্টা করে। দল-ব্যবস্থাকে বিপন্মুক্ত করিতে গেলে, ধনীদের প্রভাব হইতে ইহাকে মুক্ত করা প্রয়োজন—ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় তাহা সম্পূর্ণ সম্ভব নয়।

বঙ্গভঙ্গের অর্থ নৈতিক পরিণাম

৩রা জুন ভাইস্‌রয়ের ঘোষণা, এবং নেতাদের সমর্থনে ভারত এবং বাংলা দুইই ভাগ করা হইয়াছে। যে জিনিষ সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহাই আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হইল ২০শে জুন বঙ্গীয় আইন পরিষদে। পশ্চিম এবং উত্তর বাংলার ১০টি জেলা লইয়া হিন্দুস্থান বাংলা এবং অবশিষ্ট ১৬টি জেলা লইয়া পাকিস্থান বাংলা রচিত হইয়াছে। হিন্দুস্থান বাংলার লোকসংখ্যা প্রায় দুই কোটি আর পাকিস্থান বাংলার চার কোটি। আয়তনে হিন্দুস্থান বাংলা পাকিস্থান বাংলার অর্দ্ধেকের কিছু বেশী। বাংলার উপর এই অস্ত্রোপচার হইয়াছে বৃটিশ সরকারের উদ্যোগে আর তাহাতে দেশবাসী সমর্থন দিয়াছে কেহ উত্তেজনার মুহূর্ত্তে, কেহ অসহায় অবস্থায় পড়িয়া। ভারত বিভাগ যাঁহারা চাহিয়াছেন, তাঁহারা ভাবেন নাই—ভারত বিভাগ হইলে বঙ্গ বিভাগ অবশ্যম্ভাবী; আর বঙ্গ-বিভাগে যাঁহারা উৎসাহ দিয়াছেন তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন নাই যে, বাংলার জীবন যে শুধু ভাষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য দিয়া ঐক্যবদ্ধ তাহা নহে—বাস্তব প্রয়োজনের দিক হইতে বাংলার একটি অংশ অপর অংশ হইতে অবিচ্ছেদ্য। ইহাতে কোন্ অংশের অসুবিধা বেশী হইবে প্রশ্ন তাহা

নহে। পূর্ব্ব বাংলার অর্থনীতি বেশী বিপর্য্যস্ত হইবে, অতএব পশ্চিম বাংলার অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় সহনীয় হইয়া যাইবে এই চিন্তা উত্তেজিত অবস্থার লক্ষণ।

প্রথমেই কৃষিজাত দ্রব্যের কথা ধরা যাক্। পশ্চিম বাংলায় চাউল উৎপন্ন হয় ৮ কোটি মণ, পূর্ব্ব বাংলায় ১৯ কোটি মণ। পশ্চিম বাংলায় বৎসরে মাথা পিছু ভাগ পড়িবে ৪ মণ, পূর্ব্ব বাংলায় ৪¾ মণ। জীবনধারণের জন্য প্রত্যেকের ৫ মণ চাউল প্রয়োজন—তাই হিন্দু বঙ্গের অনাহার মুস্লীম বঙ্গের অপেক্ষা বেশী হইবে। সমস্যাটি ইহার চেয়ে গুরুতর। যে চাউল পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়, তাহা যদি দৈববলে সকল অধিবাসীর মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হইত, তাহা হইলে অবস্থা উক্তরূপ হইত। উৎপাদকদের প্রয়োজন মিটাইয়া হিন্দু বাংলায় মাত্র তিন কোটি মণ চাউল বাজার জাত হয়। কিন্তু এইখানে চাউল কিনিবার লোকের সংখ্যা অধিক, কলিকাতার চতুঃপার্শ্বস্থ শিল্পাঞ্চলেই প্রায় ৫০ লক্ষ লোক। ৩ কোটী মনের চাউলের বাজার এই বিরাট চাহিদার বেগ সহ্য করিতে পারে না—চাউল অদৃশ্য হইয়া যাইবে, চোরাকারবার, অনাহার এবং দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইতে হইবে।

চাউলের পরেই আসে পাটের কথা। পূর্ব্ব বাংলা পাটের প্রধান উৎপাদন-কেন্দ্র। বিহার, উড়িষ্যা লইয়া হিন্দুস্থান বাংলায় যে পরিমাণ পাট উৎপন্ন হইবে, তাহার অন্ততঃ দ্বিগুণ পাট এক পূর্ব্ব বাংলায় উৎপন্ন হইবে। অথচ পাটকল একটীও পূর্ব্ব বাংলায় নাই, সবগুলিই পশ্চিম বাংলায়। পশ্চিম বাংলার ৯৮টি পাটকলকে যেমন পূর্ব্ব বাংলার কাঁচা পাটের উপর নির্ভর করিতে হইবে, ঠিক তেমনই, পূর্ব্ব বাংলার পাটচাষীকেও পশ্চিম বাংলার কাছেই পাট বিক্রয় করিতে হইবে।—নইলে কোথায় আর তাহারা বাজার পাইবে? শুধু তাই নয়—পাটকলের অধিকাংশ মালিক ইংরাজ, এবং মূলধন বিদেশী। সস্তায় কাঁচা পাট পাইবার জন্য যে মূলধন ৭০০০ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করিয়াছে সেই মূলধন নূতন অসুবিধা দূর করিবার জন্য আরও

২০০ মাইল গিয়া পূর্ব্ববঙ্গে নিয়োজিত হইতে পারে। ইহার পথে অনেক অসুবিধা আছে সত্য; তবু পশ্চিমবঙ্গের পাটশিল্পের স্থানান্তর বঙ্গভঙ্গের একটি সম্ভাব্য পরিণাম।

কৃষিজাত দ্রব্যের অভাবে পশ্চিম বাংলার যে অসুবিধা হইবে, তাহার সহস্রগুণ অসুবিধা হইবে পূর্ব্ব বাংলার—শিল্পজাত দ্রব্যের অভাবে। ১৯৩৯ সালে বাংলা দেশে ক্ষুদ্র-বৃহৎ ১৬৯৪টি কারখানা ছিল; তাহার মধ্যে ১১৭৪টি মধ্য এবং পশ্চিমবঙ্গে; ইহাদের মধ্যে আবার ৯৮০টি কলিকাতার নিকটস্থ শিল্পাঞ্চলে অবস্থিত। পূর্ব্ববঙ্গে ৫২০টি কারখানা রহিয়াছে।—কিন্তু শুধু সংখ্যা হইতে ধারণা করিতে পারা যাইবে না। পশ্চিমবঙ্গে—বিশেষ করিয়া কলিকাতা, হুগলী, হাওড়া এবং ২৪ পরগণা এই চারি জিলায়—শিল্প কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের মধ্যে এক ঢাকা সহরেই বড় কাপড়-কল আছে। কাপড়, চট্, লৌহ-ইস্পাত, কয়লা, ইঞ্জিনিয়ারিং—প্রভৃতির বড় বড় কারখানা-শিল্প ভাগীরথীর দুই পার্শ্বস্থ অঞ্চলে ঘনীভূত; পূর্ব্ববঙ্গের কারখানাগুলি প্রধানতঃ চাউল এবং চিনির ক্ষুদ্র কল। ইহার উপরে যুদ্ধের সময়ে কল-কারখানার যে প্রসার হইয়াছে তাহা প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গেই হইয়াছে। "Large scale Industrial Establishmentএর হিসাব মতো পূর্ব্ববাংলায় বৃহৎ কারখানা শিল্প নিম্নলিখিতরূপ।

বারোমাসিক			মরশুমী		
শিল্প	সংখ্যা	শ্রমিক	শিল্প	সংখ্যা	শ্রমিক
টেক্সটাইল	১৩	৪৪৪২	চিনিকল	৭	২১৩৩
ইঞ্জিনিয়ারিং	২৩	৭১৭১	চা-ফ্যাক্টরী	১২	৬৩০
ধানকল	৫০	২৭২৩	জুটপ্রেস প্রভৃতি	৬৪	১৭,৫৩৪
কেমিক্যাল	৪	২৫৫			
ছাপাখানা	১০	৩৮৬			
কাঠের কারখানা	৪	৫৭৫			
বিবিধ	৩	১২৬			
মোট	১০৭	১৫,৬৭৮		৮৩	২০,২৯৭

আর পশ্চিমবঙ্গের ৯৮টি পাটকলেই শুধু ৩ লক্ষ লোক কাজ করে; ইঞ্জিনিয়ারিং, ইস্পাত, বস্ত্র, যানবাহন, প্রভৃতিতে লক্ষ লক্ষ লোক কাজ করে। বাংলার সমস্ত Joint Stock কোম্পানীর ৮৯০ কোটি টাকা মূলধনের মধ্যে শতকরা ৯০ ভাগের বেশী পশ্চিমবঙ্গে নিযুক্ত। এক কথায় পূর্ব্ববঙ্গে উল্লেখযোগ্য কোন শিল্প নাই, সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাবে পূর্ব্ববঙ্গকে পশ্চিমবঙ্গের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। আর চিনি, কাপড়, লবণ, সিমেন্ট, রাসায়নিক দ্রব্য, প্রভৃতির জন্য তাহাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্যান্য প্রদেশের উপর নির্ভর করিতে হইবে। যদি সমস্ত বাংলা স্বেচ্ছায় ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভূক্ত থাকিত, অথবা যদি ঐক্যবদ্ধ বাংলা সার্ব্বভৌম হইত, প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংগ্রহে তাহাকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত না। কিন্তু যে ঘৃণা এবং বিদ্বেষের পর ভাগাভাগি হইতেছে, তাহার পর এই দ্রব্য সংগ্রহের ব্যাপার যে অনেক বেশী দুরূহ হইয়া যাইবে—তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

খনিজের অবস্থা আরও খারাপ। পূর্ব্ববঙ্গের নিম্নস্তরের জলাভূমিতে কোন খনিজই পাওয়া যায় না। বাংলায় ৭৩ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হয়, সবটাই পশ্চিম বাংলায়। উৎকৃষ্ট লৌহখনিও বাংলায় আছে তাহাও পশ্চিমবঙ্গে। পাকিস্থানের অন্যান্য অঞ্চলে পেট্রল, ক্রোমাইট্, সালফার পাওয়া যায়। কিন্তু এইসব দিয়া কয়লা, লৌহ, ম্যাংগানীজ, প্রভৃতির কাজ হইতে পারে না। অতএব ভবিষ্যতে পূর্ব্ব বাংলায় যে শিল্প প্রসার করার বৃহৎ পরিকল্পনার কথা শুনা যাইতেছে, সেইগুলিই বা কি প্রকারে হইবে? কৃষির উন্নতি খানিকটা চেষ্টা করিয়া করা যায়; শিল্পের সম্প্রসারণ খুব চেষ্টাসাপেক্ষ হইলেও সুষ্ঠু পরিকল্পনা এবং সরকারী চেষ্টার সাহায্যে তাহা সম্ভব। কিন্তু মানুষের কোন চেষ্টাতেই খনিজ সম্পদ্ বৃদ্ধি করা যায় না।

খনিজ এবং শিল্পে পাকিস্থান বাংলাকে যে গুরুতর অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। লীগ মুখপাত্রগণ অবশ্য এই অসুবিধার কথা উৎসাহের আতিশয্যে ভুলিয়া যান। কিন্তু তাঁহাদের লেখা হইতেই

যুক্তির অসারতা ধরা পড়িয়া যায়। পল্লীর মুসলমানদিগকে কৃষিকার্য্য ছাড়া অবশিষ্ট সময়ে কুটীর শিল্পে আত্মনিয়োগ করার কথা বলা হইতেছে। কুটীর শিল্পের খানিকটা উপযোগিতা থাকিলেও, অনিবার্য্য অর্থনৈতিক কারণেই কুটীর শিল্পের স্থলে কারখানা শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, এবং কেবলমাত্র কুটীর শিল্পের সাহায্যে দেশের শিল্প-প্রসার অবাস্তব পরিকল্পনা। আবার তাঁহারা সোভিয়েট রুশিয়ার মত দ্রুত শিল্পায়নের আকাশ-কুসুম রচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা মনে রাখেন নাই যে, সোভিয়েট রাশিয়ায় লৌহ, কয়লা, প্রভৃতি প্রাথমিক উপাদানের কোন অভাব ছিল না; পূর্ব্ব বাংলার সে অভাব আছে। বিপ্লবের পূর্ব্বেও সোভিয়েটে যত অল্পই হউক এইসব মূল শিল্পের প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হইয়াছিল—পূর্ব্ববঙ্গে এই রকম মূল শিল্পের কারখানা একটিও নাই। সর্ব্বোপরি সোভিয়েট বিপ্লবের পরে সেখানকার শ্রমিক ও কৃষকের মধ্যে যে বিপুল কর্ম্ম প্রেরণা জাগিয়া উঠে, জমিদার-জোতদার-প্রভাবাধীন বর্ত্তমান লীগ নেতৃত্ব মুসলীম জনসমাজের মধ্যে কিছুতেই সেই কর্ম্মচাঞ্চল্য জাগাইতে পারিবেন না।

তাহা ছাড়াও মনে রাখা প্রয়োজন, ভাগীরথী, ভৈরবী, সরস্বতী এই তিনটি নদীর অনেক অংশ মজিয়া যাওয়ায় পশ্চিম বাংলায় পতিত জমি অনেক আছে। বাংলার ৩৭ লক্ষ একর পতিত জমির অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে। পূর্ব্ববঙ্গে কৃষিযোগ্য জমির ১২ ভাগের ১ ভাগ মাত্র পতিত আছে—পশ্চিমবঙ্গে এক চতুর্থাংশ জমি পতিত। কৃষির প্রসার পশ্চিমবঙ্গেই সম্ভব। পূর্ব্ববঙ্গ হইতেছে পৃথিবীর ঘনতম বসতিপূর্ণ এলাকার অন্যতম। অতএব ঐস্থানে ভূমির উপর হইতে মানুষের চাপ কমাইয়া জনসাধারণকে চাকুরী দিবার সমস্যা প্রবলভাবে দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই লীগ-কাগজে বলা হইতেছে যে, পূর্ব্ববঙ্গের উদ্বৃত্ত লোকের জন্য কলোনী চাই, এবং আরাকান, বর্ম্মা এবং আসামের অংশবিশেষকে পূর্ব্ববঙ্গের উপনিবেশ করা হইবে। স্বাধীনতা

না পাইয়াই সাম্রাজ্যবিস্তারের এই সুখস্বপ্ন শুধু প্রতিক্রিয়াশীলতার পরিচায়ক নহে; অবাস্তব এবং হাস্তকরও বটে।

সংকীর্ণ দৃষ্টিতে পশ্চিম বাংলার অপেক্ষা পূর্ব্ববাংলার অসুবিধা অনেক বেশী হইবে। কিন্তু জাতীয়তাবাদীর দৃষ্টিতে, দেশের কোন একটি অংশের অসুবিধা হইলে সমস্ত দেশেরই অসুবিধা। সেইজন্য সমস্ত বাঙ্গালীর অসুবিধাটাই বড় কথা। খাদ্যের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের অসুবিধা গুরুতর হইবে এইজন্য যে, বর্ত্তমানে ভারতের সকল প্রদেশেরই খাদ্যের অবস্থা খারাপ এবং ক্রমবর্দ্ধমান প্রাদেশিকতার আবহাওয়ায় অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্য পাওয়ার আশা কমই। আরও গুরুতর কথা হইতেছে, দেশের দুর্ব্বল স্থানগুলি সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের চমৎকার ক্ষেত্র হইয়া রহিবে। মুসলমানদের মধ্যে বড় শিল্পপতি সংখ্যায় কম; তাই ক্ষয়িষ্ণু বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ অবলম্বন এবং বর্দ্ধিষ্ণু আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নূতন শীকার হইবে এইসব দুর্ব্বল পশ্চাৎপদ রাষ্ট্রগুলি। পূর্ব্ব পাকিস্থানকে সমৃদ্ধ করার নামে বৃটিশ এবং আমেরিকানরা প্রচুর পুঁজি নিয়োগ করিবে, এবং এই পুঁজিকে রক্ষা করার জন্য সামরিক চুক্তি করিবে, এবং উহা সমস্ত দেশের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিবে। দেশের কোন অংশে যদি প্রতিক্রিয়া শক্তিশালী হয়, তবে সমস্ত দেশেরই বিপদ্। অর্থাৎ যে বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আনিতে গিয়া এত কাণ্ড করিলাম—সেই বৃটিশকেই দেশের কতকগুলি স্থানে শক্তিশালী ঘাঁটী স্থাপনের এবং আমাদের দুই অংশের মধ্যে মধ্যস্থতা করার সুযোগ দিতেছি।

ভারতবর্ষের ভূমিপ্রথা

ভারতবর্ষ প্রধানতঃ কৃষিজীবী দেশ। এখানকার অর্থ-নৈতিক সমস্যাগুলি বুঝিতে গেলে ভারতের ভূমিপ্রথা এবং ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। ভারতের ভৌগোলিক পরিস্থিতি যেমন জটিল ও বৈচিত্র্যময়, ধর্ম্ম, জাতি, বর্ণ প্রভৃতি বিষয়ে ভারত যেমন অসংখ্যভাগে বিভক্ত, এখানকার ভূমিপ্রথা সেই রকমই বিচিত্র এবং ঐতিহাসিক কারণে এই বিচিত্র ভূমিপ্রথা আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভূমির সম্ভাব্য অধিকারী হইতেছে তিনজন: যে কর্ষণ করে অর্থাৎ কৃষক; ভূমিস্বত্ব যে ক্রয় করিয়াছে, অর্থাৎ রায়ত বা জমিদার; এবং রাষ্ট্র। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অধিকারী যে কে তাহা লইয়া অনেক তর্ক ও বাদানুবাদ প্রচলিত আছে। ভূমি আদৌ কেহ স্থায়ীভাবে ক্রয় করিতে পারে কিনা—তাহাও তর্কের বিষয়-বস্তু। বিভিন্ন দেশে এবং যুগে বিভিন্ন প্রথা অনুসরণ করা হইয়াছে। ভূমি যে ভোগ করে, যে চাষ করে, যে ক্রয় করে —ইহাদের প্রত্যেকের সঙ্গে রাজস্ব দেওয়ার দিক হইতে রাষ্ট্রের যে সম্বন্ধ বিদ্যমান তাহাকেই ভূমিপ্রথা বলে।

হিন্দুযুগে ভূমি ছিল গ্রাম্য সম্প্রদায়ের যৌথ অধিকার ভুক্ত। রাজার সম্পত্তি বলিয়া ভূমিকে কেহই দেখিত না। কেবল রাষ্ট্রকার্য্য পরিচালনার জন্য উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ রাজা লইতেন। মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দু-সমাজের প্রথাগুলিই কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সহকারে গৃহীত হইল এবং রাজার অংশ বাড়াইয়া এক-তৃতীয়াংশ করা হইল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করার পর তাহারা বৃটেনের আইন কানুন প্রবর্ত্তনের সাথে সাথে এই ভূমিপ্রথা সমূলে পরিবর্ত্তন করিল। ভূমির একমাত্র অধিকারী রাষ্ট্র এই ধারণা প্রচলিত হইল; ভূমির উপর যৌথ

অধিকারের পরিবর্তে জমিদার বা রায়তের সম্প্রদায়গত অধিকার প্রতিষ্ঠা করা হইল; রাজস্ব দিবার দায়িত্ব সম্প্রদায়গত না হইয়া ব্যক্তিগত করা হইল; ভূমিরাজস্বকে কর হিসাবে না দেখিয়া খাজনা হিসাবে গণ্য করা হইল।

এই মূলনীতি ঠিক রাখিয়া অবস্থা ভেদে বিভিন্ন প্রদেশে ভূমিপ্রথা এবং রাজস্ব আদায় প্রথা ভিন্নরূপ করা হইয়াছে। ভূমির দখলদার কে,—এই প্রশ্নের ভিত্তিতে জমিদারী এবং রায়তারী এই দুই ভূমিব্যবস্থা ভারতে প্রচলিত আছে এবং দখলের স্থায়িত্ব কতদিন এই প্রশ্নের ভিত্তিতে চিরস্থায়ী এবং অস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলিত আছে। জমিদারী প্রথা সাধারণতঃ চিরস্থায়ী করা হইয়াছে, কিন্তু কোন কোন জায়গায় অস্থায়ী জমিদারী প্রথাও প্রচলিত আছে। অস্থায়ী জমিদারী প্রথার একটি রূপান্তর হইতেছে মালগুজারী প্রথা,—ইহা মধ্যপ্রদেশে বর্তমান রহিয়াছে। এই তিন প্রকার ভূমিপ্রথা ছাড়া কোন কোন প্রদেশে মহল্বারী প্রথা বলিয়া একরূপ ভূমি ব্যবস্থা রহিয়াছে। জমিদারী, রায়তরী, মালগুজারী এবং মহল্বারী—এই চারি প্রকার ভূমিপ্রথা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা প্রয়োজন।

জমিদারী প্রথা :—জমিদারী প্রথা প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলা দেশে; পরে ইহা অন্যান্য প্রদেশে প্রসারিত হয়। বাংলার জমিদারী প্রথার ইতিহাস হইতেছে এইরূপ। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন পত্তন হওয়ার পর বাংলা দেশে ভীষণ অরাজকতা দেখা দেয়। উপর্যুপরি অজন্মার ফলে ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ দৃষ্ট হয় এবং কৃষিবিদ্রোহের মত কতকগুলি ঘটনা ঘটে। রাজস্ব আদায় অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন গ্রাম অঞ্চলে প্রবেশ করিতে পারে না। এই সময়ে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বিলাতে প্রচলিত জমিদারী প্রথা বাংলা দেশে প্রতিষ্ঠিত করেন। মোগলদের আমলে যে সমস্ত সম্রান্ত কৃষক বা মোড়ল কর আদায় করিত, তাহাদিগকে জমির স্বামী মালিকানা দেওয়া হইল। এই সমস্ত নবপ্রতিষ্ঠিত জমিদারকে জমি ভোগ, বিলি এবং রক্ষণাবেক্ষণ করার

দায়িত্ব দেওয়া হইল। কৃষকেরা চাষ করিবে, জমিদারেরা কৃষকের নিকট খাজনা আদায় করিবে এবং রাষ্ট্রকে রাজস্ব দিবে। সেই সময়ে কৃষকের নিকট যে পরিমাণ খাজ্‌না আদায় হইত, তাহার $\frac{10}{11}$ ভাগ রাষ্ট্রকে দেয় খাজ্‌না হিসাবে স্থায়ীভাবে স্থিরীকৃত হইল। অবশিষ্ট ১ ভাগ আদায়ের পারিশ্রমিক হিসাবে রহিল। রাজস্ব দিবার একটি শেষ দিন নির্দ্দিষ্ট হয়। স্থির হয় যে, যে জমিদার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব দিতে পারিবেন না, তাহার জমি নীলামে বিক্রয় করিয়া রাজস্ব শোধ করা হইবে, এবং নূতন ক্রেতা জমিদার বলিয়া গণ্য হইবে। প্রথম দিকে এই সমস্ত সর্ত্ত জমিদারদের পক্ষে খুবই কঠোর হইয়াছিল; কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে পতিত জমির আবাদ, উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং ফসলের মূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে আদায়ীকৃত খাজনার পরিমাণ বহুগুণ বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাপ্য ১৭৯৩ সাল হইতে একই হারে নির্দ্দিষ্ট থাকে।

জমিদারী ব্যবস্থা অধিকাংশই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। ১৭৯৩ সালে বাংলা দেশে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা প্রচলিত হয়। তাহার পর যুক্তপ্রদেশ, বিহার প্রভৃতি স্থানে জমিদারী ব্যবস্থা প্রসারিত করা হয়। ভারতবর্ষের সমস্ত জমির মোট শতকরা ১৯ ভাগ অংশে (অর্থাৎ ১২ কোটী একর জমিতে) চিরস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত রহিয়াছে। অস্থায়ী জমিদারী প্রথা প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, ও পাঞ্জাব, মাদ্রাজ এবং বাংলার অংশ বিশেষে প্রচলিত আছে। ভারতের মোট জমির শতকরা ৩০ ভাগ অস্থায়ী জমিদারী ব্যবস্থায় রহিয়াছে।

মালগুজারী বন্দোবস্ত :—

মালগুজারী ব্যবস্থাকে অস্থায়ী জমিদারী প্রথার একটি রূপান্তর বলা হইয়াছে। মারাঠাদের আমলে রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব আদায় করিবার জন্য মালগুজার বলিয়া এক সম্রান্ত গ্রাম্য সম্প্রদায় নিযুক্ত ছিল। বৃটিশ সরকার এই মালগুজারদের জমিদারের অধিকার দান করিল; কিন্তু ইহাদের রাজস্ব স্থায়ী ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইল না। এই ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন হওয়ার পর জমির গুণাগুণ পর্য্যবেক্ষণ

করা হয় এবং কৃষকদের দেয় খাজ্‌নার অর্দ্ধেক রাজস্ব হিসাবে স্থিরীকৃত হয়। পরবর্ত্তী Settlement পর্য্যন্ত এই রাজস্বই নির্দ্দিষ্ট থাকে; এবং প্রয়োজন হইলে নূতন Settlementএর সময় রাজস্ব বর্দ্ধিত করা হয়। মালগুজারগণ জমি সরকারের নিকট পান, কিন্তু সেই জমিতে প্রজা বসাইবার সময়ে খাজ্‌না নির্দ্ধারণ ব্যাপারে Settlement office কর্ত্তৃত্ব করেন। বস্তুতঃ, মালগুজাররা আসলে রায়ত, তাহারা কৃষক এবং সরকারের মধ্যে মধ্যস্থতা করে; এবং খাজ্‌না আদায় করার জন্য খাজনার কিছু অংশ পারিশ্রমিক পায়।

রায়তারী প্রথা :—

রায়তারী প্রথায় রাষ্ট্রের নিকট হইতে রায়ত সোজাসুজী জমি ইজারা লয় এবং রাজস্ব দিবার জন্য রাষ্ট্রের নিকট ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকে। এই প্রথায় রাষ্ট্রই জমির একমাত্র মালিক; রায়ত জমি ভোগ করে এবং ভাড়া দেওয়া, হস্তান্তর করা, বা স্বত্ব ত্যাগ করা বিষয়ে অধিকার লাভ করে। ইজারা ২০।৩০ বৎসর বলবান্‌ থাকে; তাহার পর আবার নূতনভাবে জমি বিলি করা হয় এবং কর নির্দ্ধারণ করা হয়। রায়ত যতদিন রাজস্ব দিতে পারে, ততদিন তাহার ভোগ করার অধিকার বজায় থাকে। এই ব্যবস্থায় সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য নিদর্শন হইতেছে রাষ্ট্রের সহিত রায়ত বা কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। বোম্বাইপ্রেসিডেন্সি, বেরার, মাদ্রাজের অধিকাংশ, সিন্ধু এবং আসামে রায়তী ভূমিপ্রথা প্রচলিত আছে।

রায়তারী ব্যবস্থার দুইটি প্রকার ভেদ দেখা যায়: প্রথম ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত দখলদার রাষ্ট্রের নিকট জমির স্বত্ব গ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় ব্যবস্থায় কোন গ্রামের সমস্ত অধিবাসী যৌথভাবে রাষ্ট্রের নিকট জমির দখল লয় এবং গ্রামের মোড়লরা মিলিতভাবে খাজ্‌না দিবার জন্য দায়ী থাকে। এই দ্বিতীয় প্রথাকে মহলবারী ব্যবস্থা বলা হয়; যুক্তপ্রদেশে এবং পাঞ্জাবের স্থানে স্থানে এই প্রথা প্রচলিত আছে। ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত রায়তারী প্রথায় (মহলবারী) মিলিতভাবে ভারতবর্ষে ২৮'৫ কোটী একর বা শতকরা ৫১ ভাগ জমি বন্দোবস্ত

রহিয়াছে। যেখানে রায়ত বা দখলদার ব্যক্তিগতভাবে জমি ভোগ করে, সেখানে গ্রাম্য সম্প্রদায়ের সম্প্রদায়গতভাবে কোন অর্থনৈতিক দায়িত্ব থাকে না, রায়ত তাহার জমি বিক্রয়, বন্ধক, হস্তান্তর, যাহা ইচ্ছা করিতে পারে।

মহলবারী প্রথা :—

যুক্তপ্রদেশ যখন বৃটিশ শাসনের অন্তর্ভূক্ত হয়, তখন কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়, যেখানে গ্রামবাসীরা একই নবাবের বংশধর বা কোন সম্ভ্রান্ত দলপতির অধীনে পঞ্চায়তী ব্যবস্থায় বাস করে। এই সব দলপতিরা তাহাদের চিরাচরিত জীবন এবং কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য দলগতভাবে গ্রামের জমিদারী দাবী করে, এবং রাজস্ব আদায়ের ভার লইতে স্বীকৃত হয়। বৃটিশ সরকার তাহাদের শাসনের সুবিধার জন্য এইসব দলপতিদের অধিকার স্বীকার করিয়া লয়, এবং রাজস্ব দিবার ব্যাপারে দলপতিদিগকে এবং গ্রাম্য সম্প্রদায়কে ব্যক্তিগতভাবে ও দলগতভাবে দায়ী করে। পাঞ্জাবেও লম্বরদার নামীয় মোড়লদের সহিত অনুরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। উত্তরকালে গ্রামে নানাবিধ লোক দেখা যাওয়ায় গ্রামের যৌথ দায়িত্ব ক্রমে নষ্ট হইয়া যায়, এবং ব্যক্তিগত দায়িত্ব আসিয়া পড়ে। সম্প্রদায়ের ঐক্য এবং গুরুত্ব কমিয়া যায়, মহলবারী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য নষ্ট হইয়া গিয়া রায়তারী প্রথার ব্যক্তিগত মালিকানা ক্রমশঃ আসিয়া পড়ে।

• সমস্ত আলোচনার পর একটি কথা অত্যন্ত স্পষ্ট হইয়া যায়, যে ভারতের জটিল ভূমিপ্রথা কোন নীতির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বৃটিশ শাসন সর্ব্বাপেক্ষা সহজে কায়েম করিবার জন্য, যেরূপভাবে গ্রাম্য জনতাকে পরস্পরের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো যায়, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই এখানকার ভূমিপ্রথা প্রচলন করা হইয়াছিল। বর্ত্তমানে বৃটিশ শাসন অবসানের সময়ে, দেশের শ্রীবৃদ্ধির প্রয়োজন অনুযায়ী এই ভূমি ব্যবস্থাকে আমূল পরিবর্ত্তন করিতে হইবে।

জমিদারী প্রথার অবসান

স্বাধীন ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের জন্য যে সমস্ত পরিকল্পনা এখনি কার্য্যকরী করা প্রয়োজন, জমিদারী প্রথার অবসান তাহাদের মধ্যে অত্যন্ত জরুরী। গত এক বৎসরে বিহার এবং যুক্তপ্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা জমিদারী প্রথা অবসানের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন; বাংলাতেও লীগ মন্ত্রীসভা একটি দুইটি জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া নূতন ভূমিপ্রথা প্রচলন করিবার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। তারপর সারা দেশময় অন্যান্য গুরুতর সংকট দেখা দেওয়ার ফলে সকল গঠনমূলক কাজের সহিত ভূমিপ্রথার সংস্কারের কাজও বন্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে আবার দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিতেছে; দেশ ভাগাভাগির ভিত্তিতে যাহা হউক একটা নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে। এখন দুই রাষ্ট্রেই জমিদারী প্রথার উচ্ছেদের দাবী শক্তিশালী হইয়া উঠিবে। জমিদারী প্রথার অবসানের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে বাংলার শিক্ষিত সমাজ একমত নহেন; সেইজন্য ইহার পক্ষে বা বিপক্ষে যে সব যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

বাংলার জমিদারী প্রথার ইতিহাস আমরা দেখিয়াছি। তৎকালীন অনিশ্চিত আবহাওয়ার মধ্যে নিশ্চিত ও নিশ্চিন্ত ভাবে রাজস্ব পাইবার উদ্দেশ্যে এবং অসন্তুষ্ট কৃষক সমাজের সম্মুখে এদেশেরই একটি বিত্তবান্ শ্রেণীকে দাঁড় করাইবার উদ্দেশ্যে, বৃটেনের ভূমিপ্রথার অনুকরণে জমিদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। জমিদারী প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়ার ফলে তদানীন্তন বাংলা সরকার এই দুইটি সুবিধা সত্যই পাইয়াছিল। রাজস্ব আদায় নিশ্চিত হইয়াছিল, কৃষকের অসন্তোষ দমনের ভার এই দেশেরই জমিদারশ্রেণী গ্রহণ করায়, সরকারের শাসনযন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং কিছুদিন পর পর নূতনভাবে জমি বিলি করিবার এবং কর নির্দ্ধারণ

করিবার দায়িত্ব রাষ্ট্রকে লইতে হয় নাই। একথাও বলা হইয়াছে, যে জনসাধারণও এই ব্যবস্থা হইতে অনেক সুবিধা পাইয়াছে। প্রথমতঃ জমিদারেরা পতিত জমির আবাদ করিয়াছে এবং জমির উন্নতি করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, অবস্থাপন্ন জমিদারেরা দেশে নূতন শিক্ষা সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করিয়াছে, স্কুল কলেজ প্রভৃতি স্থাপন করিয়াছে। জনসাধারণের এই সমস্ত সুবিধা কতখানি সত্য—তাহা আমরা পরে দেখিব। সরকারের সুবিধা হইয়াছিল, একথা ঠিক; তবে যেহেতু সরকার ছিল বিদেশী এবং জনস্বার্থবিরোধী, সেইজন্য সরকারের যেগুলি সুবিধা তাহাকে জনস্বার্থের পরিপন্থী বলা যায়।

পরবর্ত্তী যুগে সরকারের সুবিধাগুলি ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়; এবং আরম্ভের সময়কার অসুবিধাগুলির সহিত আরও অনেক কুফল আসিয়া দেখা দেয়। বর্ত্তমানে কি সরকার, কি জমিদার, কি জনসাধারণ কাহারও পক্ষেই জমিদারী প্রথা কল্যাণকর নহে। জমিদারী প্রথার কতকগুলি প্রধান কুফল লক্ষ্য করা প্রয়োজন। ১৭৯৩ সালের পর হইতে বহু নূতন জমি চাষের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য ফসলের মূল্য বৃদ্ধি পাইয়াছে; ফসলের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কৃষকদের দেয় খাজ্‌নার পরিমাণ অনেক বাড়িয়াছে, অথচ রাষ্ট্রের প্রাপ্য রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট থাকায়, রাষ্ট্র অনেকখানি সম্ভাব্য আয় হইতে বঞ্চিত হইতেছে। বর্ত্তমানে রাষ্ট্র জনগণের রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে; অতএব এই ক্ষতি জনসাধারণের ক্ষতি। এই ক্ষতির পরিমাণ হিসাব করা শক্ত। তবে মোটামুটি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে, বাংলার জমিদার প্রভৃতি মধ্যস্বত্ব ভোগীরা কৃষকদের নিকট খাজ্‌না বাবদ প্রতি বৎসর ১৩½ কোটী টাকা লইয়া থাকে। তাঁহারা সরকারকে রাজস্ব ও সেস বাবদ দেন ২·৮৭ কোটী টাকা; খাজ্‌না তুলিবারও জমিদারী চালাইবার খরচ ২·৩৪ কোটী টাকার বেশী হইবে না; অবশিষ্ট ৮ কোটী টাকা জমিদারের বিনামূলধনের মুনাফা। ইহা অবশ্য আইন সঙ্গতভাবে তাঁহারা যাহা লন, তাহার হিসাব। বে-আইনী ভাবেও বিস্তর টাকা তাঁহারা (কৃষকদের নিকট হইতে) সংগ্রহ করেন।

দ্বিতীয়তঃ, জমি জমিদারদের কর্তৃত্বে ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য, সরকারের সহিত কৃষকদের সংস্রব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। কৃষকদের প্রতি সরকার কোন দায়িত্ব অনুভব করে না; জমিদারেরাও কৃষক বা কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ কিছু করেন না; ফলে কৃষি অত্যন্ত অবজ্ঞাত এবং অবনত অবস্থায় পড়িয়া আছে। কৃষকদের পরিশ্রমের ফলে যে বিরাট মুনাফা হয়, তাহার কিয়দংশ কৃষির উন্নতির জন্য ব্যয় করা কর্ত্তব্য। কিন্তু জমিদারেরা তাহা করেন না। বাংলা দেশে মোট ২ কোটী ৯০ লক্ষ একর চাষের জমি আছে। তাহার মধ্যে গত ১৫০ বৎসরের মধ্যে মোট ১৭ লক্ষ একর জমিতে জমিদার জোতদারেরা কোনরূপ সেচের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। দেশে এখনও প্রায় ৩৭ লক্ষ একর জমি পতিত রহিয়াছে। জমিদারের আয়ের একদশমাংশও যদি গত ৫০ বৎসর ধরিয়া সেচের ও সারের ব্যবস্থার জন্য ব্যয়িত হইত, বাংলা দেশের কৃষির অবস্থা তাহা হইলে আজ অন্যরূপ হইত। জমির উন্নতি বন্ধ, কৃষকের উপর ক্রমবর্দ্ধমান খাজনার চাপ এবং কৃষিঋণের বোঝা, জমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, কৃষির উন্নতির প্রতি সরকারের, জমিদারের এবং কৃষকের ঔদাসীন্য, ইত্যাদি কারণে বাংলায় ফসল উৎপন্ন কম হয়, ফলে অনাহার, মহামারী, দুর্ভিক্ষ বাংলার বাৎসরিক ঘটনা হইয়া উঠিয়াছে।

ফ্লাউড্ কমিশনের নিকট ডাঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জি তাঁহার বিবরণে দেখাইয়াছেন যে, ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বাংলার ৩ ভাগের ২ ভাগ জমি পতিত ছিল। বর্ত্তমানে ১২ ভাগের এক ভাগ মাত্র জমি পতিত আছে। এই হিসাব দেখাইয়া তিনি বলিতে চাহিয়াছেন জমিদারেরা বিস্তর পতিত জমি আবাদ করিয়াছেন, এবং দেশের হিতসাধন করিয়াছেন। পতিত জমি আবাদ করার অর্থ যদি হয়, মূলধন খাটাইয়া, সারের বন্দোবস্ত করিয়া চাষের অযোগ্য জমিকে চাষের যোগ্য করিয়া তোলা, তাহা হইলে জমিদারেরা সেজন্য যতটুকু করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। সমগ্র জমির ১৭ ভাগের এক ভাগ অংশে কিছু-না-কিছু সেচের ব্যবস্থা

হইয়াছে। ১৭৯৩ সালের পর হইতে কৃষির জমি বাড়িয়াছে প্রধানতঃ এই কারণে যে, গ্রামের লোক-সংখ্যা বাড়িয়াছে, দেশের কারিগরেরা ব্যবসায় হারাইয়া জমির উপর অধিক নির্ভরশীল হইয়াছে এবং বাঁচার তাগিদে তাহারাই ধার কর্জ্জ করিয়া জমির জন্য জমিদারদের সেলামী ও নজর যোগাইয়া কোনমতে চাষের যোগ্য জমিতে চাষ করিতেছে।

পরশ্রমজীবী সরকারী-অনুগ্রহপুষ্ট জমিদার শ্রেণী দেশের সমস্ত প্রগতির পথে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতিবন্ধক হিসাবে কার্য্য করিয়াছে। জমি হইতে সহজে লাভ হয় বলিয়া মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং ধনিকশ্রেণী শিল্পে ও বাণিজ্যে মূলধন না খাটাইয়া জমিতে মূলধন নিযুক্ত করিয়াছে। ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতির উদ্যোগ দেশ হইতে চলিয়া গিয়াছে। এমনকি জমিদারদের মুনাফার যে অর্থ তাহাও শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি গঠনমূলক কার্য্যে নিয়োজিত না হইয়া, অধিকাংশ সময়ে ব্যক্তিগত বিলাস-ব্যসনে ব্যয়িত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেশের মেরুদণ্ড যে কৃষকশ্রেণী তাহার বিরুদ্ধে জমিদারদের দাঁড় করাইয়া, সমস্ত প্রগতিমূলক আন্দোলনের, এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের সম্মুখে বাধা সৃষ্টি করা হইয়াছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকার জন্য কৃষক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যন্ত বেশী সংখ্যক মধ্যস্বত্ব ভোগীর আবির্ভাব হইয়াছে। তাহারা নিজেরা পরিশ্রম না করিয়া, অপরের শ্রমের উপর নির্ভর করে, আর ভূমিপ্রথাকে অত্যন্ত জটিল করিয়া তুলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কৃষক এবং রাষ্ট্রের মধ্যে ৪।৫ জন মধ্যস্বত্ব ভোগী আছে; বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ১৫।২০ জন অকৃষক মধ্যস্বত্ব-ভোগী রহিয়াছে। এতজন মধ্যস্বত্ব-ভোগী থাকার জন্য, কে যে জমির উন্নতি করিবে, কে যে কৃষকের স্বার্থ দেখিবে, তাহার কোন ঠিক থাকে না। উপরন্তু প্রত্যেকেরই আয় অতি সামান্য, এবং এই কারণেই বাংলার জমিদারদের অধিকাংশ ঋণগ্রস্ত এবং দুরবস্থাপন্ন। বাংলাদেশে ছোট বড় জমিদার মিলাইয়া সবশুদ্ধ ৬ লক্ষ খাজনা-ভোগী পরিবার আছে। আবার সমস্ত জমিদারীর এক

তৃতীয়াংশ নয়টি জমিদার-পরিবারের দখলে। এই ৬ লক্ষ পরিবারের শতকরা ৯০।৯৫ জনের আয় সামান্য এবং অবস্থাও শোচনীয়। তাই সর্ব্বাপেক্ষা নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা হইতেছে যে জমিদারদের শতকরা ৯৫ জনের পক্ষেই জমিদারী প্রথা মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহারা ভূমির মায়া ত্যাগ করিতে পারে না, অথচ ভূমিও ইহাদের ভরণপোষণ করিতে পারে না। ভাগ্যলক্ষ্মী কখন যে অলক্ষ্যে ভূমি হইতে চলিয়া গিয়া শিল্পে আশ্রয় লইয়াছেন,—তাহারা তাহা লক্ষ্য করে নাই। ভাগ্য ফিরিবার আশায় জীর্ণ, পুরাতন ব্যবস্থাকে আঁকড়াইয়া পড়িয়া আছে। বাংলার জমিদার এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর মধ্য হইতে ভূমির মোহ কাটাইতে হইবে এবং শিল্প-বাণিজ্য প্রভৃতির বিরাট সুযোগের দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে।

অতএব জমিদারী প্রথার অবসান করিয়া রাষ্ট্রের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধের ভিত্তিতে নূতন ভূমিপ্রথা গড়িয়া তুলিতে হইবে। জমিদারী প্রথার অবসানের সহিত কতকগুলি সমস্যা জড়িত রহিয়াছে। প্রথম কথা, জমিদারদের জমি লইতে হইলে, তাহার সহিত সমস্ত মধ্যস্বত্ব ভোগীদের জমি লইতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ, গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া এ্যাক্টএর ২৯৯ ধারা অনুযায়ী যাহার নিকট হইতেই জমি লওয়া হউক তাহাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। কী হারে ক্ষতি-পূরণ দেওয়া হইবে—ইহাও একটি জটিল সমস্যা। ফ্লাউড্ কমিশনের সদস্যরা জমিদারের নীট লাভের ৫, ১০, ১২, ১৫, এমন কি ২০ গুণ পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের কথা বলিয়াছেন। তবে বেশী সদস্য ১০ গুণ ক্ষতিপূরণের রায় দিয়াছেন।

জমিদারদের নীট লাভের দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে, এই সর্ত্তে সমস্ত জমিদারী ক্রয় করার খরচ হিসাব করা দরকার। রাজস্ব ও সেস এবং জমিদারের আদায়ের খরচ মিলাইয়া ৫·২১ কোটী টাকা হয়। ইহা ১৩ কোটী টাকা হইতে বাদ দিলে নীট লাভ দাঁড়ায় ৭.৭৯ কোটী টাকা। ইহার দশগুণ হয় ৭৭.৯ কোটী টাকা। বাকী খাজনা বাবদ ১৩ কোটী টাকা+সমস্ত পরিবর্ত্তনের জন্য প্রাথমিক খরচ ৫.৮ কোটী টাকা+তহসীল অফিস নির্ম্মাণের জন্য ১.৩ কোটী টাকা

ইহার সহিত যোগ দিতে হইবে। মোট খরচ দাঁড়ায় ৯৮ কোটী টাকা। নূতন ব্যবস্থা প্রচলিত হওয়ার পর ভবিষ্যতে রাষ্ট্রের আয় হিসাব করিলে দেখা যায়, যে বর্ত্তমান হারে খাজনা বজায় রাখিলে সরকার ১০.১৩ কোটী টাকা বর্ত্তমান রাজস্ব অপেক্ষা বেশী পাইবে; ইহার মধ্যে শতকরা ১৪% হারে আদায়ের খরচ পড়িবে ১.৮২ কোটী, খাজনা মকুব এবং অনাদায় বাবদ শতকরা ১০% হারে ১.৩ কোটী, ৯৮ কোটী টাকার উপর শতকরা ৪% হারে সুদের জন্য ৩.৯২ কোটী টাকা খরচ হইবে। ২% হারে ৬০ বৎসরের মেয়াদে Sinking Fund বাবদ .৮৬ কোটী পড়িবে। সমস্ত খরচ বাদ দিয়া রাষ্ট্রের নীট লাভ থাকিবে ২.২৩ কোটী টাকা। অর্থাৎ দশগুণ ক্ষতিপূরণ দিয়াও নূতন ব্যবস্থায় সওয়া দুই কোটী টাকা রাষ্ট্রের অতিরিক্ত লাভ হইবে। এই লাভ হইতে রাষ্ট্র কৃষির উন্নতি, গ্রামের সংস্কার প্রমুখ নানাবিধ জাতিগঠন মূলক কাজ করিতে পারিবে।

প্রশ্ন হয়, জমিদারী ক্রয়ের জন্য ৯৮ কোটী টাকা রাষ্ট্র কোথা হইতে পাইবে? টাকার কিয়দংশ জনসাধারণের নিকট ঋণ করিয়া এবং কিয়দংশ কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ঋণ করিয়া পাওয়া যাইতে পারে; অবশিষ্টের জন্য জমিদারদের নগদ টাকা না দিয়া ভবিষ্যতে পরিশোধ্য Bondএর সাহায্যে মূল্য দেওয়া যাইতে পারে। এই Bondগুলি যদি সরকার কর্ত্তৃক guaranteed হয় এবং জমিদাররা ইহাদের উপর যদি সুদ পান, তবে Bond গ্রহণ না করার কোন কারণই তাহাদের থাকিতে পারে না। উপরন্তু এই Bondগুলি নূতন medium of payment হইয়া ব্যাংক প্রভৃতির কার্য্যকরী মূলধন বৃদ্ধি করিয়া নূতন Investmentএর সুবিধা করিয়া দিবে।

কৃষকদের পক্ষ হইতে একটী শক্তিশালী এবং জনপ্রিয় দাবী হইতেছে —বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথার অবসান করা হউক। তাহাদের যুক্তি হইল, গত ১০০ বৎসর জমিদারেরা জমি হইতে অন্যায় ভাবে যে বিরাট লাভ করিয়াছেন, তাহাতেই যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ হইয়া গিয়াছে।

কৃষকেরা শস্য ফলাইয়াছে, অথচ তাহারাই অনাহারে, দুর্ভিক্ষে মরিয়াছে। অতএব ক্ষতিপূরণ যদি কাহাকেও দিতে হয়, তবে তাহা দিতে হইবে কৃষককে, জমিদারকে নয়। নিজের পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্ম অবশ্য জমিদারদের নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ জমি ছাড়িয়া দিতে হইবে। এই দাবীর যৌক্তিকতা আমরা বিচার করিব না। যুক্তিসংগত হউক আর না হউক, বর্ত্তমান অবস্থায় এই দাবী পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। ক্ষতিপূরণ দিয়া উচ্ছেদ করাই আজিও সম্ভব হইল না। আর ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন, ক্ষতিপূরণ না দিলে অনেক ক্ষুদ্র জমিদার এবং অনেকে যাহারা সম্প্রতি স্বোপার্জ্জিত অর্থে জমি ক্রয় করিয়াছেন তাহাদের প্রতি অন্যায় করা হইবে।

জমিদারী প্রথার অবসানের পর বাংলার রূপ বদলাইয়া যাইবে। সমস্ত সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন দেখা দিবে। সম্মুখে দৃষ্টি থাকিলে সেই প্রতিক্রিয়া কাটাইয়া উঠিয়া আবার প্রগতির পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইবে। জমিদারদের নূতন পথের সন্ধান দিতে হইবে। ব্যবসা, বাণিজ্য ও শিল্পে যে অবর্ণনীয় সুযোগ আছে সেইদিকে দৃষ্টি দিলে, জমি হইতে যে সোনা ফলিত, তাহা অপেক্ষা বহুগুণ মূল্যবান সোনা ফলিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, কৃষিব্যবস্থাকে নূতন করিয়া গড়িতে হইবে। রাষ্ট্রের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিলেই, আপনা হইতে সমস্যা সমাধান হইবে না। পরিকল্পনা করিয়া, আদর্শ কৃষিক্ষেত্র গড়িয়া, কৃষককে উন্নত ধরণের কৃষিকার্য্য শিখাইতে হইবে। উন্নত যন্ত্র, বৈজ্ঞানিক সার, আধুনিক সেচ-ব্যবস্থা এবং কৃষিশিক্ষার বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়া, কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাড়াইতে হইবে। শুধু ভূমি-প্রথা পরিবর্ত্তন দ্বারা উল্লেখযোগ্য কিছু লাভ হইবে না। ভূমিপ্রথার পরিবর্ত্তন প্রথম প্রয়োজন বটে, কিন্তু তাহার পর এই সব গঠনমূলক কার্য্যে দৃষ্টি না দিলে সমস্ত প্রচেষ্টার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

ভারতের বৈদেশিক মূলধন

বিদেশী সরকার আমাদের দেশ হইতে চলিয়া যাইতেছে। ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তরিত হইয়া গিয়াছে; বিদেশী সৈন্য-বাহিনীও আমাদের দেশ ছাড়িয়া জাহাজে চড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভুত্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে অর্থ নৈতিক শোষণ শেষ হওয়ার কী লক্ষণ আমরা দেখিতে পাই? বিদেশীর অর্থনৈতিক শোষণের বৃহত্তম চিহ্ন হইতেছে আমাদের দেশে নিয়োজিত বিদেশী মূলধন। বিদেশীরা আমাদের দেশে মূলধন নিয়োগ করিয়া, সস্তায় শ্রমিক খাটাইয়া পণ্য উৎপাদন করে; এবং সেই পণ্য এদেশের ক্রেতাদের নিকট উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিয়া বিরাট মুনাফা করে এবং সেই মুনাফা দেশে লইয়া যায়। চতুর্দ্দিকের লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, রাজনৈতিক প্রভুত্বের অবসান হইলেও বিদেশীর অর্থ নৈতিক শোষণ চলিতে থাকিবে; বিদেশী মূলধন এই দেশ হইতে চলিয়া যাইবার কোন লক্ষণ এখনও দেখিতে পাওয়া যায় না। বিদেশীরা এদেশে ব্যবসায়ী হিসাবে আসিয়া, পরে রাজত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এখন রাজত্ব চলিয়া গেলেও, ব্যবসায়ী হিসাবে থাকিয়া যাইতেছেন।

• ভারতে বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ সঠিকভাবে নির্দ্ধারণ করা হয় নাই। হিসাব করিয়া দেখা যায়, এখানে বিদেশী মূলধনের পরিমাণ, ১৯১৪ সালে ২৯·৮ কোটী পাউণ্ড, এবং ১৯৩২-৩৩ সালে ৮৩ কোটী পাউণ্ড ছিল। British Associated Chambers of Commerce ১৯৩৩ সালে হিসাব করিয়া ভারতের বৈদেশিক মূলধনের মোট পরিমাণ ১০০ কোটী পাউণ্ড দেখাইয়াছিলেন, এবং তাহার নিম্নলিখিতরূপ শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন।

	কোটী পাউণ্ড
সরকারের ষ্টার্লিং ঋণ	৩৭.৯
বাহিরে রেজিষ্ট্রীকৃত কিন্তু ভারতে কর্ম্মরত কোম্পানী	৫০.০
ভারতে রেজিষ্ট্রীকৃত ও ভারতে কর্ম্মরত কোম্পানী	১২.১

এইখানে জানিয়া রাখা প্রয়োজন ভারতে নিযুক্ত বিদেশী মূলধনের অধিকাংশই বৃটিশ, মাত্র ২০ কোটী পাউণ্ড অন্যান্য দেশীয়।

১৯৩০-৩১ হইতে ১৯৩৯-৪০ পর্য্যন্ত যে Statistical Abstract প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার হিসাবমত, ১৯৩৮-৩৯ সালে ভারতে নিযুক্ত ষ্টার্লিং মূলধন বিভিন্ন শিল্পবাণিজ্যের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপে বিভক্ত ছিল।

শিল্প	কোটী পাউণ্ড
রেলওয়ে ও ট্রামওয়ে	২.৩
অন্যান্য যানবাহন	১.২
চা-বাগান	২.৬
খনিশিল্প	১১.১
অন্যান্য দীর্ঘ মেয়াদী স্থায়ী পুঁজি	১.৫
ব্যাংকিং এবং ঋণের কারবার	৯.৬
ইন্‌সিওরেন্স	৭.৮
নাবিক কোম্পানী (বীমা কোম্পানী)	৩.৫
ব্যবসায় এবং কারিগরী	৩৪.৪
মোট	৭৪.১

ভারত সরকারের যে ৩৫ কোটী পাউণ্ড ষ্টার্লিং ঋণ ছিল তাহা যুদ্ধের সময়ে সঞ্চিত ভারতের ষ্টার্লিং পাওনার সাহায্যে শোধ হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ভারতে বৈদেশিক মূলধন মোট ৭৫ কোটী টাকার মত। বৃটেনের বাহিরে নিযুক্ত মোট বৃটিশ পুঁজির পরিমাণ প্রায় ৪০০ কোটী পাউণ্ড। অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে নিয়োজিত বৃটিশ পুঁজির প্রায় এক পঞ্চমাংশ ভারতবর্ষে খাটিতেছে।

সম্প্রতি বৃটিশ পণ্ডিতেরা ভারতে নিযুক্ত মূলধনের অনেক কম হিসাব দিয়াছেন (Financial Times)। তাহার কারণ, ভারতবর্ষে "India Ltd." নাম দিয়া অনেক বিদেশী প্রতিষ্ঠান আছে; সেগুলি সাধারণ লোকে দেশী

বলিয়া জানে, অথচ সেগুলিতে বৃটিশ মূলধন খাটিতেছে। ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, ১৯৩৫ সাল হইতে Reserve Bankএর মতো একটি কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও আমাদের দেশের বৈদেশিক মূলধনের কোন বিশ্বাসযোগ্য হিসাব পাওয়া যায় নাই। ভারতে বিদেশী মূলধনের সমস্যা এবং জাতীয় জীবনের উপর বিদেশী মূলধনের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তৎসত্ত্বেও, আজ পর্য্যন্ত বিদেশী মূলধনের সঠিক বিবরণ না পাওয়া সরকারের অমনোযোগিতাও অযোগ্যতার পরিচায়ক।

ভারতে এইরূপ কতকগুলি শিল্প বা বাণিজ্য রহিয়াছে, যে গুলিতে বৃটিশ এবং ভারতীয় মূলধন একত্রে খাটিতেছে—(Andrew Yule & Co., Titagarh Paper Mills প্রভৃতি)। আবার কতকগুলি India Ltd. নাম দিয়া কোম্পানী আছে, যেগুলির মূলধন সম্পূর্ণ অভারতীয়; যেমন Lever Bros, India Ltd.। এইসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে দৃষ্টি দিয়া ঠিক অভারতীয় মূলধন কতখানি, আর ভারতীয় মূলধন কতখানি তাহা নির্দ্ধারণ করা শক্ত। একমাত্র Resrve Bankএর যে সংগঠন ও শক্তি আছে, তাহার সাহায্যে সে এই সমস্ত হিসাব পাইতে পারে। বৈদেশিক মূলধন সম্পর্কিত আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য হইতেছে, কোন যোগ্য সংগঠন মারফৎ তাহার সঠিক পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা।

১৯২৪ সালে ভারত সরকার যে বিচারমূলক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেন তাহাতে অনেক ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের সহিত অভারতীয় প্রতিষ্ঠানও সংরক্ষণ করের সুবিধা পায়। ভারতীয় জনসাধারণ সংরক্ষণ কর বাবদ অন্ততঃ ৫০ কোটি টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। কিন্তু ইহার দরুণ প্রধানতঃ লাভ করিয়াছে ভারতস্থিত এই সব বিদেশী কোম্পানীগুলি। বৃহৎ বিদেশী কারখানাগুলি সংরক্ষণনীতির সুবিধা পাইবার জন্য ভারতে তাহাদের শাখা খুলিয়াছে, এবং তাহাদের প্রচুর মূলধন ও উন্নত ব্যবসায়-দক্ষতা লইয়া ক্ষুদ্র এবং শিশু ভারতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির বিঘ্ন স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে

বিদেশী প্রতিযোগীতার বিরুদ্ধে শিশু ভারতীয় শিল্পকে রক্ষা করার উদ্দেশ্য আসলে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

এইজন্য Bombay Industrial and Economic Enquiry Commssion মন্তব্য করেন "If it is the objective of our Industrial Policy to encourage the establishment of small concerns, then the objective is defeated, if these large foreign concerns are permitted to establish themselves without reasonable and effective limitations."

ভারতে বৈদেশিক মূলধনের উপযোগিতা সম্বন্ধে ঘোরতর মতভেদ আছে। শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রথমযুগে বৈদেশিক মূলধনের সাহায্যেই ভারতে শিল্পবিস্তার হইয়াছিল। সেই সময়ে ভারতে দেশীয় মূলধন ছিল না—যাহা ছিল তাহাও দেশীয় ধনিকেরা সাহস করিয়া শিল্পে নিয়োগ করিতেন না। বিদেশী শিল্পপতিরাই প্রথম ব্যবসায়ে সাফল্য অর্জন করিয়া দেশীয় ধনিকদের ভয় দূর করিয়াছিলেন। বৈদেশিক মূলধন নিয়োজিত হইবার ফলেই চা, পাট প্রভৃতি শিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে এবং পৃথিবীর বাজার দখল করিয়াছে। পাটকলের মালিকেরাই পৃথিবীর বাজারে পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিয়াছেন। খুব অল্প হইলেও বিদেশী কারখানাগুলি হইতেই ভারতীয়েরা শিল্পবাণিজ্যের শিক্ষা লাভ করিয়াছে। বিদেশী শিল্পপতিদের সফল ব্যবসায় এবং বিরাট লাভ দেখিয়া ভারতীয়রা শিল্প বাণিজ্যে অগ্রসর হইয়াছে। বৈদেশিক মূলধন হইতে এই সমস্ত উপকার যে আমরা পাইয়াছি তাহা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু লাভ অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি আমাদের হইয়াছে, ইহাই আমাদের অভিজ্ঞতা। প্রতিবৎসর মূলধনের মুনাফা হিসাবে ভারতবাসীর পরিশ্রম অর্জিত প্রচুর পরিমাণ অর্থ ভারতের বাহিরে চলিয়া যায়। এই বাড়তি উৎপাদন যদি ভারতের মধ্যেই থাকিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহা পুনর্নিয়োজিত হইয়া ভারতীয় শিল্পকারখানার বিস্তৃতি করিতে পারিত। তাহার উপরে, এই সব প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্র বিদেশে

থাকার জন্য তাহাদের দেয় আয়কর বিদেশে চলিয়া গিয়াছে এবং এদেশের সরকার একটি ন্যায্য আয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। বিদেশী মালিকেরা তাহাদের কারখানায় বিদেশী ডিরেক্টর, ম্যানেজার, প্রভৃতি উচ্চ কর্ম্মচারী নিয়োগ করিয়াছে, ভারতীয়দের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্ব করিয়াছে, ভারতীয়দের নিয়োগ করা বা ভারতীয়দের শিক্ষিত করার পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষতি হইতেছে যে, এই সমস্ত ধনী ব্যবসায়ীরা এখানে কাজ কারবার চালাইতে আসিয়া ভারতের রাজনীতির উপর প্রতিক্রিয়াশীল প্রভাব বিস্তার করিয়া ভারতীয়দের রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে। ইহা বরাবরই দেখা গিয়াছে যে, ভারতে বৃটিশ সরকারের শাসনতান্ত্রিক নীতি এই সমস্ত বৃটিশ পুঁজিপতিদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নির্দ্ধারিত হয়। সরকারের পরোক্ষ বাধা এবং বিদেশী মূলধনের প্রত্যক্ষ বাধা অতিক্রম করিয়া ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে। সমগ্রভাবে দেখিলে বিদেশী মূলধনের কুফলের দিকটাই অনেক বেশী। উহা হইতে যেটুকু উপকার আমরা পাইয়াছি, তাহা ঘটনাচক্রে পাইয়াছি।

এই সমস্ত কারণে ১৯২২ সাল হইতেই ভারতীয়রা বৈদেশিক মূলধনের বিরুদ্ধে মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছে এবং আন্দোলন চালাইতেছে। Fiscal Commissionএর মাইনরিটি রিপোর্টে প্রস্তাব করা হয় যে, সংরক্ষণ করের সুবিধা পাইতে হইলে বৈদেশিক মূলধনের মালিককে তিনটি সর্ত্ত মানিতে হইবে। (১) এই সমস্ত কোম্পানীকে ভারতে রেজেষ্ট্রি করিতে হইবে এবং টাকার অঙ্কে মূলধন রাখিতে হইবে; (২) ডিরেক্টর বোর্ডে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ভারতীয়কে লইতে হইবে; (৩) ভারতীয় শিক্ষানবীশদের শিক্ষিত করিয়া তুলিবার জন্য সুবিধা দিতে হইবে। ১৯২৫ সালে নিযুক্ত External Capital Committee এই সমস্ত সর্ত্ত আরোপের জন্য সুপারিশ করেন। দুঃখের বিষয় ১৯৩৫ এর শাসন সংস্কারে এই সমস্ত প্রস্তাবকে আইন করা হয় না এবং বৃটিশ মূলধনকে পূর্ব্বের মতই সুবিধা দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে বৈদেশিক মূলধন হইতে আমরা যে উপকারই পাইয়া থাকি, বর্ত্তমানে আমাদের দেশে প্রচুর মূলধন বাড়িয়া যাওয়ায় বৈদেশিক মূলধনের প্রয়োজন কমিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের সময়ে যে sterling পাওনা আমাদের সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা যদি পূর্ণভাবে ব্যবহার করিতে পারা যায়, তবে অনেক বিদেশী কলকারখানা আমরা হস্তান্তর করিয়া লইতে পারি। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি রাজ্যে তাহাদের পাওনা ষ্টার্লিং এর পরিবর্ত্তে সেখানকার বৃটীশ মূলধন এবং কারখানা কিনিয়া লওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় বৈদেশিক মূলধন আমাদের দেশে নিয়োজিত হইবার সম্পর্কে উপরি লিখিত তিনটি সর্ত্ত ছাড়াও আরও কতকগুলি সর্ত্ত আরোপ করিতে হইবে। যদি আমাদের দেশে পুনর্গঠন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য বিদেশী অর্থের প্রয়োজন হয়, তবে তাহা সরকার স্বাধীনভাবে ঋণ করিবে। কোন প্রকারেই মূলধনের মালিককে দেশের রাজনীতি ও অর্থনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে দেওয়া হইবে না। মূলধনের উপর নির্দ্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হইবে, এবং দেশবাসীর সাধারণ স্বার্থে যে সব প্রতিষ্ঠান (বিজলী, যানবাহন ইত্যাদি) সেইসব প্রতিষ্ঠানে মালিকদের কোনরূপ প্রভাব থাকিতে দেওয়া হইবে না। জাতীয় সরকার এইদিকে মনোযোগ দিবেন ইহা সকলে আশা করে।

পরিশেষে একটী সতর্কতা প্রয়োজন। বিদেশী ব্যবসায়ীরা এখন প্রত্যক্ষভাবে ভারতীয় জনগণকে শোষণ করিবার সুযোগ হারাইয়াছেন। তাই তাহারা বড় বড় ভারতীয় ব্যবসায়ীকে তাহাদের অংশীদার করিয়া লইয়া যৌথভাবে শোষণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন ও করিবেন। ভারতীয় শিল্পপতিদের বিলাতে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং সেখানে ভারতীয় ও বৃটিশ ধনিকদের সমস্বার্থ সম্বন্ধে সুন্দর সুন্দর বক্তৃতা করা হইয়াছে। ভয়ের কথা হইতেছে, ভারতীয় ধনিকেরা অনেকাংশে এই আহ্বানে সাড়া দিয়াছেন ও নূতনভাবে বৈদেশিক মূলধন ভারতে আসিবার সুযোগ করিয়া দিতেছেন।

এই বিপদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রথম প্রয়োজন, আমাদের সম্পূর্ণ ষ্টার্লিং পাওনা নির্দ্দিষ্ট দিনের মধ্যে আদায় করিয়া ভারতের পুনর্গঠন কার্য্যে নিযুক্ত করা। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয়দের সিন্ধুকের ভিতর এবং ভারতের মাটির তলায় সঞ্চিত যে প্রচুর সোনা আছে, তাহা বাহির করিয়া আনিয়া অর্থে রূপান্তরিত করা এবং শিল্প বাণিজ্যে দেশীয় মূলধন বাড়াইয়া দেওয়া। ইহার উপরেও যদি অর্থের প্রয়োজন হয়, তবে সরকার উপরিলিখিত সর্ত্তে বিদেশের নিকট ঋণ করিবে। বিদেশী ব্যবসায়ীদের এককভাবে প্রকাশ্যে বা ভারতীয় ধনিকদের সহযোগে অপ্রকাশ্যে ভারতীয় জনগণকে শোষণ করার অধিকার ১৫ই আগষ্টের পর আর দেওয়া যাইতে পারে না।

ভারতের জলসম্পদ ও তাহার ব্যবহার

মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহার ছাড়াও জলের দুইটী প্রধান অর্থনৈতিক কার্য্য আছে—কৃষিকার্য্য পরিচালনায় এবং বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনে। ভারতবর্ষ বিপুল জল সম্পদের অধিকারী। প্রচুর বৃষ্টিপাত, সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নর্ম্মদা, কাবেরী প্রভৃতি বৃহৎ নদনদী, অসংখ্য ছোট ছোট নদী, বিল, খাল, পুষ্করিণী, কূপ, নলকূপ এখানে রহিয়াছে। এই জলসম্পদ ভারতবর্ষে কিরূপে ব্যবহৃত হইতেছে, এবং কিরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে ও জনসাধারণের জীবনযাত্রায় কতখানি সাহায্য করিতেছে ও করিতে পারে—বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহাই আলোচনা করিব। সকল প্রকার জলই কৃষিকার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইতে পারে কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য গতিশীল জল বা বারিপ্রবাহ প্রয়োজন হয়। সাধারণতঃ যে সমস্ত নদী বা পার্ব্বত্য জলধারা উচ্চ হইতে

নামিতেছে তাহাকেই শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তাহা ব্যতীত বৃষ্টির জল কোন উচ্চস্থিত জলাধারে সঞ্চিত করিয়া, সারা বৎসর তাহাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে নিম্নে আসিতে দিয়াও শক্তি উৎপাদন করা যায়। আমরা প্রথমে কৃষিকার্য্যের কথা ও পরে শক্তি উৎপাদনের কথা আলোচনা করিব।

কৃষিপ্রধান দেশ আমাদের ভারতবর্ষ। তাই বৃষ্টিপাতের গুরুত্ব সহজেই বোঝা যায়। বৃষ্টির জলই এখানে কৃষির প্রধান অবলম্বন এবং কৃষির সফলতার উপর সমগ্র অর্থনৈতিক জীবনের বনিয়াদ গঠিত। বৃষ্টিপাত অতি অল্প, অতি অধিক অথবা অসময়ে হওয়ার জন্য যদি শস্যোৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে তাহা হইলে সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। কৃষিজাত দ্রব্য লইয়াই প্রধানতঃ ব্যবসা বাণিজ্য চলে ; তাই কৃষি নষ্ট হইলে, ব্যবসাবাণিজ্যও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, রেলওয়ের আয় কমিয়া যায়, এমন কী রাষ্ট্রের বাজেটে পর্য্যন্ত ঘাটতি ঘটে। এইজন্য কোন এক অর্থসচিব বলিয়াছিলেন ভারতীয় বাজেট হইতেছে "Gamble in rains"।

দেশের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টিপাতের অত্যন্ত বেশী তারতম্য আছে, এইজন্য সব প্রদেশের জন্য এক রকমের সেচ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী নহে। জল সম্পদের সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে সমগ্র দেশকে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যায়। (১) আসাম, পূর্ব্ব ও উত্তরবঙ্গ এবং পশ্চিম বঙ্গের কতক অংশ, পশ্চিম ঘাট, উত্তর বিহার এবং মাদ্রাজের অংশবিশেষ প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য্য থাকার জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রায় প্রয়োজন নাই। তবুও অনেক সময়ে এখানে অসময়ে বৃষ্টি হয়, বা অতিরিক্ত বৃষ্টি হয়—এই জন্য অতিরিক্ত জল সরবরাহ বা নিকাশ করিয়া দিবার জন্য খাল খনন করার প্রয়োজন হয়। (২) মাদ্রাজ, উত্তর পশ্চিম ভারত, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের অনিশ্চয়তার জন্য সেচ ব্যবস্থার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা আছে। (৩) পাঞ্জাব, রাজপুতানা, সিন্ধু প্রভৃতি শুষ্ক অঞ্চলে বৃষ্টির অত্যাল্পতার জন্য সেচ ব্যবস্থা না হইলেই নয়, জনসাধারণের জীবনধারণের আর কোন উপায় নাই।

নৈসর্গিক অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, অনিশ্চিত বৃষ্টি, অসময়ে বৃষ্টি প্রভৃতি সকল প্রকার বিপদের কবল হইতে কৃষিকে বাঁচাইবার জন্য ভারতবর্ষে সুসংগঠিত এবং ব্যাপক সেচব্যবস্থার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

সেচের গুরুত্ব পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা হইয়াছিল বলিয়া প্রাচীন ভারতে কূপ বা পুষ্করিণী খনন করা শুধু সামাজিক সম্মানের কার্য্য ছিল না, ধর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও গণ্য করা হইত। আমাদের দেশে বর্ত্তমানে যে লক্ষ লক্ষ কূপ বা পুষ্করিণী রহিয়াছে তাহার অধিকাংশই বৃটিশ আমলের পূর্ব্বে খনন করা হইয়াছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের আমলে সেচব্যবস্থা গড়িয়া তোলার জন্য কোন সুচিন্তিত বা সুসংগঠিত প্রচেষ্টা হয় নাই। বৎসরের পর বৎসর দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এবং অন্যান্য বিশেষজ্ঞেরা সেচ ব্যবস্থার কথা বারবার বলিয়াছেন, কিন্তু কাজ অতি অল্পই হইয়াছে। যে দেশে প্রায় একমাত্র পেশা কৃষি এবং কৃষির প্রধানতম অবলম্বন জল, যে দেশে "Irrigation is every thing and water is more valuable than land," সেই দেশে মাথা পিছু সেচের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে ৪ টাকার মত। রেলওয়ের সহিত তুলনায় সেচকার্য্যকে কিরূপে অবহেলা করা হইয়াছে তাহা একটি ঘটনা হইতে বোঝা যায়। ১৯৩৪-৩৫ সালে রেলওয়ের জন্য নিযুক্ত মোট মূলধনের পরিমাণ ছিল ৮৮৫ কোটি টাকা, আর সেচের জন্য ১৫০ কোটি টাকা।

ভারতে এ পর্য্যন্ত যত সেচ ব্যবস্থা হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া প্রয়োজন। কূপ এবং পুষ্করিণীর সংখ্যা জানা যায় না। তাহাদের অধিকাংশই বৃটিশ আমলের পূর্ব্বে এবং বৃটিশ আমলে গ্রাম্য ধনিকদের ব্যক্তিগত চেষ্টায় নির্ম্মিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে সেচের সাহায্যে মোট যে পরিমাণ ভূমিতে কৃষিকার্য্য হয়, তাহার এক চতুর্থাংশে পুষ্করিণী হইতে সেচ দেওয়া হয় .এবং শতকরা ১১ ভাগ অংশে কূপ হইতে সেচ দেওয়া হয়। সেচের খাল দুই প্রকারে নির্ম্মিত। কতকগুলিতে নদী হইতে সারা বৎসর জল পাওয়া যায়,

আর কতকগুলিতে বর্ষাকালের জল জলাধারে সঞ্চয় করিয়া সারা বৎসর ধরিয়া যোগান দেওয়া হয় (Storage Canal)। সিন্ধু এবং পাঞ্জাবে সিন্ধুনদ এবং শতদ্রু হইতে খাল খনন করিয়া সেচ ব্যবস্থা নির্মাণ করা হইয়াছে। সিন্ধুর সুক্কর বাঁধ, পাঞ্জাবের ঝেলাম নদীর বাঁধ, দাক্ষিণাত্যে কাবেরী নদীর বাঁধ, এবং যুক্তপ্রদেশে ও বিহারের বৃহৎ সেচ ব্যবস্থাগুলি উল্লেখযোগ্য। Storage Canal প্রধানতঃ মাদ্রাজে, দাক্ষিণাত্যে, মধ্যপ্রদেশে এবং বুন্দেলখণ্ডে অবস্থিত। বাংলাদেশে দামোদর হইতে খাল খনন করা সম্প্রতি হইয়াছে এবং যুক্তপ্রদেশে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে নলকূপ হইতে জল তুলিয়া সেচ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ভারতবর্ষে মোট ২১'৩ কোটি একর কর্ষিত ভূমির মধ্যে ২'৬ কোটি একর ভূমিতে খাল খনন করিয়া তাহা হইতে সেচ দেওয়া হয়। ইহার উপর প্রায় ২ কোটি একর জমিতে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি হইতে সেচ দেওয়া হইয়া থাকে এবং অবশিষ্ট প্রায় ১৬ কোটি একর জমির কৃষিকার্যের জন্য ভারতীয় কৃষককে আকাশের দিকে চাহিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করিতে হয়।

বিভিন্ন জেলা এবং প্রদেশের স্থানীয় অভাব স্থানীয় ভাবে মিটাইবার জন্য বিভিন্ন প্রকারের সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। অর্থকরী ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য, গবাদি পশুর খাদ্য উৎপাদনের জন্য দেশের সর্বত্র সেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। বর্তমানে যখন সমগ্র পৃথিবীতে সকল প্রকার খাদ্যাভাব এত তীব্র, তখন আমাদের দেশের কৃষিকার্যকে এখনকার মত অবহেলা করা মারাত্মক হইবে। ভারতের কৃষক এত দুরবস্থাপন্ন যে সামান্য কূপ খনন করার সামর্থ্যও নাই। অথচ প্রচুর বৃষ্টিপাত এবং নদীবহুল দেশ হওয়ার জন্য অন্যান্য দেশের তুলনায় এখানে সেচ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সহজ। অতএব সরকারকে এই কার্যে অগ্রসর হইতে হইবে। গঙ্গা, সিন্ধু, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি যে সমস্ত নদী দিয়া প্রতি বৎসর অজস্র জল সমুদ্রে পড়িয়া অপচয় হইতেছে, সেই সব নদী হইতে বৃহৎ বৃহৎ খাল খনন করিতে হইবে। যে সমস্ত স্থল শুষ্ক বা যেখানে বারিপাত

অল্প, সেইসব স্থলে খাল খনন করিয়া দূর হইতে জল আনিতে হইবে এবং নলকূপ বসাইতে হইবে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে বর্ষাকালের জল সঞ্চিত করিয়া সারা বৎসর খালের মধ্য দিয়া 'ক্ষেত্রে যোগান দিতে হইবে। যে সব স্থলে বারিপাত অত্যধিক, সেই সব স্থলে বাঁধ বাঁধিয়া এবং খাল খনন করিয়া অতিরিক্ত জল বাহির করিয়া দিতে হইবে। সমস্ত কিছুর জন্য প্রয়োজন একটি সুচিন্তিত এবং ব্যাপক কৃষি ও সেচ পরিকল্পনা—যাহার সাহায্যে দেশের সর্ব্বত্র জলসম্পদকে খাদ্য এবং অন্যান্য ফসল উৎপাদনে ব্যবহার করা যায়।

জলসম্পদের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হইতেছে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎস হিসাবে। ভারতের অন্যান্য শক্তি সম্পদ প্রয়োজনের তুলনায় কম। কয়লার উৎপাদন দুই একটি অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এবং দেশের চাহিদা অনুযায়ী শিল্প বিস্তার হইলে কয়লার পরিমাণ কমই হইবে। ভবিষ্যতে কয়লা ফুরাইয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে; তাই কয়লা বাঁচাইয়া অন্যান্য শক্তির সন্ধান আবশ্যক। কাষ্ঠ এখনও পর্য্যাপ্ত প্রচুর থাকিলেও, ভবিষ্যতে নানাবিধ কার্য্যের জন্য কাষ্ঠের চাহিদা অত্যন্ত বাড়িবে, এবং শক্তি উৎপাদনের জন্য কাষ্ঠ ব্যবহার সমুচিত হইবে না। পেট্রোল এবং অন্যান্য তৈল আমাদের দেশে অত্যন্ত কম। সুরাসার (spirit) উৎপাদন এখনও ব্যাপকভাবে আরম্ভ হয় নাই। কিন্তু আমরা প্রচুর জল-শক্তির অধিকারী এবং কাষ্ঠ কয়লা, পেট্রোলের মত ইহা ব্যবহার করিলে ফুরাইয়া যাইবে না। এই বিরাট জলশক্তি ব্যবহার করিয়া আমরা এত বেশী বৈদ্যুতিক শক্তি পাইতে পারি যে, সমগ্র দেশে অত্যন্ত সহজে ও সস্তায় বিদ্যুৎ-চালিত কারখানা প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

সমগ্র পৃথিবীতে জলশক্তির পরিমাণ ৫০ কোটি অশ্বশক্তি ইহার মধ্যে বেলজিয়ান্ কঙ্গোতে ৯ কোটি অশ্বশক্তি, যুক্তরাষ্ট্রে ৮ কোটি এবং ভারতবর্ষে ২·৭ কোটি অশ্বশক্তি রহিয়াছে। কিন্তু এই বিপুল জলশক্তির অতি অল্পাংশই এখন ব্যবহৃত হয়। বর্ত্তমানে ভারতে যে সমস্ত জল বিদ্যুৎকেন্দ্র আছে তাহার মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য। বম্বে প্রদেশের তিনটি টাটা হাইড্রো-ইলেট্রিক

ওয়ার্কস্ বোম্বাই সহরে এবং তত্রত্য বস্ত্রশিল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিয়া থাকে; ইহাদের উৎপাদন ক্ষমতা হইতেছে ২.৫ লক্ষ অশ্বশক্তি। কোলার স্বর্ণখনি অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ১.২ লক্ষ অশ্বশক্তি সম্পন্ন পাইকারা ওয়ার্কস্, কাবেরী নদীর তীরে শিবসমুদ্রম্ ওয়ার্কস্, পাঞ্জাবের মাণ্ডি পরিকল্পনা ত্রিবাংকুরের ৬ হাজার কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন পল্লীবাসল পরিকল্পনার নাম করা যাইতে পারে। কাশ্মীরের তিনটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ২০,০০০ অশ্বশক্তি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়; যুক্তপ্রদেশে গঙ্গার উপরি অংশ হইতে যে সেচ ব্যবস্থা আছে, তাহা হইতে ৪৮০০০ অশ্বশক্তি পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়; এবং যুক্তপ্রদেশের ৯৩টি সহরে শক্তি সরবরাহ হইয়া থাকে। ইহা ব্যতীত মাদ্রাজের মেতুর কেন্দ্র, পাপনাশম্ কেন্দ্র এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র বৃহৎ জলবিদ্যুৎকেন্দ্র রহিয়াছে। সর্ব্বশুদ্ধ মিলাইয়া ভারতবর্ষে মোট ৮ লক্ষ অশ্বশক্তি পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। অর্থাৎ আমাদের মোট ২.৭ কোটী অশ্বশক্তি পরিমাণ জলশক্তির মধ্যে ৮ লক্ষ অশ্বশক্তি আহৃত হয় এবং শতকরা ৯৭ ভাগ অপচয় হয়। ১৯১৮ সালে নিযুক্ত Meares Commissionএর রিপোর্টে দেখা যায় যে জলশক্তির সাহায্যে খুব সহজে ভারতে ৫৫ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব, কিন্তু তখন মাত্র ৫৯ হাজার কিলোওয়াট উৎপন্ন হইত। এখনও পর্য্যন্ত ভারতে সব শিল্পগুলিতে ১০ লক্ষ অশ্বশক্তি পরিমাণ শক্তি ব্যয় হয়; কিন্তু ইহার মধ্যে তৈল, ষ্টিম, জল হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির পরিমাণ মাত্র ২.৮৫ লক্ষ অশ্বশক্তি।

সুলভ বৈদ্যুতিক শক্তির অভাব আমাদের শিল্পের অনগ্রসরতার একটী কারণ। কয়লা দেশের সর্ব্বত্র উৎপন্ন হয় না এবং কয়লাজাত শক্তি ও মহার্ঘ; কিন্তু বৈদ্যুতিক শক্তি সকল প্রদেশেই উৎপন্ন করিয়া সমস্ত অঞ্চলে লইয়া যাওয়া যায়। বিদ্যুতের অভাবে আমাদের শিল্পগুলি কতকগুলি প্রধান সহর এবং শিল্প অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত। জলশক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করিয়া ক্ষুদ্র সহর এবং গ্রামে পর্য্যন্ত সহজে শিল্প বিস্তার করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে আমরা শক্তির

ব্যবহারে কত পিছাইয়া আছি তাহা বোঝা যাইবে। ক্যানাডায় মাথা পিছু বৎসরে ২০০০ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার হয়, মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১০০ ইউনিট, মেক্সিকোর মত দেশেও ১২০ ইউনিট, কিন্তু ভারতবর্ষে ৭ ইউনিট মাত্র।

শিল্পবিস্তারের জন্য বিদ্যুতের কত বেশী প্রয়োজন তাহা সকলের জানা আছে। সুইডেনে জল-বিদ্যুৎ-পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিবার ফলে বর্ত্তমানে বিদেশী কয়লার প্রয়োজন প্রায় হয় না। সোভিয়েট রাশিয়ায়.১০ বৎসরের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন সাত গুণ বাড়াইয়া কী অভূতপূর্ব্ব শিল্পোন্নতি হইয়াছে তাহা বিস্ময়ের বস্তু। একথা বলা যায়, সেখানকার নবীন সমাজতান্ত্রিক সভ্যতার মূল ভিত্তি যেমন মার্ক্সীয় দর্শন, তেমনই বৈদ্যুতিক শক্তি। আমাদের দেশেও বিদ্যুতের প্রয়োজন এবং উপযোগিতা সমানভাবে রহিয়াছে। শিল্পপ্রসারের কথা বাদ দিলেও, গৃহস্থালীর ব্যবহারের জন্য আমাদের বিদেশী কেরোসিনের উপর প্রচুর নির্ভর করিতে হয়। তাহা ব্যতীত, Agricultural কমিশন কৃষিকার্য্যের জন্য বৈদ্যুতিক শক্তির দুইটি প্রধান প্রয়োজন দেখাইয়াছেন। সেচ কার্য্যের জন্য জল পাম্প করিয়া তুলিবার এবং বাতাস হইতে কৃত্রিম নাইট্রোজেন সংগ্রহের ব্যাপারে বিদ্যুতের প্রয়োজন।

এত প্রয়োজনীয় এবং সম্ভাবনাপূর্ণ যে বৈদ্যুতিক শক্তি, তাহা আমরা অনায়াসে পাইতে পারি আমাদের সুবিশাল জলশক্তিকে ব্যবহার করিয়া। Hydro Electric Survey of India Commission মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ৩০ লক্ষ অশ্বশক্তি পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি অনায়াসে এখনি ভারতে উৎপন্ন হইতে পারে। নিকট ভবিষ্যতে অনেকগুলি পরিকল্পনা কাযাকরী হইবার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। হায়দ্রাবাদের ১১টি পরিকল্পনা, বাংলার দামোদর পরিকল্পনা, কাশ্মীরের পরিকল্পনাগুলি কার্য্যকরী হইলে এইসব অঞ্চলের কৃষি এবং শিল্প উভয়ই বিদ্যুতের ব্যবহার করিতে পারিবে এবং সমস্ত গ্রামে বিজলী বাতি জ্বলিবে। এখনো পর্য্যন্ত আমাদের দেশে যে সকল জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর উদ্যোগে এবং লাভের

জন্য। এইজন্যসকল ক্ষেত্রেই উৎপাদনের উপযোগিতার দিকে দৃষ্টি না দিয়া লাভের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে এবং ফলে যে বিস্তৃতি হওয়া সম্ভব এবং প্রয়োজন ছিল তাহার অল্পই হইয়াছে। এইরূপ একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইতে হইবে।

পূর্ব্বে আমরা কৃষিকার্য্যের জন্য সেচ ব্যবস্থার কথা বলিয়াছি, এক্ষণে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের কথা বলা হইল। এই উভয় কার্য্য একই জল-সম্পদকে ব্যবহার করিয়া একই পরিকল্পনার মধ্য দিয়া হইতে পারে। গতিশীল বারিপ্রবাহের 'গতি' প্রয়োজন শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং 'জল' প্রয়োজন সেচের জন্য। অতএব ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার উপর নির্ভর না করিয়া রাষ্ট্র যদি অগ্রণী হন, ব্যাপক এবং সুনিয়ন্ত্রিত পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, তবে শিল্পের প্রসার, কৃষির উন্নতি এবং গ্রাম্য সংস্কার একত্রে হইতে পারে। বিশেষ করিয়া, কুটির শিল্পে বিদ্যুৎ ব্যবহারের উপযোগিতা অত্যন্ত বেশী, এবং গ্রাম্য জীবনযাত্রায় ইহার ব্যবহার আমূল পরিবর্ত্তন আনিয়া দিবে। বৎসরের পর বৎসর বিপুল জলরাশি আকাশ হইতে পড়িয়া, পাহাড় হইতে নামিয়া সমুদ্রে গিয়া অপচয় হইতেছে। কিন্তু ইহার মধ্যে এই ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন গুপ্তধন রহিয়াছে জানিয়াও যদি আমরা ইহার সম্যক্ ব্যবহার না করিতে পারি, তবে আমাদের সমস্ত যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনা কথার কথাই থাকিয়া যাইবে।

ভারতের ষ্টার্লিং সঞ্চয়

ভারতে শিল্প প্রসারের পথে বহুদিনের বড় বাধা হইতেছে দেশে মূলধনের অভাব। কিন্তু যুদ্ধের পরে এই সমস্যা অনেক অংশে নূতন রূপ ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধপূর্ব্ব যুগে বৃটেনের নিকট ভারতের ঋণ ছিল ৪০০ কোটি টাকা। যুদ্ধের মধ্য দিয়া বৃটেনের নিকট ভারতের যে ষ্টার্লিং পাওনা

সঞ্চিত হইয়াছে তাহার সাহায্যে এই ৪০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ শোধ হইয়া গিয়াছে, উপরন্তু বৃটেনের নিকট ভারতের ১৬০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা হইয়াছে। এই বিপুল ষ্টার্লিং সম্পদ প্রধানতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডে সঞ্চিত আছে। অবশ্য অল্প পরিমাণ ষ্টার্লিং ভারতীয় কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক এবং ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর নামেও রহিয়াছে।

ভারতের মত দরিদ্রদেশ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ বৃটেনকে ঋণ দিল কিরূপে? উত্তরে বলা প্রয়োজন ভারত বৃটেনকে স্বেচ্ছায় এই ঋণ দেয় নাই, বৃটেন ভারতের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছে, এবং ভারত বৃটেনের অধীন দেশ বলিয়া বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া এই ঋণ গ্রহণ বৃটেনের পক্ষে সহজ হইয়াছে। প্রধানতঃ তিনটি উপায়ে এই ষ্টার্লিং পাওনা সঞ্চিত হইয়াছে। প্রথমতঃ যুদ্ধের প্রয়োজনে বৃটেনকে ভারত হইতে বহুবিধ দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে হইয়াছিল। এই সমস্ত পণ্যের মূল্য বৃটেন ভারতকে নগদ টাকা দিয়া শোধ করিয়া দেয় নাই। ভারতীয় বিক্রেতাদের মূল্য পরিশোধ করিয়াছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নূতন নোট ছাপাইয়া, আর তাহার পরিবর্ত্তে বৃটেনের ব্যাঙ্ক অব্ ইংল্যাণ্ডে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নামে ষ্টার্লিং জামিন সঞ্চিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, বৃটিশ সরকার প্রাচ্যে যুদ্ধের জন্য ভারতে বহুসংখ্যক সৈন্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত সৈন্যের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসগৃহ, যুদ্ধসরঞ্জাম প্রভৃতি যাবতীয় সামগ্রী ভারতকে যোগান দিতে হইয়াছিল। ভারতের জনসাধারণ নিজেরা অনাহারে থাকিয়া বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইয়া এই সমস্ত পণ্য সম্ভার বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে বিক্রয় করিয়াছিল, কিন্তু বৃটিশ সরকার ইহার পরিবর্ত্তে ভারতকে নগদ মূল্য দেয় নাই। ইহাদের মূল্যও ষ্টার্লিং ঋণপত্রে পরিশোধ করা হইয়াছে। তৃতীয়তঃ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য যে সৈন্যবাহিনী ভারতের মধ্যে রাখিয়াছিল তাহার ভরণপোষণের জন্যও ভারত হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হইল। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ইহার পরিবর্ত্তে নগদ ডলার দিয়াছেন; কিন্তু বৃটিশ সরকার মার্কিনের দেওয়া মূল্যের

অধিকাংশ নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করিয়া, তাহার পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ ষ্টার্লিং ভারতের নামে জমা করিয়া যান। এইভাবে যুদ্ধের প্রথম বৎসর হইতেই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের ষ্টার্লিং পাওনা সঞ্চিত হইতে থাকে। ১৯৩৮-৩৯ সালে রিজার্ভ ব্যাংকের ষ্টার্লিং সঞ্চয় ছিল ৭১ কোটি টাকা। ইহার পরিমাণ ১৯৪২-৪৩ সালে ৩৯৪ কোটি টাকা হইয়া যায় এবং ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বরে ইহার পরিমাণ হয় ১৫০০ কোটি টাকা। ইতিমধ্যে আরও একটি ঘটনা ঘটে। যুদ্ধ পূর্ব্ব যুগে বৃটেনের নিকট ভারতের যে ৪০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং ঋণ ছিল, তাহা ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিংএর সাহায্যে শোধ হইয়া যায়। এইভাবে ভারতে যখন খাদ্য বস্ত্রের অভাব চরম, সেই সময় ভারতকে তাহার বহুপূর্ব্বে গৃহীত ঋণ শোধ করিয়া আবার নূতনভাবে ১৬০০ কোটি টাকার ঋণ দিতে বাধ্য করা হয়।

এই কার্য্যের জন্য বৃটিশ সরকার একটি অত্যন্ত সুন্দর কৌশল অবলম্বন করেন। Reserve Bankএর গঠনতন্ত্রের ৩৩(২)নং ধারাতে আছে, যে মোট প্রকাশিত নোটের শতকরা ৪০ ভাগের জন্য স্বর্ণ, রৌপ্য এবং ষ্টার্লি জামিন রাখিতে হইবে। আইনজ্ঞ ইংরেজ এই আইনটি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন, কিন্তু আইনের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়া দেন। রিজার্ভ ব্যাংকের প্রকাশিত নোটের পরিমাণ ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১৭৮ কোটি টাকা হইতে ১২৩৭ কোটি টাকাতে আসিয়া দাড়ায়। কিন্তু ইহার জন্য যে স্বর্ণ জামিন থাকে তাহার পরিমাণ একটুও বৃদ্ধি পায় নাই, কিন্তু ষ্টার্লিং জামিনের পরিমাণ ৬৭ কোটি টাকা হইতে ১১৩৫ কোটি টাকা হইয়া যায়। ৪০% বাধ্যতামূলক জামিন রাখার আসল উদ্দেশ্য হইতেছে মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ করা; কিন্তু এইরূপে বেপরোয়া ভাবে ষ্টার্লিং জামিন সৃষ্টি করিয়া মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ করা হইয়াছে, মুদ্রাস্ফীতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভারতের নিকট বলপূর্ব্বক ঋণ গ্রহণে রিজার্ভ ব্যাংকের যন্ত্রটিকে অসঙ্কোচে ব্যবহার করা হইয়াছে।

এই যে বিপুল ষ্টার্লিং সঞ্চয়—যুদ্ধের সময়ে ভারতের দুর্ব্বল অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার উপর ইহার ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া দৃষ্ট হয়। পাঁচ বৎসরে ভারত হইতে বিদেশীরা ২০০০ কোটি টাকার অধিক দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, ভারতীয় জনসাধারণ এই বিপুল দ্রব্য সম্ভারের ব্যবহার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। অথচ তাহার পরিবর্ত্তে তাহারা অন্যান্য পণ্যম্ভার পায় নাই, স্বর্ণ পায় নাই, পাইয়াছে কাগজে ছাপা নোট, ভবিষ্যতের অনিশ্চিত প্রতিশ্রুতি। ফলে ভারতে মুদ্রাস্ফীতি অসম্ভব বৃদ্ধি পাইয়াছে, নিত্যব্যবহার্য্য দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে, মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াছে, ব্যাপক দুর্ভিক্ষে ৩৫ লক্ষ লোক মারা গিয়াছে, দেশে চোরাকারবার অতিমুনাফাবৃত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং নির্দ্দিষ্ট আয়-সম্পন্ন ব্যক্তির হাত হইতে খাদ্য বস্ত্র মুনাফাশিকারীর কবলে চলিয়া গিয়াছে। এইখানে প্রশ্ন হইতে পারে, আমরা যদি দ্রব্যের পরিবর্ত্তে স্বর্ণ পাইতাম, তাহা হইলেও তো আমাদের অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইত; অতএব লাভ কি হইত? প্রথম কথা নগদ স্বর্ণ দিতে হইবে জানিলে বৃটিশ সরকার বেপরোয়াভাবে ব্যয় করিতেন না, এবং ভারত হইতে এত অধিক পরিমাণ দ্রব্য চলিয়া যাইত না। দ্বিতীয়তঃ স্বর্ণ পাইলে ভারত অন্যান্য দেশ হইতে পণ্যসম্ভার আমদানী করিতে পারিত, এবং তাহাতে জনসাধারণের দুর্দ্দশা লাঘব হইত। তৃতীয়তঃ অন্যান্য দেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া যুদ্ধ যুগে এবং বিশেষ করিয়া যুদ্ধোত্তর যুগে আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা আমরা বহুগুণ বৃদ্ধি করিতে পারিতাম।

বৃটেন যদি ভারতের নিকট এই ঋণ গ্রহণ করিতে না পারিত, তাহার দেশেই ঋণ করিতে অথবা মুদ্রাস্ফীতি করিতে হইত, ভারতে যে মুদ্রাস্ফীতি হইয়াছে, তাহা ভারতে না হইয়া বৃটেনে হইত। মূল্য বৃদ্ধির জন্য বৃটিশ জনগণকে যে দুর্ভোগ ভুগিতে হইত, তাহাই ষ্টার্লিং সঞ্চয় এবং মূল্যবৃদ্ধির মধ্য দিয়া ভারতীয়দের উপর কৌশলে চাপানো হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে, ভারত সরকারের বাজেটের উপর ইহার কুফল দেখা

দিয়াছে। বিরাট যুদ্ধের ব্যয়ভার বহন করিতে যাইয়া ভারত সরকারকে উপর্য্যুপরি বাজেটের ঘাটতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। জনসাধারণের উপর ক্রমবর্দ্ধমান করভার চাপাইয়া, প্রচুর ঋণপত্র বিক্রয় করিয়া এই ঘাটতিপূরণ করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে এই সমস্ত ঋণপত্রের উপর ভারত সরকারকে শতকরা ৩৲ টাকা হারে সুদ দিতে হইতেছে; কিন্তু ভারতের সঞ্চিত ষ্টার্লিং-এর জন্য ভারত পাইতেছে মাত্র ১% হারে সুদ। সম্পূর্ণ অকারণে ভারত সরকারকে বিপুল লোকসান সহ্য করিতে হইতেছে।

ষ্টার্লিং সঞ্চয় ফেরৎ পাওয়ার ব্যাপারে প্রথমে মনে রাখা দরকার যে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়মাবলী যদি অপরিবর্ত্তিত থাকে, তাহা হইলে এই ষ্টার্লিং সমগ্রভাবে আমরা পাইতে পারি না; কিয়ৎ অংশ প্রকাশিত নোটের জামিন হিসাবেই রাখিয়া দিতে হইবে। যদি মুদ্রাসংকোচন করিয়া নোটের পরিমাণ কমানো হয়, অথবা শতকরা ৪০% জামিন রাখার নিয়ম পরিবর্ত্তন করা হয়, তবেই সমস্ত ষ্টার্লিং পাওনা আমরা ফেরত লইবার কথা চিন্তা করিতে পারি। কিন্তু এইখানেই একটি কথা আছে। আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং-এর অঙ্কে নির্দ্দিষ্ট। বৃটেনে যদি মূল্যস্তর বৃদ্ধি পায় ষ্টার্লিং ফেরত পাওয়া সত্ত্বেও, পণ্যের অঙ্কে আমাদের লোকসান হইবে। পাওনা আদায় করার ব্যাপারে যত বিলম্ব হইবে আমাদের লোকসানের আশঙ্কা তত বেশী। অতএব আমাদের স্বার্থ হইতেছে যত শীঘ্র সম্ভব এই পাওনা বুঝিয়া লওয়া।

ষ্টার্লিং ঋণ শোধ দেওয়ার ব্যাপারে বৃটেনে বেশ বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা যাইতেছে। টোরী প্রভাবান্বিত সংবাদপত্রগুলি ষ্টার্লিং ঋণ কমাইবার জন্য বহু আন্দোলন করিয়াছে। তাহাদের একটা যুক্তি হইতেছে, যে ভারতে যুদ্ধ ব্যয় অত্যন্ত বেশী হইয়াছে। অতএব তাহার জন্য সমস্ত ভার বৃটেন বহন করিবে না। এই যুক্তির মধ্যে যে অসাধুতা আছে, তাহা সহজেই লক্ষণীয়। ভারতে যুদ্ধ-ব্যয় কেন বেশী হয়? তাহার একটি মাত্র কারণ এই যে যুদ্ধের সংকট মুহূর্ত্তেও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ভারতকে সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে বাঁধিয়া

রাখার চেষ্টা করিয়াছিল। যুদ্ধ পরিচালনার জন্য নিজেদের কায়দায় অক্ষম আমলা এবং অসাধু কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করিয়াছে। ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় সমান অংশীদার হিসাবে আত্মরক্ষার দায়িত্ব লইতে প্রস্তুত ছিলেন; কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তাঁহাদের কারারুদ্ধ করিয়াছিল।

স্বর্গীয় Lord Keynes খুব নিরপেক্ষভাবে ষ্টার্লিং সঞ্চয় হ্রাস করিবার স্বপক্ষে যুক্তি দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে ষ্টার্লিং ব্যালান্স কমাইয়া না দিলে, ভারতে মুদ্রাস্ফীতি স্থায়ী হইবে, এবং মূল্যস্তর বৃদ্ধি পাইয়া জনসাধারণের দুঃখদুর্দ্দশা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। তাঁহার মত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত নিশ্চয়ই জানিতেন যে ভারতের দুঃখদুর্দ্দশা শুধু অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য নহে, পণ্যের অভাবই ইহার মূল কারণ, এবং ষ্টার্লিং পাওনা সমগ্রভাবে পাইলে আমরা আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া এই অভাব দূর করিতে পারি। কিন্তু অসুবিধা এই যে অর্থনৈতিক সমস্যায় কেহই নিরপেক্ষ হইতে পারে না, Keynes ও নিরপেক্ষ ছিলেন না।

বৃটিশ সংবাদপত্রের এই সমস্ত আন্দোলনে বৃটিশ সরকারও আমাদের ন্যায্য পাওনা হইতে আমাদের বঞ্চিত করিবার মনোভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃটেনের অর্থসচিব Dr. Daltonএর ১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখের এবং অন্যান্য বক্তৃতার মধ্যে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিমধ্যে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটিয়াছে। ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বরে বৃটেন আমেরিকার নিকট ১৪০০ কোটি টাকার ঋণ গ্রহণ করে। এই ঋণদান ব্যাপারে আমেরিকা কতকগুলি সর্ত্ত আরোপ করে। একটি সর্ত্ত ভারতের পাওনা ষ্টার্লিং সম্বন্ধে। চুক্তি অনুযায়ী সমগ্র ষ্টার্লিং পাওনাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। একভাগ ১৯৫১ সালের মধ্যে পরিশোধ করিয়া দিতে হইবে। এক ভাগ ১৯৫১ হইতে ১৯৬০ পর্য্যন্ত দশ কিস্তীতে শেষ করিতে হইবে; অবশিষ্টের জন্য ভারতের সহিত পরামর্শ করিয়া কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। একথা সত্য আমেরিকার আরোপিত সর্ত্ত ষ্টার্লিং

পরিশোধ ব্যাপারে বৃটেনকে সক্রিয় করিয়াছে, (আমেরিকা ইহা ভারতের সহিত নিজের ব্যবসা প্রসারের স্বার্থে করিয়াছে) কিন্তু তৃতীয় সর্ত্তটিতে বৃটেনকে পাওনার একাংশ বাতিল করিয়া দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে। সৌভাগ্যের কথা সমস্ত পাওনা বুঝিয়া লওয়ার ব্যাপারে ভারতে অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারও এই বিষয়ে বেশ দৃঢ় মনোভাব দেখাইয়াছেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের অর্থ-সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খান্ এই বিষয়ে বেশ দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন—ইঙ্গ মার্কিন চুক্তিতে ভারত অংশীদার ছিল না, এবং সেই চুক্তি মানিতে ভারত বাধ্য নহে।

সম্ভবতঃ, ইঙ্গ মার্কিন চুক্তির ফলেই বৃটেনের একটি প্রতিনিধিদল সার উইল ফ্রিড্ ইভির নেতৃত্বে ভারতে আসিয়া কথাবার্ত্তা বলিয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানে তাহাদের একটি বড় যুক্তি হইতেছে যে বৃটেনের এখন খুব দুরবস্থা, অর্থনৈতিক সংকট সম্মুখে, অতএব পরিশোধ করার ক্ষমতা তাহাদের নাই। এই নৈতিক চাপের পিছনে কোন নীতি আছে কিনা আমাদের বিচার করা দরকার। একথা সত্য যে বৃটেনের অর্থনৈতিক অবস্থা এখন শোচনীয়; তবুও অধ্যাপক Shenoyএর মতে এখনও ভারত বৃটেনের নিকট সমগ্রভাবে অধমর্ণ দেশই রহিয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিল্পে যুক্ত বৃটিশ মূলধন বর্ত্তমান মূল্যান্তরে হিসাব করিয়া, ভারত সরকারের বিক্রীত যে সমস্ত ঋণপত্র বৈদেশিকগণ ক্রয় করিয়াছেন—সমস্ত একসঙ্গে ধরিয়া ভারতের বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ২২৭½ কোটি পাউণ্ড (৩৪০০ কোটি টাকার মত) হইবে। অর্থাৎ ১৬০০ কোটি টাকার ষ্টার্লিং পাওনা পূর্ণ আদায় করিলেও ভারতের বিপুল ঋণভার থাকিয়া যাইবে। অতএব বৃটেনের দুরবস্থার জন্য নহে, বৃটেন তাহার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ বজায় রাখিতে চাহে বলিয়াই বর্ত্তমানে তাহার এই পাওনা শোধ দিতে অসুবিধা হইতেছে।

এই সমস্ত সত্ত্বেও, অক্ষমতার নৈতিক চাপ দিয়া ষ্টার্লিং পাওনার বিরাট অংশকে অবরুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা বৃটেন করিতেছে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই

আগষ্ট তারিখে ভারত ও বৃটিশ সরকার ষ্টার্লিং ব্যালান্স সংক্রান্ত একটী চুক্তি নিষ্পন্ন করিয়াছেন। এই চুক্তি অনুযায়ী বর্ত্তমানে ভারতের মোট পাওনা ১৫৪৬ কোটি টাকা ধরা হইয়াছে, ইহার মধ্যে ৪৬ কোটি টাকা বৃটেন এখনই শোধ করিয়া দিবে। ইহা ছাড়া ৪০ কোটি টাকা Working Balance হিসাবে রাখা হইবে; আমাদের জরুরী প্রয়োজন হইলে ইহা হইতে আমরা ব্যয় করিতে পারি। অবশিষ্ট ১৪৬০ কোটি টাকা ১৯৪৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ইংলণ্ডে অবরুদ্ধ থাকিবে। বলা বাহুল্য এই চুক্তি ভারতবাসীকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। আমাদের জরাজীর্ণ রেলওয়ে, বস্ত্রশিল্প, পাটশিল্প পুনর্গঠনের জন্য অনেক যন্ত্রপাতি চাই; দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমাদের কমপক্ষে ১০০ কোটি টাকার খাদ্য বিদেশ হইতে আমদানী করা চাই। যদি আমাদের সঞ্চিত ষ্টার্লিং সম্পূর্ণ ফিরিয়া না পাই তবে এই সমস্ত আমদানী আমরা করিব কোথা হইতে, কিরূপে ?

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতীয় সরকারী মহল হইতে ষ্টার্লিং পাওনা আদায় করা ব্যাপারে একটি মোটামুটি গ্রহণযোগ্য খসড়া প্রস্তুত করা হইয়াছিল। এই খসড়ায় ১৬৬০ কোটি টাকাকে ৮৫০ কোটি এবং ৭৫০ কোটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়। দ্বিতীয় ভাগ ১৯৫১ সাল হইতে ১৯৬০ সালের মধ্যে বিভিন্ন কিস্তীতে পরিশোধ্য। প্রথম ভাগ অবিলম্বে শোধ করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে আমরা যন্ত্রাদি, ভোগ্য পণ্য, বৃটিশ শিল্প বানিজ্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ক্রয় করিতে পারি। এইরূপ পরিকল্পনা করিয়াও কেন ভারত সরকার ১৫ই আগষ্টের অকিঞ্চিৎকর সর্ত্তে সম্মত হইল তাহা বিস্ময়কর বস্তু। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সাম্রাজ্যিক স্বার্থ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত থাকিলে বৃটেনের সংকট এত কিছু তীব্র নহে; আর সাম্রাজ্যের স্বার্থ বজায় রাখিয়া এই সংকট কাটাইয়া উঠিব এই মনোভাব থাকিলে বৃটেনকে সহানুভূতি করিবার কোন প্রয়োজন নাই।

প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটেনের নিকট ভারতের অনেক অর্থ পাওনা হইয়া-

ছিল। বৃটেন টাকা এবং পাউণ্ডের বিনিময় হার কৌশলে পরিবর্ত্তন করিয়া সেই পাওনা হইতে ভারতকে বঞ্চিত করিয়াছিল। এইবারও অনুরূপ কোন কৌশল সে অবলম্বন করিতে পারে। বিশেষতঃ একটি দেশ এখন দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। সমস্ত পাওনার কত অংশ পাকিস্তানে আর কত অংশ ভারতীয় ইউনিয়নে যাইবে—এই অজুহাতে আবার ফাঁকি দিবার চেষ্টা চলিতে পারে। দুই রাষ্ট্রেরই জনগণকে এই বিষয়ে অত্যন্ত সচেতন এবং দৃঢ় হইতে হইবে। অসংখ্য দুঃখদুর্দ্দশা, অনাহার দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়া যে পাওনা আমাদের সঞ্চিত হইয়াছে, যে পাওনা আদায় করার উপর আমাদের ভবিষ্যৎ পুনর্গঠন এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা নির্ভর করিতেছে, যাহা শিল্পে অনগ্রসর ভারতের একমাত্র আশাভরসার স্থল, সেই বিপুল ষ্টার্লিং সঞ্চয় যাহাতে আমরা সমগ্রভাবে যথাসত্বর আদায় করিয়া লইতে পারি, তাহার জন্য জনসাধারণকে এবং দুইটি সরকারকেই দৃঢ়ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে।

ভারতে পশুপালন

পৃথিবীর সমস্ত দেশের অর্থনৈতিক জীবনে পশুপালন এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। আর ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ বলিয়া, এবং যন্ত্রশিল্প এখানে সমুন্নত নয় বলিয়া পশুপালনের প্রয়োজনীয়তা এখানে অত্যন্ত বেশী। অন্যান্য দেশে প্রধানতঃ দুধ, ডিম, মাংস প্রভৃতি খাদ্যের জন্য পশুপালন করা হইয়া থাকে; কিন্তু ভারতবর্ষে গ্রামে এবং সহরে অধিকাংশ যানবাহন পশুর সাহায্যে চলে; ভূমি কর্ষণ করার জন্য পশুর প্রয়োজন হয়। অন্যান্য দেশে যন্ত্রচালিত ট্র্যাক্টর ব্যবহৃত হয়, আমাদের দেশে পশুচালিত লাঙ্গলের উপর নির্ভর করিতে হয়। অন্যান্য দেশে গ্রাম

হইতে সহরে পণ্য সম্ভার আনয়ন করার জন্য, রেলগাড়ী, লরী ব্যবহৃত হয়; আমাদের দেশে উৎপাদন কেন্দ্র হইতে বাজারে, রেল ষ্টেশন বা সহরে পণ্যাদি বহন করার জন্য আছে প্রধানতঃ গরুর গাড়ী বা মহিষ গাড়ী।

সেন্সাসের সংখ্যা হইতে জানা যায় যে ভারতে, শূকর এবং পক্ষী বাদ দিয়া গবাদি পশুর সংখ্যা হইতেছে ৩০ কোটি। ইহার মধ্যে ২২ কোটি ভারতীয় প্রদেশগুলিতে, এবং ৮ কোটি করদ রাজ্যগুলিতে রহিয়াছে। প্রদেশগুলিতে কেবল মাত্র গরু এবং মহিষের সংখ্যা অন্যূন ১৫½ কোটি হইবে এবং ভেড়া ও ছাগলের সংখ্যা ২½ কোটি। সংখ্যার হিসাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশ ভারতের অনেক পিছনে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ভারতের দেড়গুণেরও বেশী, কিন্তু সেখানে পশুর সংখ্যা ১৪ কোটী। ভারতের সংখ্যা অধিক হইলেও, সংখ্যানুপাতে উপকার আমরা পাই না। ভারতের পশু অর্দ্ধভূক্ত, আকারে ক্ষুদ্র, দুর্ব্বল এবং শক্তিহীন। বৎসরের পর বৎসর পশুর সংখ্যা অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু শাবকের উন্নতিবিধানের জন্য বা পশুর স্বাস্থ্য শক্তি উন্নত করিবার জন্য কোন সুসংগঠিত প্রচেষ্টা হয় নাই। ভারতের অন্যান্য সকল শিল্পের মত পশুপালন শিল্পও অবহেলিত হইয়াছে। তাহার ফলে পশুর কার্য্যক্ষমতা হ্রাস পাইয়াছে এবং সংখ্যা বাড়িয়াছে। সংখ্যাবৃদ্ধি এবং ক্ষমতাহ্রাসের এই পাপচক্রকে দূর করিতে না পারিলে, ভারতীয় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হইতে পারে না। "It is not more cattle, but better cattle that India requires."

ভারতে সমগ্র পালিত পশুর বাৎসরিক উৎপাদনের মোট মূল্য নিরূপণ করা প্রয়োজন। একজোড়া বলদের ভরণপোষণের জন্য বৎসরে মোট খরচ হয় ১৭৫ টাকা। দশ একর ভূমি কর্ষণের জন্য একজোড়া বলদ প্রয়োজন হয়। ভারতীয় প্রদেশগুলিতে ২৩ কোটি একর ভূমি কর্ষিত হয়; অতএব ভারতে কৃষিকার্য্যের জন্য যে পশুশক্তি ব্যবহৃত হয়, তাহার মূল্য অন্যূন ৪০০ কোটি টাকা। কৃষিকার্য্য ব্যতীত, গাড়ী টানা, মাল বহন করা প্রভৃতির মারফত

আমরা যে পরিমাণ শক্তি পাইয়া থাকি, তাহার মূল্য ১০৭ কোটি টাকা হইবে। গরুর সংখ্যার তুলনায় ভারতে দুগ্ধের উৎপাদন অত্যন্ত কম। দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য লইয়া ভারতবাসী গড়ে দৈনিক ৬।৭ আউন্স দুধ পাইয়া থাকে। এইদিক হইতে আমরা ৫৪০ কোটি টাকার মূল্য পাইয়া থাকি। ভারতের কৃষির জন্য রাসায়নিক সারের অভাবে যেটুকু সার ব্যবহৃত হয়, তাহা প্রধানতঃ পাই গোময় ইত্যাদি হইতে। এই সারের মূল্য অন্যূন ১৮০ কোটি টাকা। চর্ম্ম, শিরীষ, বোতাম, ছুরি কাঁচির বাঁট ইত্যাদির জন্য আমরা ৩০ কোটি টাকার সম্পদ পাইয়া থাকি। অর্থাৎ ১৯৩৭-৩৮ সালের নিম্ন মূল্যস্তরেই পশুপালন হইতে আমরা ১৩০০ কোটি টাকার মূল্য পাইয়াছি।

এই হিসাবের মধ্যে হাঁস মুরগী প্রভৃতি পক্ষীর মূল্য ধরা হয় নাই। "Egg Marketing Report of India"এর হিসাবমতো ভারতবর্ষে নানা-বিধ মুরগী হাঁস প্রভৃতির মোট মূল্য অন্ততঃ ৭ কোটি টাকা; ইহার উপর বৎসরে যে ডিম বিক্রয় হয়, তাহার মূল্য ৫½ কোটি টাকা। এই সকল মূল্যের হিসাব করা হইয়াছিল যুদ্ধ পূর্ব্ব যুগে। যুদ্ধোত্তর যুগে দুধ, ডিম, মাংস, শ্রমশক্তির মূল্য অনেক বৃদ্ধি পাওয়ায়, পশুপালনের মূল্য টাকার অঙ্কে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

অর্থনৈতিক জীবনে এতবেশী গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, পশুপালন শিল্প ভারতবর্ষে অত্যন্ত অবহেলিত। হাঁস মুরগীর চাষ আমাদের দেশে নিতান্তই আপনা হইতে হইয়াছে; কেহ ইহার জন্য চিন্তা বা চেষ্টা করে নাই। আমাদের গ্রাম্য সম্প্রদায় পুরুষানুক্রমে পরিবারগত ভাবে পক্ষীপালন করিয়া আসিতেছে এবং ডিম প্রভৃতি দ্রব্য বাজারে বিক্রয় করিতেছে। সেইজন্য অন্যান্য দেশে জনসাধারণ মাথা পিছু বৎসরে ১৫০ হইতে ৩০০টি ডিম পায়, আমরা পাইয়া থাকি মাত্র ৮টি। আর অন্যান্য দেশে এক একটি পাখী গড়ে ১০০।১২০টি ডিম প্রসব করে; আমাদের দেশে একটি পক্ষী পিছু ডিমের

সংখ্যা ৫০টি। গরু মহিষ ইত্যাদি বহুলভাবে পালন করা হইলেও, তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ, অথবা স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা আজ পর্য্যন্ত অত্যন্ত কম হইয়াছে। অন্যান্য দেশে গবাদি (হইতে) দুগ্ধের উৎপাদন পরীক্ষা করিলে, আমাদের শোচনীয় অবস্থার স্বরূপ বুঝা যাইবে।

দেশ	পশুর মাথাপিছু বাৎসরিক উৎপাদন
ডেনমার্ক	৩৮৭ গ্যালন
সুইজারল্যাণ্ড	৩৮০ ,,
ভারতবর্ষ	৩০ ,,

ডেনমার্কে গরুর সংখ্যা হইতেছে ভারতের সত্তর ভাগের এক ভাগ; কিন্তু উৎপন্ন দুগ্ধের পরিমাণ হইতেছে মাত্র ৫ ভাগের এক ভাগ। ভারতে মোট ৭০ হইতে ৮০ কোটি মন দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। তাহার জন্য শুধু পশুপ্রজনন, খাদ্য ব্যবস্থা, পশুর স্বাস্থ্যের উন্নতি করিলেই চলিবে না। এই সমস্ত ছাড়াও, গোপালনের ব্যয় কমাইয়া দুগ্ধের মূল্য কমাইতে হইবে, যাহাতে দরিদ্র জনসাধারণ দুগ্ধের ব্যবহারের সুযোগ পায়। সহরে দুগ্ধ সরবরাহের সমস্যা বিশেষভাবে জরুরী। ভারতে উৎপন্ন সমগ্র দুগ্ধের এক তৃতীয়াংশ তরল দুগ্ধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, অর্দ্ধেক ঘৃত হয়, এবং এক ষষ্ঠাংশ হইতে খোয়া, দধি প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রস্তুত ব্যাপারে ভারতীয় কারিগর দিগকে এক কঠিন সমস্যায় পড়িতে হয়। গরম দেশের আবহাওয়ায় দুগ্ধ অল্পক্ষণেই পচিয়া যায়; সেইজন্য দুগ্ধ হইতে বিবিধ দ্রব্য উৎপাদনে অত্যন্ত দ্রুততা এবং দক্ষতার প্রয়োজন হয়। দ্বিতীয়তঃ, দ্রুত যানবাহনের সুবিধা আমাদের দেশে নাই। যুদ্ধপূর্ব্বে এইরূপ প্রায়ই দেখা যাইত, এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, গ্রামে দুগ্ধ অত্যন্ত অল্পমূল্যে বিক্রয় হইয়া যায়, কিন্তু সহরে দুগ্ধ পাওয়াই যায় না। ঘী, মাখন, ছানা প্রভৃতি

গ্রামে প্রস্তুত করিয়া সহরে প্রেরণ করা হয় বটে; তবে যানবাহনের সুবিধা থাকিলে সেই সমস্ত দুগ্ধ এবং দুগ্ধজাত দ্রব্য আরও বেশী লাভজনক এবং কার্য্যকরী ব্যবহারে লাগানো যাইত। সহরে গোমহিষাদি পরিপালন অত্যন্ত কঠিন এবং ব্যয়সাপেক্ষ। গ্রামে পশুপালন অনেক বেশী সহজ এবং স্বল্পব্যয় সাধ্য। ব্যক্তিগত ব্যবসা হিসাবেই হউক, আর সমবায় ভিত্তিতেই হউক গ্রামে Dairy Farm করিয়া দুগ্ধ উৎপন্ন এবং উন্নততর যানবাহনের সাহায্যে তাহা সহরে প্রেরণ করিলে আমাদের দেশে এই শিল্পের প্রভূত উন্নতি সম্ভব। ইহাতে শুধু দেশের পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মিটিবে না, আমাদের হাঁসপাতালগুলিকে উৎকৃষ্ট নির্জ্জলা দুগ্ধের সংগ্রহ ব্যাপারে যে সমস্যায় পড়িতে হয়, তাহারও বহুলাংশে লাঘব হইবে। ইহা ব্যতীত, আমাদের শতকরা ৯০ জন লোক গ্রামে বাস করে; গ্রামের জনসাধারণকে দুগ্ধ ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রতি গ্রামে স্বল্প ব্যয়ে গোপালনের বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। মহাত্মা গান্ধীর অনুপ্রেরণায় গোসেবা সংঘ এই কার্য্য করিতে অগ্রসর হইয়াছে; কিন্তু তাঁহাদের কার্য্য এখনও পর্য্যন্ত দেশপ্রেমের প্রেরণায় চালিত হয়; ব্যাপকতার দিক হইতে, বা অর্থনৈতিক মাপকাঠীতে এখনও এই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে নাই।

খাদ্যের বিষয়ে দুধ, ডিমের সহিত মাংসের উল্লেখ করা প্রয়োজন। মাংসের জন্য মেষপালন, এবং তাহার সহিত, "that much-maligned, but most useful animal" ছাগলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। বর্ত্তমানে আমাদের দেশের মেষ এবং ছাগ শাবক অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার এবং ক্ষীণকায়, তাই মাংস এত মহার্ঘ। ছাগ এবং মেষের উন্নতিবিধান বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে করা প্রয়োজন এবং সম্ভব।

পশুপালন শিল্পের উন্নতির জন্য আমাদের কতকগুলি কার্য্য করিতে হইবে। পশুর খাদ্যের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। মানুষের খাদ্য সমস্যা অপেক্ষা পশুর খাদ্য সমস্যা কোন অংশে কম নয়। আমাদের দেশে গোমহিষাদির

সংখ্যাধিক্য তাহাদের খাদ্য-সমস্যাকে আরও তীব্র করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা যদি অন্যান্য দেশের মত শক্তিশালী এবং কার্য্যক্ষম হইত, তবে অনেক অল্প সংখ্যক পশু লইয়াই আমরা কৃষিকার্য্য চালাইতে পারিতাম, বা দুগ্ধের উৎপাদন বৃদ্ধি করিতে পারিতাম। বর্ত্তমানে দুইদিক হইতে আমাদের অসুবিধা। পশুর কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যায়, আর হ্রাসপ্রাপ্ত কার্য্য-ক্ষমতার ক্ষতিপূরণের জন্য অধিক সংখ্যক পশু জন্মাইতে হয়। অধিক সংখ্যক পশু হইলেই, তাহাদের খাদ্য সংস্থান শক্ত হইয়া পড়ে; ফলে বলদগুলি শক্তিশালী হয় না, গরুগুলি অধিক দুগ্ধ দিতে পারে না। গোমহিষাদির খাদ্যের জন্য আমরা প্রধানতঃ নির্ভর করি বিচালী, চাউলের ক্ষুদ, ডালের ভূষি, তৈলের খৈল ইত্যাদির উপর। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই আমরা গবাদি পশুকে জঙ্গল বা পতিত জমির উপর চরিতে দিই। আমাদের যেন নিয়মই হইয়া গিয়াছে—পশু বনজঙ্গল হইতে নিজের খাদ্য নিজেই সংগ্রহ করিয়া লইবে। আমেরিকা, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের মত আমাদের গোচারণ ভূমি নাই, বা বাহির হইতে শুষ্ক ঘাস প্রভৃতি পশুর খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা নাই। আমাদের দেশে মানুষের মত পশুও অনাহারে ক্লিষ্ট হয়, দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

কৃষিকার্য্যের জন্য বৈজ্ঞানিক সারের বন্দোবস্ত না থাকায় সারের জন্য আমাদের প্রধানতঃ নির্ভর করিতে হয় গোময় ইত্যাদির উপর। ভারতের মত জনবহুল দেশে অল্প পরিমাণ ভূমি হইতে Intensive কৃষিকার্য্যের দ্বারা বেশী পরিমাণ শস্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন এবং তাহার জন্য সারের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। আমাদের কৃষিপরিকল্পনায় বা দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈজ্ঞানিক সারের কথা থাকিলেও, নিকট ভবিষ্যতে সমগ্র দেশে ইহা সম্ভব নহে। পশুপালন যথাযথ ভাবে করিতে পারিলে, এবং কৃষিকার্য্যের সহিত পশুপালন একত্র যুক্ত করিতে পারিলে, সারের সমস্যা অনেকখানি সমাধান হইয়া যায়। পশুপালন দ্বারা সার পাওয়া যাইতে পারে, এবং কৃষির উন্নতি হইতে পারে। কৃষির উন্নতি হইলে পশুর খাদ্য মিলিবে, এবং পশুপালন সুষ্ঠু ভাবে হইতে

পারিবে। Nigeria, Gold Goast প্রভৃতি দেশে এইভাবে কৃষিকার্য্যের সহিত পশুপালন যুক্ত করিয়া, উভয়েরই উন্নতি হইয়াছে এবং গ্রামের রূপ-পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেও প্রয়োজন হইতেছে—"the dove-tailing of the arable and animal husbandries into one mixed farming system"

পশুপালনের আর একটি সমস্যা হইতেছে উন্নত শাবক প্রজনন করা। আমেরিকা; অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকভাবে অনেকখানি অগ্রগতি হইয়াছে। আমাদের দেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে এই চেষ্টা করা হইয়াছে ; কিন্তু সরকার এবং জনসাধারণের আগ্রহ এবং উদ্যমের অভাবে খুব অল্পই অগ্রসর হইতে পারা গিয়াছে। দেশেরই বিভিন্ন অংশে উন্নত গুণসম্পন্ন স্বাস্থ্যবান্ বলদ এবং অন্যান্য পশু পাওয়া যায়। বিদেশ হইতেও উৎকৃষ্ট পশু স্বল্প সংখ্যক আনয়ন করা সম্ভব। এই সমস্ত উন্নত জাতির বংশবৃদ্ধির জন্য প্রজনন কেন্দ্র মারফৎ পরিকল্পিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন। অপরদিকে নিকৃষ্ট পশু সমূহকে আর বংশ বৃদ্ধি করিতে দেওয়া উচিত নহে ; এবং ধীরে ধীরে তাহারা লোপ পাইয়া যাইবার পর উন্নত গুণসম্পন্ন পশু তাহাদের স্থান অধিকার করিয়া লইবে। পশুর চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন প্রদেশে পশুচিকিৎসালয় আছে ; পশুর অসুখ নিবারণের জন্য মুক্তেশ্বরে Imperial Institute of Veterinary Researchএর নাম উল্লেখযোগ্য। হিসাবের Punjab Government Farm উন্নত শাবক প্রজননের কার্য্যে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছে, এইরূপ প্রজনন কেন্দ্র সকল প্রদেশেই প্রয়োজন।

ভারতের মধ্যবিত্ত সমাজ এখন বেকার সমস্যার প্রকোপে পড়িয়াছে। তাহার একটি কারণ আমরা নূতন দিকে দৃষ্টি ফিরাইতে আজিও পারি নাই। প্রত্যেক সহরে বহুসংখ্যক লোক গোপালন এবং দুগ্ধ সরবরাহ করিয়া সম্মানের সহিত জীবিকা অর্জ্জন করিতে পারে এবং তাহার সহিত দেশের একটি বৃহৎ অভাব দূর করিতে পারে। পক্ষীপালন প্রভৃতির সাহায্যেও বহুসংখ্যক

লোকের অন্নসংস্থান হওয়া সম্ভব। এই সমস্ত প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতে পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব বহুলাংশে মিটিবে, এবং তাহার সহিত অনেক বেকার যুবক লাভজনক ব্যবসায় পাইবে। এই সমস্ত নূতন সুযোগের দিকে অবিলম্বে আমাদের মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

ভারতের অর্থ নৈতিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

বর্ত্তমানে আমরা পরিকল্পনার যুগে বাস করিতেছি। শিল্প কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতির দ্রুত উন্নতির জন্য আমরা একক ব্যবসায়ী বা শিল্পপতির উপর নির্ভর করি না। শিল্পবিপ্লবের পর হইতে বিলাতে, জার্মানীতে শিল্পের বিস্তার হইয়াছিল ধীরে, ধীরে,—ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর প্রচেষ্টায় এবং উদ্যমে। কিন্তু বর্ত্তমানে দ্রুত শিল্পবিস্তারের প্রয়োজন এত বেশী যে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীর উদ্যোগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলে না। রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হইয়া দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পনা করিতে হয়, এবং ব্যাপকভাবে কৃষিসংস্কার বা শিল্পবিস্তার করিতে হয়। এই পরিকল্পনা করিয়া শিল্প বা কৃষির উন্নতির প্রচেষ্টা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে অভূতপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করিয়াছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বর্ত্তমানে পরিকল্পনা করিয়া পুনর্গঠন প্রচেষ্টা চলিতেছে এবং ইহাতে ফললাভ হইতেছে। আমাদের দেশের সম্মুখে অসংখ্য সমস্যা রহিয়াছে,—যুদ্ধোত্তর বেকার সমস্যা, মধ্যযুগীয় ভূমিপ্রথা, অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, ক্রমবর্দ্ধমান খাদ্যাভাব, অপ্রচুর শিল্প, অব্যবহৃত খনিজ, ব্যাপক নিরক্ষরতা, স্বাস্থ্যের চরম দুর্গতি—আমাদের জাতীয় জীবনকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়াছে। এই সমস্ত সমস্যার আশু সমাধান একমাত্র ব্যাপক পরিকল্পনার সাহায্যেই হইতে পারে। পরিকল্পনা না করিয়া রাষ্ট্র যদি এই সব

সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তবে তাহা জাতির আত্মহত্যার কাজ হইবে। 'Planning is the cry of the day.'

পরিকল্পনার প্রয়োজনের কথা সাধারণ এবং সরকার যে অনুভব করিয়াছেন তাহার পরিচয় আমরা ইতিমধ্যেই পাইয়াছি। যুদ্ধের শেষের দিকে কেন্দ্রীয় Executive Councilএর পক্ষ হইতে স্যার আর্দ্দেশীর দালালের নেতৃত্বে পুনর্গঠন ও উন্নয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছিল। এই বিভাগ ভারতে শিল্পবিস্তারে সুযোগ সুবিধা সম্বন্ধে পরামর্শ দিবার জন্য কতকগুলি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিল, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারগুলিও পুনর্গঠন সম্বন্ধে কিছু কিছু চিন্তা করিয়াছিলেন, নূতন দপ্তর খুলিয়া আগামী ৫।১০ বৎসরের পুনর্গঠনের জন্য অর্থ মঞ্জুর করিয়াছিলেন। কেন্দ্রে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই ১৯৪৬ সালের অক্টোবর মাসে উন্নয়ন বোর্ড গঠন করিয়াছেন। এই বোর্ড ভারতে কৃষিসংস্কার, শিল্পপ্রসার, স্বাস্থ্যের উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ একটি রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন।

জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই বিষয়ে চিন্তা এবং প্রচেষ্টা বহু পূর্ব্বেই সুরু হইয়াছে। যুদ্ধের পূর্ব্বেই জাতীয় মহাসভার পক্ষ হইতে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি (National Planning Committee) পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল ; এই কমিটি ভারতের শিল্পবিস্তার, কৃষির উন্নতি বিষয়ে কতকগুলি মূলনীতি ও সমস্যা সুন্দরভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন। বেসরকারীভাবে দ্বিতীয় প্রচেষ্টা হইতেছে টাটা, বিড়লা প্রমুখ ভারতের আটজন বিখ্যাত শিল্পপতি কর্ত্তৃক রচিত বোম্বাই পরিকল্পনা। র‍্যাডিক্যাল ডেমো-ক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় বহু পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং প্রগতি-মূলক People Plan প্রকাশ করেন। ইহা ছাড়াও বিখ্যাত ব্যবসায়ী স্যার এম্ বিশ্বেশ্বরায়া কর্ত্তৃক "ভারতের পুনর্গঠন পরিকল্পনা" এবং ওয়ার্দ্ধা হইতে গান্ধীবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত গান্ধী পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়।

এই পরিকল্পনাগুলির মধ্যে কিছু কিছু ভুল, ত্রুটি বা অসম্পূর্ণতা আছে।

বিশ্বেশ্বরায়া এবং টাটা বিড়লা পরিকল্পনা প্রধানভাবে ভারতের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া রচিত হইয়াছে। এই দুই পরিকল্পনায় উৎপাদনের উপর যে গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, বণ্টন ব্যবস্থার উপর তাহা দেওয়া হয় নাই; শিল্পের জন্য যে মনোযোগ দেওয়া হয়, কৃষির জন্য তাহা হয় নাই। এম. এন. রায়ের জনসাধারণের পরিকল্পনায় এই দোষ অবশ্য নাই, তবে এই কথা বোধ হয় ভুল নহে, যে এই পরিকল্পনায় বাস্তব পরিস্থিতি সম্বন্ধে চেতনার অভাব লক্ষিত হয়। গান্ধী পরিকল্পনা উদ্দেশ্যের দিক হইতে অত্যন্ত প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষে যে কোন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে গেলে, তাহার মূলকেন্দ্র হইবে গ্রাম এবং ভিত্তি হইবে কৃষক-সমাজ—এই অতি সত্য কথাটির উপর গান্ধী পরিকল্পনার গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। কিন্তু গান্ধী পরিকল্পনায় অত্যন্ত পুরাতন চিন্তাধারা, সময়ের অনুপযোগী কর্ম্মসূচী এবং অবাস্তব রক্ষণশীল মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

সকল দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যায় নেহরুর জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি সর্ব্বাপেক্ষা বাস্তব, প্রগতিশীল এবং বৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে একদিকে যেমন কৃষিকে অবহেলা করা হয় নাই, অন্যদিকে তেমনই শিল্পের উপযোগিতা ও সম্ভাবনা সম্বন্ধে রক্ষণশীলতার পরিচয় নাই। উৎপাদন বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু বণ্টনব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনও স্বীকৃত হইয়াছে। অন্যান্য পরিকল্পনার মত ইহাতে অবশ্য বিশদ কার্য্যসূচী নির্দ্ধারিত হয় নাই, ইহা অনেকাংশে অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে; কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া বিচার করিলে সকলের মধ্যে এই পরিকল্পনাটিই গ্রহণযোগ্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা কোন বিশেষ পরিকল্পনা সবিস্তারে বর্ণনা করিব না; অথবা নিজের একটি নূতন পরিকল্পনা প্রস্তুতও করিব না। সমস্ত পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করিয়া এবং ভারতের বাস্তব অবস্থা, সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি বিচার করিয়া কতকগুলি প্রধান নীতি আলোচনা করিব।

ভারতে যে কোন পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করিতে হইলে, এই সমস্ত মূলনীতির দিকে দৃষ্টি- রাখিতেই হইবে।

আমাদের দেশে যে কোন পরিকল্পনা সুরু করিতে হইবে গ্রাম হইতে, কৃষকের সমস্যার সমাধান আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহার পর গ্রামের সমৃদ্ধির সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া শিল্প প্রভৃতির প্রসার করিতে হইবে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভূমিপ্রথার পরিবর্ত্তন করিয়া রাষ্ট্রের সহিত কৃষকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ গড়িয়া তুলিতে হইবে, ভূমির উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা কমাইতে হইবে, ক্ষুদ্র, খণ্ডিত ক্ষেত্রগুলি লইয়া সমবায় প্রথার সাহায্যে বৃহৎ বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করিয়া ভূমি কর্ষণের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানী করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। কৃষককুলের বৃহদংশ ভূমিহীন এবং অধিকাংশই বৎসরে ছয় মাস কৃষি কার্য্য করিয়া অবশিষ্ট ছয় মাস অলস হইয়া বসিয়া থাকে। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির জন্য ভূমিহীন কৃষককে এবং কৃষকদের মধ্যে যাহারা বেকার থাকে তাহাদিগকে নূতন কার্য্যে নিযুক্ত করিতে হইবে। এইজন্যই গ্রামের কুটীর শিল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইবে, এবং সহরে কারখানা শিল্পের প্রসার করিতে হইবে। কৃষির উন্নতি এবং শিল্পবিস্তার পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। একটিকে অবহেলা করিয়া অপরটির উন্নতি করা যায় না। আমাদের হাজার হাজার গ্রামে কুটীর শিল্প গড়িয়া তুলিতে না পারিলে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের গ্রামগুলির অর্থনৈতিক জীবন পুনর্গঠন করা অসম্ভব। কৃষির উন্নতির জন্য সেচ ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। কুটীর শিল্পের জন্য সস্তায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে হইবে। ভারত সরকার এই দুই কাজের জন্য চারিটি সেচ এবং তৎসহ জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। কোশী, মহানদী, তুঙ্গভদ্রা এবং দামোদর এই চারিটি পরিকল্পনার সাহায্যে ৫৬ লক্ষ একর ভূমির উপর সেচ দেওয়া যাইবে, এবং ১৬ লক্ষ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ হইবে। কুটীর

শিল্পের জন্য মূলধন সমস্যাও প্রবল। সমবায় সমিতি গঠন করিয়া কুটীর শিল্পকে মূলধন যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। কৃষিজাত এবং কুটীর শিল্পজাত দ্রব্য ন্যায্য মূল্যে বাজারজাত করার জন্যও সমবায় সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।

কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক এবং চিরন্তন বেকার সমস্যার উপরে যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতবর্ষে ৭.০ লক্ষ লোক নূতনভাবে বেকার হইয়াছে। আমাদের শিল্প পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হইবে এই ব্যাপক বেকার সমস্যা তিরোহিত করা, এবং ভারতে সার্ব্বজনীন কর্ম্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শিল্পবিস্তারের কার্য্যের প্রথমেই আমাদের মূল শিল্পগুলির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে হইবে। লৌহ ও ইস্পাত শিল্প, যন্ত্রপাতি উৎপাদনের কারখানা, সিমেণ্ট শিল্প, রাসায়নিক শিল্প, খনিসমূহ যানবাহন প্রভৃতি সমৃদ্ধ না হইলে, অন্য কোন শিল্প গড়িয়া উঠিতে পারিবে না। বোম্বাই পরিকল্পনাতে ন্যায় সঙ্গতভাবেই এই সমস্ত গুরুশিল্পগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে এবং ইহাদের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা ধার্য্য করা হইয়াছে। মূলশিল্পের উপর গুরুত্ব দিতে হইলে প্রথমদিকে ভোগ্য পণ্যশিল্পকে বাদ দিতে হইবে; এবং ভোগ্য পণ্যের অভাবে জনসাধারণকে অত্যন্ত অসুবিধায় পড়িতে হইবে। সোভিয়েট দেশেও পরিকল্পনার প্রথম যুগে ভোগ্য পণ্যের অভাবে সেখানকার নাগরিকদের অত্যন্ত দুর্ভোগে পড়িতে হইয়াছিল। "Planning without tears" কখনই সম্ভব হয় না; তবে কর্তৃপক্ষ পরিকল্পনাকে ঠিকভাবে কার্য্যকরী করিতে পারিলে দুঃখকষ্টের পরিমাণ কম হইবে, এবং পরিকল্পনার শেষের যুগে ভোগ্য বস্তুর উৎপাদন যথেষ্ট বাড়িয়া গেলে, দেশের জীবন যাত্রার মান উন্নত হইতে পারিবে।

যে কোন পরিকল্পনার মুখ্য লক্ষ্য হইতেছে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। কিন্তু তাহা শুধু উৎপাদন বৃদ্ধি করিলেই হইবে না, উৎপন্ন সম্পদ যাহাতে সমভাবে বণ্টন করা হয়, সেইদিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে কারখানার শ্রমিকদের জন্য একটি ন্যূনতম বেতনের হার নির্দ্ধারণ

করিয়া দেওয়া প্রয়োজন। সম্প্রতি Pay Commission তাঁহাদের রিপোর্টে ন্যূনতম বেতন স্থিরীকৃত করিয়াছেন। রাষ্ট্র নির্দ্ধারিত বেতনের হার যাহাতে কারখানার মালিকরা মানিয়া লয়, তাহার জন্য শিল্প বাণিজ্যের উপর রাষ্ট্রের কর্ত্তৃত্ব রাখা প্রয়োজন। অবশ্য এই প্রশ্ন লইয়া মতভেদ আছে। তবে প্রগতিশীল মনোভাব এই যে জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলির (Public utility services) এবং মূল শিল্পগুলির উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ উদ্যোগ ও কর্ত্তৃত্ব থাকা উচিত। তাহা না হইলে, শুধু যে বেতন বা অন্যান্য ব্যাপারে শ্রমিকেরা শোষিত হইবে তাহা নহে; রাষ্ট্র যথেষ্ট উদ্যম না দেখাইলে, শিল্পগুলি মূলধন সংগ্রহ করা, উৎপাদন কার্য্য চালান প্রভৃতি ব্যাপারে অনেকগুলি অসুবিধার সম্মুখীন হইবে। মূল শিল্পগুলি অনেক সময়ে লাভজনক হয় না; এইরূপ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকেই অগ্রণী হইয়া তাহাদের সাহায্য করিতে হইবে, ক্ষতি-পূরণ করিতে হইবে। ভোগ্যপণ্য শিল্পের উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের বর্ত্তমানে প্রয়োজন নাই; তবে কার্য্যের ঘণ্টা বাঁধিয়া দেওয়া, ন্যূনতম বেতন স্থির করিয়া দেওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ থাকিলেই চলিবে।

খনিশিল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মূলশিল্প। কিন্তু আমাদের দেশে খনিজ সম্পদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয় না। খনিগুলিকে প্রয়োজন হইলে রাজবৃত্তি (Subsidies) দিয়াও খনিজ শিল্পের সদ্ব্যবহার এবং সংরক্ষণ করা প্রয়োজন এবং ইহার উপর রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রাখিতে হইবে। শিল্প প্রসারের আরও একটি করণীয় রহিয়াছে—কারিগরি শিক্ষাদান। আমাদের দেশে এই শিক্ষার ব্যবস্থা এত সংকীর্ণ যে শিল্প পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক সুদক্ষ কারিগর পাওয়া যাইবে না। ভারত সরকার আমাদের দেশে দুইটি কারিগরি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। কারিগরি শিক্ষা ব্যতীত, দেশে যে কোনরূপ উন্নতির জন্য সাধারণ শিক্ষার ব্যাপক প্রসার, এবং বিস্ময়কর নিরক্ষরতা দূর করা আবশ্যক। শিক্ষা প্রসারের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার নিযুক্ত সার্জেণ্ট কমিটি তাঁহাদের রিপোর্ট দিয়াছেন। শিক্ষার

পরিকল্পনা অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা সীমাবদ্ধ, আমেরিকা বা বিলাতের মত শিক্ষার সুযোগ আমরা হঠাৎ দিতে পারিব না। অতএব ঐ কমিটির পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্য্য সুরু করিলেই বর্ত্তমানে মোটামুটী চলিতে পারে।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য এখন হইতেই প্রণালীবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রয়োজন। ভারতের স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় প্রবন্ধে আমরা কতকগুলি প্রয়োজনীয় কার্য্যের কথা উল্লেখ করিয়াছি। যুদ্ধোত্তর যুগের স্বাস্থ্য পরিকল্পনা বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে Bhore Committee রিপোর্ট দিয়াছেন। অনেক প্রদেশে তাহারই অনুকরণে কার্য্য আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য হাসপাতাল, স্বাস্থ্যাগার প্রতিষ্ঠা ছাড়াও বাসগৃহ নির্ম্মাণ একটি আবশ্যকীয় কার্য্য। বর্ত্তমানে বাসগৃহের অভাব অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। শ্রমিক অঞ্চল এবং সহর অঞ্চলগুলিতে বাসগৃহ নির্ম্মাণের জন্য ২২০০ কোটি টাকা বোম্বাই পরিকল্পনায় ধার্য্য হইয়াছে। বাসগৃহ একটি স্থায়ী মূল্যবান্ জাতীয় সম্পদ; এইজন্য বাসগৃহ নির্ম্মাণে পুঁজি নিয়োগ করিলে তাহাতে লোকসান যাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এই কার্য্যে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্যম প্রয়োজন।

দেশের একস্থান হইতে অপর স্থানে লোক এবং জিনিসপত্রের চলাচল সহজ করিবার জন্য, উৎপাদন কেন্দ্র এবং বিক্রয় কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়িবার জন্য ভারতে অনেক বেশী রেলপথ, রাজপথ, জলপথ, আকাশপথের আবশ্যকতা রহিয়াছে। যানবাহনাদি নির্ম্মাণ ও উন্নতির জন্য বোম্বাই পরিকল্পনায় ৯৪০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর যুগে ভারতে যানবাহন ব্যবস্থার কিছু কিছু প্রসার হইতেছে। নূতন আকাশপথ খোলা হইয়াছে, বাংলায়, বিহারে রেলপথ নির্ম্মিত হইতেছে; কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় প্রচেষ্টা অকিঞ্চিৎকর।

পরিকল্পনা কার্য্যকরী করার জন্য যে অর্থ প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের জন্য আমাদের পাওনা ষ্টার্লিং, বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত, দেশবাসীর সঞ্চয়, অন্তর্দ্দেশীয়

ঋণ গ্রহণ ব্যতীত বিদেশ হইতে ঋণ গ্রহণ ও ৩৪০০ কোটি টাকার নোট ছাপাইবার পরামর্শ শিল্পপতিরা দিয়াছেন। আমাদের দেশে অত্যন্ত বেশী মুদ্রাস্ফীতি এখনই রহিয়াছে, ইহার উপর মুদ্রাস্ফীতি করা অত্যন্ত জনস্বার্থ বিরোধী। ভারতে যে বিপুল পরিমাণ সঞ্চিত স্বর্ণ আছে, যুদ্ধের সময়ে চোরাকারবারীরা যে বিরাট মুনাফা করিয়াছে তাহার কিয়দংশ কর বসাইয়া লইয়া, আমাদের ষ্টার্লিং পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় করিয়া—প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। পরিকল্পনা জনসাধারণের স্বার্থেও হইতে পারে, ব্যবসায়ী বণিকের স্বার্থেও হইতে পারে। কাহার স্বার্থে পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইবে—তাহা নির্ভর করে রাষ্ট্র কাহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং কতখানি দৃঢ়তা অবলম্বন করে—তাহার উপর। ভারতীয় রাষ্ট্র যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অনুচরবৃন্দ এবং ভারতীয় কায়েমী স্বার্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, তাহা হইলে ভারতীয় আর্থিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ভারতীয় জনস্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে। আবার আমাদের রাষ্ট্র যদি প্রকৃতপক্ষে জনসাধারণের দ্বারা প্রভাবান্বিত এবং জনস্বার্থে পরিচালিত হয়, তবে সাম্রাজ্যবাদের অবশিষ্ট প্রভাব এবং কায়েমী স্বার্থের বাধা অতিক্রম করিয়া, জনসাধারণ কৃষি শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যের সমৃদ্ধি করিতে পারিবে, এবং সমগ্র দেশের জীবনযাত্রার মান উন্নত করিতে পারিবে।

রাষ্ট্রীয় আদর্শ

রাষ্ট্রের বিবিধ প্রশ্ন লইয়া আমরা আলোচনা করিয়াছি; ভারতীয় রাষ্ট্রের বিবিধ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যার দিকে আমরা পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছি এবং এবিষয়ে আমাদের কর্ত্তব্যের কথা যথাসাধ্য বলিয়াছি; কিন্তু সাধারণভাবে রাষ্ট্রের আদর্শ কী হইবে, কোন লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য রাষ্ট্রযন্ত্র এবং জনসাধারণের কর্মোদ্যম পরিচালিত হইবে,—সেই সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের ফলে ভারতীয় রাষ্ট্র জন্মলাভ করিতেছে, উপনিবেশের পরাধীন মানুষের পর্য্যায় হইতে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীন মানুষের পর্য্যায়ে আমরা উন্নীত হইতেছি, ঠিক এই সময়ে রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য কী হইবে সে সম্বন্ধে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

বিবিধ অর্থনৈতিক সামাজিক সমস্যা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে; পুনর্গঠন পরিকল্পনার কথা আমরা বলিয়া থাকি,—কিন্তু কিসের জন্য পুনর্গঠন ও কোন আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করিবার জন্য পরিকল্পনা, কোন ধ্রুবতারা আমাদের পথ-প্রদর্শক—সেই সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকিলে কোন প্রচেষ্টা বা পরিকল্পনার অর্থ হয় না। আমরা সকলেই যদি স্বচ্ছন্দ বনজাত ফলমূলেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারি, ভোগের আকাঙ্ক্ষা যদি বিসর্জ্জন দিতে পারি, দারিদ্র্যে যদি লজ্জা ও অসন্তোষ বোধ না করি তবে রাষ্ট্রের কাঠামো বা আদর্শ ও গঠনের পরিকল্পনা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন হয় না। আদিম যুগে নির্ম্মম প্রকৃতির ক্রোড়ে আবির্ভূত হইয়া মানুষ আত্মরক্ষার জন্য যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিল—বিংশ শতাব্দীতেও যদি সেই অবস্থারই পুনরভিনয় হয়, সবল দুর্ব্বল ধনী নির্ধন সকল শ্রেণীর লোককে প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে ঠেলিয়া দিয়া রাষ্ট্র যদি কেবল রাজস্ব সংগ্রহেই মনোনিবেশ করে, তাহা হইলেও আদর্শ বা উদ্দেশ্য লইয়া কোন

বিতর্কের সৃষ্টি হয় না। কিন্তু রাষ্ট্রের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সকল দেশের মানুষই আজ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে—জীবনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের অধিকার ও হস্তক্ষেপ ক্রমশঃ প্রসারিত হইতেছে এবং মানুষই আজ তাহা চাহিতেছে। কারণ রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধ নাই, ব্যক্তি সমূহের সমষ্টীভূত ইচ্ছাশক্তিই রাষ্ট্রের প্রাণ। এই নূতন চেতনা হইতেই আজ দাবী উঠিয়াছে—রাষ্ট্রের করণীয় কি ? ব্যক্তি বিশেষের সুখসমৃদ্ধি বর্দ্ধন, না সামগ্রিক কল্যাণ সাধন ? সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের জন্য রাষ্ট্রের যন্ত্র চালনা করিবে কে—কোন স্বৈরাচারী শক্তি, বা কোন অতিমানুষ—না রাষ্ট্রের সমগ্রের শুভবুদ্ধি ?

রাষ্ট্রে আদর্শ কী হইবে তাহা জানিবার পূর্ব্বে, আদর্শ বলিতে আমরা কী বুঝি—সে সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনেক সময়ে আমরা আদর্শ, এবং সেই আদর্শে পৌঁছাইবার পথের মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলি। "স্বাধীনতা আমাদের আদর্শ, "সমাজ তন্ত্র আমাদের আদর্শ"—এই ধরণের কথা আমরা বলিয়া থাকি। কিন্তু বস্তুতঃ, স্বাধীনতা বা সমাজতন্ত্র আমাদের আদর্শ নহে ; আদর্শ হইতেছে উন্নততর জীবন, মহত্তর মানবসমাজ। স্বাধীনতা বা সমাজতন্ত্র উন্নততর জীবন লাভ করিবার, মহত্তর সমাজ গঠন করিবার পথ বা উপায় হইতে পারে।

বর্ত্তমানে মানুষ যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থায় থাকিয়া তাহার মনন শক্তিদ্বারা জীবনের বৃহত্তর সম্ভাবনা সম্বন্ধে সে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ কল্পনা করিতে পারে—তাহাই হইতেছে তাহার আদর্শ। আদর্শের স্থান হইতেছে মানুষের অনুভূতির মধ্যে। সামাজিক মানুষ অনুভব করে—"এই বিশেষ ব্যবস্থা (তাহার আদর্শ) আমি যদি সমাজে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারি, তবে আমার জীবন অর্থহীন।" আদর্শ দূরদিগন্তে চক্রবালরেখার মত—তাহাকে ধরা যায় না ; তাহার নিকট যতবেশী অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা ততই পিছাইয়া যায়। ঐতিহাসিক ভাবে দেখিলে দেখা যায়, মানুষ কোন বিশেষ যুগে বিশেষ ব্যবস্থাকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছে : দীর্ঘদিন ধরিয়া সেই

আদর্শ ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করিয়াছে, জীবন দিয়াছে। কিন্তু সেই আদর্শের অত্যন্ত নিকটে সে যখন পৌঁছায়, সে চমকিত হইয়া দেখে—"ইহার জন্য তো আমি সংগ্রাম করি নাই, ইহা তো আমার চরম বাঞ্ছনীয় নহে।" এইরূপ ঘটিবার কারণ সেই মানুষ নিজে এই সময়টুকুর মধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার মন, মানসিক চিন্তা, কল্পনা, উত্তমের বোধ ইতিমধ্যেই নবতর সম্ভাবনার ইঙ্গিত লাভ করিয়াছে, সেইজন্য যে ব্যবস্থাকে আদর্শব্যবস্থা ভাবিয়া সে সংগ্রাম করিয়া তাহা অর্জন ও প্রতিষ্ঠা করিল, সেই ব্যবস্থা, তাহার এতদিনের পরম আকাঙ্খার বস্তু—নিকটে থাকিয়া তাহার মন ভরাইতে পারে না।

ইতিহাসের পাতায় পাতায় ইহার নিদর্শন মিলিবে। একযুগে মানুষ তাহার আদর্শ স্থির করিয়াছে, সেই আদর্শের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিয়াছে, সংগ্রাম করিয়াছে, সেই আদর্শকে অর্জন করিয়াছে; নূতন অবস্থায় আবার পুরাতন আদর্শকে বর্জন করিয়াছে। তারপর নূতন লক্ষ্য স্থির করিয়া নূতন সংগ্রাম, নূতন ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। এই আদর্শের ইতিহাসই হইতেছে সভ্যতার ইতিহাস। প্রতিযুগেই আদর্শবান্‌কে তাহার আদর্শ সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; আদর্শ লাভের জন্য মানুষের যে প্রচেষ্টা তাহারই লিপিবদ্ধ ধারাবাহিক কাহিনী হইতেছে মানুষের ইতিহাস।

প্রাচীন এথেন্সের নাগরিকদের নিকট ব্যক্তির এবং গোষ্ঠীর স্বাধীনতা ছিল আদর্শ। 'স্বাধীনতা' কথাটিই আমাদের এথেন্সের নাম স্মরণ করাইয়া দেয়। এথেন্সের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস গড়িয়া উঠিয়াছে এই স্বাধীনতার জন্য এথেন্সবাসীর সংগ্রামের কাহিনী লইয়া। তাহাদের এই আদর্শের ধারণায় বর্ত্তমান বিচারে ভুল, ত্রুটী বা অপূর্ণতা থাকিতে পারে। তাই বলিয়া তাহাদের আদর্শ বা আত্মত্যাগ ম্লান হইয়া যায় না। রোমানদের আদর্শ ছিল—আইন ও শৃঙ্খলা (Law and order)—'স্বাধীনতার' ঠিক বিপরীত কথা। কিন্তু রোমীয় যুবক, নাগরিক, দার্শনিক আইন ও শৃঙ্খলার জন্য কত কী করিয়াছে;

আইন ও শৃঙ্খলার জয়গানে রোমীয় সাহিত্য কাব্য মুখরিত হইয়াছে। ইহার পরও ইতিহাস অগ্রসর হইয়াছে। বিশ্বমানবের সমতাবোধ, রাষ্ট্রীয় সার্ব্বভৌমত্ব, বৈপ্লবিক অধিকার বোধ, উনবিংশ শতাব্দীর সাম্রাজ্যবাদ, বিংশ শতাব্দীর সমাজতন্ত্রবাদ—প্রভৃতি আদর্শকে মানুষ একের পর এক গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহার জন্য সংগ্রামের মধ্য দিয়া বিপুল ইতিহাস রচনা করিয়াছে।

এইসব অতীত আদর্শের কথা বর্ত্তমানেও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রয়োজন এই জন্য নহে, যে আমরা উহাদের মধ্যে একটিকে পছন্দ করিয়া আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করিব। উহারা অতীত, উহাদের মধ্যে কোনটিই এককভাবে আমাদের আদর্শ হইতে পারে না, কারণ ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিশেষ পরিস্থিতির মধ্যেই ইহারা দেখা দিয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমানকে বুঝিতে হইলে এই সমস্তগুলিই আমাদের জানা প্রয়োজন; এবং ভবিষ্যৎকে গঠন করিতে হইলে এই সমস্ত হইতে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। "we are interested in what has occurred, chiefly because we want to understand what is occurring; and we want this again chiefly in order to influence what will occur."

বর্ত্তমান যুগে সমস্ত পৃথিবী জুড়িয়া চারিটি আদর্শের সংঘাত চলিয়াছে—ব্যক্তিতন্ত্রবাদ ও সমাজতন্ত্রবাদ এবং জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ। আমাদের আদর্শ যাহাই হউক না কেন, এই চারিটা আদর্শের মধ্যে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, তাহা গ্রহণ করিতে হইবে, এবং তাহার সহিত ভারতবর্ষের জাতিগত, সংস্কৃতিগত, ইতিহাসগত বৈশিষ্ট্যগুলি যুক্ত করিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রের আদর্শ স্থির করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে যে সমস্ত অন্তর্নিহিত গুণাবলী এবং সম্ভাবনা রহিয়াছে তাহার পূর্ণতম বিকাশই হইবে আমাদের আদর্শ সমাজব্যবস্থার মূলনীতি—যাহার দ্বারা ভারতীয় নাগরিক শ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণাঙ্গ নাগরিক হইতে পারে, ভারতীয় রাষ্ট্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রে পরিণত হইতে পারে। ব্যষ্টির পূর্ণতম বিকাশের পরই সমষ্টির সমৃদ্ধি সম্ভব; অতএব ব্যষ্টির উন্নতি আমাদের চরম লক্ষ্য।

এই অর্থে ব্যক্তিতন্ত্রবাদ আমাদের গ্রাহ্য। কিন্তু ব্যষ্টির আত্মবিকাশ যাহাতে সমষ্টির উন্নতির পথে অন্তরায় না হয়, তাহা আমাদের দেখিতে হইবে। সমষ্টির উন্নতি ব্যতিরেকে ব্যক্তিগতভাবে অগ্রগতি আজিকার দিনে সম্ভব নহে। লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে থাকিলে, দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা আর্থিক সংকটের মধ্যে থাকিলে একজন অতিবিত্তবান্ ব্যক্তি সমাজের মঙ্গলসাধনে অক্ষম। লক্ষ লক্ষ লোককে অশিক্ষা, কুসংস্কারের অন্ধকারে আবদ্ধ রাখিয়া একদল মহাজ্ঞানী সংস্কৃতিসম্পন্ন লোক সমাজের সংস্কৃতিকে উন্নত করিতে পারে না। সমষ্টির সমৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন করিয়াই ব্যষ্টির আত্মবিকাশের পথ করিয়া দিতে হইবে। এই অর্থে সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের গ্রাহ্য। কিন্তু সেই সমাজতন্ত্রবাদকে আমরা গ্রহণ করিব না যাহা ব্যক্তিকে যোগ্য গুরুত্ব দেয় না, অবহেলা করে, যন্ত্রে পরিণত করে ; সেই সমাজতন্ত্রবাদ আমাদের লক্ষ্য যাহা সামগ্রিক উন্নতির সাথে সাথে ব্যষ্টির পূর্ণতম আত্মবিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করিয়া দেয়। যতদিন সমাজে একশ্রেণীর দ্বারা অপর শ্রেণীর উপর অর্থনৈতিক শোষণ বা রাজনৈতিক, প্রভুত্ব চলিতে থাকিবে, ততদিন শ্রেণীসংগ্রামও থাকিবে, এবং মানুষের কর্মক্ষমতা মানুষের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইবে। শ্রেণীসংগ্রামের মধ্যদিয়া শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শোষণ এবং প্রভুত্বের অবসান ঘটিলে, মানুষ অন্নবস্ত্র আশ্রয় সংস্থানের দৈনন্দিন দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইলে, মানুষের সমস্ত শক্তি ও কার্য্যক্ষমতা নিয়োজিত হইবে মানসিক এবং আত্মিক উন্নতি বিধানের জন্য, সাহিত্য, দর্শন, কলা, বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি সাধনের জন্য।

অপর যে দুইটি আদর্শের উল্লেখ আমরা করিয়াছি, সেই দুইটির সম্বন্ধে অনুরূপ সিদ্ধান্তই প্রযোজ্য। জাতীয়তাবোধ বলিতে যদি বুঝায় অপর জাতির প্রতি ঘৃণা, বিদ্বেষ, যদি বুঝায় আক্রমণ, যুদ্ধ, তাহা হইলে সেই জাতীয়তাবাদ বর্জনীয়। বর্তমান পৃথিবীতে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষানীতি স্বাস্থ্যনীতি এতবেশী অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে কোন জাতি পৃথকভাবে নিজের অস্তিত্বের কথা কল্পনাই করিতে পারে না। জাতির সহিত জাতির, রাষ্ট্রের সহিত রাষ্ট্রের

যোগাযোগ এত ঘনিষ্ঠ, যে আমরা চাই আর না চাই, আন্তর্জাতিকতা আমাদের মধ্যে রহিয়াছে, জাতিগুলির মধ্যে বিবিধবন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিতেছে। অতএব আন্তর্জাতিক সভ্যতার ভিত্তি আমাদের গড়িতেই হইবে, অন্যান্য দেশের সহিত মৈত্রীস্থাপন করিতে হইবে, তাহাদের আচারে, ব্যবহারে, সাহিত্যে দর্শনে যাহা কিছু উত্তম, সুন্দর গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যে আন্তর্জাতিকতাবাদ জাতির অস্তিত্বকে, বৈশিষ্ট্যকে অস্বীকার করে, জাতিগত সমৃদ্ধির অন্তরায় হয় সেই জাতীয়তাবিরুদ্ধ আন্তর্জাতিকতাবাদ পরিত্যাজ্য। উত্তম ব্যক্তি না লইয়া উত্তম সমাজ হয় না, উত্তম জাতি না লইয়া উত্তম পৃথিবী হয় না। প্রত্যেক জাতিকে স্বাধীন অস্তিত্ব রক্ষা করিবার, তাহার জাতিগত আচার ব্যবহার ঐতিহ্য, বৈশিষ্ট্য, সাহিত্য, দর্শনকে সমৃদ্ধ করিবার পূর্ণ সুযোগ দিতে হইবে। ভারতের মধ্যে বিভিন্ন জাতি রহিয়াছে; তাহাদের সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধির দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিতে হইবে, যাহাদ্বারা প্রতিটি জাতি তাহার নিজের সংস্কৃতির উন্নতি করিয়া ভারতের এবং জগতের সংস্কৃতির ভাণ্ডারে তাহার নিজস্ব সম্পদ্ দান করিতে পারে। ভারতবর্ষ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব বজায় রাখিবে, সকল রাষ্ট্রের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিবে, কিন্তু অনুকরণ কাহাকেও করিবে না; নিজের ভাবধারা, আচার ব্যবহারের যাহা শ্রেষ্ঠ তাহা ত্যাগ করিবে না, নিজের ইতিহাস সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশ করিবে। ভারতীয়ত্ব বজায় রাখিয়াই আমরা পৃথিবীর নাগরিক হইব।

শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করিয়া ব্যক্তির বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা এবং জাতীয় উন্নতির দ্বারা আন্তর্জাতিক সভ্যতার বনিয়াদ্ গঠন করা—ইহাই ভারতীয় রাষ্ট্রের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আমাদের যাহা কিছু অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, সামাজিক পুনর্গঠন, সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের প্রচেষ্টা—সব করিতে হইবে এই চরম লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া।